রামেন্দ্রসুন্দর

রামেন্দ্রসুন্দর

রামেন্দ্রসুন্দর

জীবন-কথা

শ্রীআশুতোষ বাজপেয়ী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

চৈত্র—১৩৩০

মূল্য তিন টাকা মাত্র
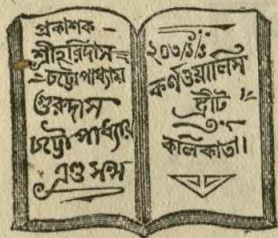
প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রাজা রাও শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর,
লালগোলা

উৎসর্গ

পরলোকগত মহাত্মা রামেন্দ্রসুন্দরের গুণমুগ্ধ

লোকহিতব্রত বদান্যবর সাহিত্যরসিক

লালগোলার

শ্রীযুক্ত রাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ

রায় বাহাদুর, বঙ্গরত্ন, সি, আই, ই,

মহোদয়ের করকমলে

ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার

চিহ্নস্বরূপ

এই গ্রন্থখানি

অর্পিত হইল।

ভূমিকা

আমার শরীর ভাল নাই, আমার অবকাশও অল্প। রামেন্দ্র-সুন্দরের সম্বন্ধে মনের মত করিয়া কিছু লিখিব এমন সুযোগ এখন আমার নাই। শুধু শ্রদ্ধা নহে, তাঁহার প্রতি আমার প্রীতি সুগভীর ছিল এ কথা আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি। কিন্তু এ কথা বলিবার লোক আরো অনেক আছে। যে কেহ তাঁহার কাছে আসিয়াছিল, সকলেই তাঁহার মনীষায় বিস্মিত ও সহৃদয়তায় আকৃষ্ট হইয়াছে। বুদ্ধির, জ্ঞানের, চরিত্রের ও উদারহৃদয়তার এরূপ সমাবেশ দেখা যায় না। আমার প্রতি তাঁহার যে অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল তাহা তাঁহার ঔদার্য্যের একটি অসামান্য প্রমাণ। আমার সহিত তাঁহার সামাজিক মতের ও ব্যবহারের অনৈক্য শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার চিত্তকে আমার প্রতি বিমুখ করিতে পারে নাই ; এমন কি, প্রবল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে একদা আমার প্রশস্তিসভার আয়োজন করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই।

বাংলার লেখকমণ্ডলীর মধ্যে সাধারণত লিপিনৈপুণ্যের অভাব দেখা যায় না ; কিন্তু স্বাধীন মননশক্তির সাহস ও ঐশ্বর্য্য অত্যন্ত বিরল। মনন ও রচনারীতি সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের দুর্লভ স্বাতন্ত্র্য ছিল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার সেই খ্যাতি বিলুপ্ত হইবে না। বিদ্যা তাঁহার ছিল প্রভূত, কিন্তু সেই বিদ্যা তাঁহার মনকে চাপা দিতে পারে নাই। তিনি যাহা বলিতেন, তাহার বিষয়বিচারে অথবা তাহার লেখনপ্রণালীতে অন্য কাহারও অনুবৃত্তি ছিল না।

দেশের প্রতি তাঁহার প্রীতির মধ্যেও তাঁহার নিজের বিশিষ্টতা ছিল ; তাহা স্কুলপাঠ্য বিলাতী ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত তৎকালীন কন্‌গ্রেস্ তোতাপাখী কর্ত্তৃক উচ্চারিত বাঁধিবুলির দ্বারা পুষ্ট ছিল না। তাঁহার চিত্তের মধ্যে ভারতের একটি মানসী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই মূর্ত্তিটি ভারতেরই সনাতন বাণীর উপকরণে নির্ম্মিত। সেই বাণীর সহিত তাঁহার নিজের ধ্যান নিজের মনন সম্মিলিত ছিল। তাঁহার সেই স্বদেশপ্রীতির মধ্যে ব্রাহ্মণের জ্ঞানগাম্ভীর্য্য ও ক্ষত্রিয়ের তেজস্বিতা একত্র সঙ্গত হইয়াছিল।

জীবনে তিনি অনেক দুঃখ পাইয়াছিলেন। প্রিয়জনের মৃত্যু-শোক তাঁহাকে বারম্বার মর্ম্মাহত করিয়াছে। তিনি যে সকল ব্রত গ্রহণ করিয়া প্রাণপণে পালন করিতেছিলেন তাহাতেও নানাপ্রকার বাধাবিরুদ্ধতা তাঁহাকে কঠোর ভাবে আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার অজস্র মাধুর্য্য-সম্পদের কিছুমাত্র ক্ষয় হয় নাই—রোগ তাপ প্রতিকূলতার মধ্যে তাঁহার প্রসন্নতা অম্লান ছিল। বিরোধের আঘাত তাঁহাকে গভীর করিয়া বাজিত, অন্যায় তাঁহাকে তীব্র পীড়া দিত, কিন্তু তিনি ক্ষমা করিতে জানিতেন। সেই মাধুর্য্য সেই ক্ষমাই ছিল তাঁহার শক্তির প্রকাশ।

তিনি যদি কেবলমাত্র বিদ্বান্ বা গ্রন্থরচয়িতা বা স্বদেশ-প্রেমিক হইতেন, তাহা হইলেও তিনি প্রশংসা লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার মধ্যে স্বভাবের যে একটি পূর্ণতা ছিল, তাহারই গুণে তিনি সকলের প্রীতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। এমন পুরস্কার অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে।

২৮ ফাল্গুন ১৩২৪ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিবেদন

রামেন্দ্রসুন্দরের পরলোকগমনের অল্প দিন পরেই তাঁহার ভক্ত উপাসক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় "আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর" প্রকাশ করিয়াছেন। সেই গ্রন্থে বঙ্গের মনীষিগণ বিভিন্ন দিক্ হইতে আচার্য্য-চরিত্রের বিবিধরূপ আলোচনা করিয়াছেন। ঐ সকল অমূল্য প্রবন্ধ রচিত হওয়ার পর আমার এইরূপ প্রয়াসের দুঃসাহস জন্মিল কেন তাহার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

রামেন্দ্রসুন্দর আমার মাতুলপুত্র এবং অগ্রজ ছিলেন। নিতান্ত শৈশব হইতেই আমি তাঁহার স্নেহময় অঙ্কে বৰ্দ্ধিত হইয়াছি। সর্ব্বদা একত্র বাস হেতু আমি তাঁহার জীবনের অতি ক্ষুদ্রতম ঘটনার সহিতও পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। বর্ত্তমান কালে দেশের অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, তাঁহার বাল্য জীবনের ইতিবৃত্ত বলিবার মত প্রত্যক্ষদর্শী লোকের ক্রমশঃ অভাব ঘটিতেছে, বোধ করি অল্প দিন পরেই তাহার সম্পূর্ণ অভাব পরিলক্ষিত হইবে; ভবিষ্যতে কোন

সুযোগ্য ব্যক্তি নিপুণ হস্তে তাঁহার বৃহত্তর জীবন-বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলে বিস্মৃতির গর্ভ হইতে তাঁহার বাল্য জীবনের উপকরণ সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে দুষ্কর হইয়া পড়িবে, সেই অভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণে পূর্ণ করিবার মানসে আমি এই দুরূহ কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছি।

১৩২৩ সালের বৈশাখ মাসে অগ্রজ মহাশয় জেমো-কান্দির ভবনে গ্রীষ্মাবকাশ যাপন করিতে আসিলে তাঁহাকে তাঁহার নিজের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'জীবন-স্মৃতির' অনুরূপ এক-খানি গ্রন্থ রচনা করিতে অনুরোধ করি। উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতির' মত উহা বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারে একখানি অমূল্যরত্ন বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু তিনি নিজের জীবনী লিখিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়া আমার প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। পূজার অবকাশে বাড়ী ফিরিলে আমি পূর্ব্ব অনুরোধ লইয়া পুনরায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হই। সেবারে তিনি আমার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। প্রশ্নচ্ছলে তাঁহার নিকট সকল কথা বাহির করিয়া লইবার জন্য তিনি আমার উপর ভারার্পণ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি চক্ষুপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া তৎকালে আমার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত

করিতে পারি নাই। যখন আরোগ্য লাভ করিলাম, তখন তিনি তাঁহার প্রিয়তমা কনিষ্ঠা কন্যাকে হারাইয়া নিতান্ত রুগ্ন দেহে ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া মাতৃদেবীর অন্তিম শয্যাপার্শ্বে দারুণ উৎকণ্ঠার সহিত দিন যাপন করিতে-ছেন। অল্প দিন পরে তিনিও ইহধাম ত্যাগ করিয়া গেলেন, সুতরাং তাঁহার মুখ হইতে তাঁহার জীবন-কথা বাহির করিয়া লইবার সুযোগ আর ঘটিয়া উঠিল না। আমার মনের আশা মনেই বিলীন হইয়া গেল। তাঁহার জীবনকালে যাহা সম্পন্ন করিতে পারি নাই, তাঁহার মহাপ্রয়াণের পর প্রকারান্তরে তাহা নিষ্পন্ন করাই এই গ্রন্থপ্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে স্বর্গীয় মহাত্মার প্রকৃত পরিচয় দিতে পারিয়াছি কিনা সন্দেহ। অনুগত ভক্তের হস্তে জীবন-বৃত্তান্ত পক্ষপাতদুষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। আমি এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীর জন্য পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

যাঁহার জীবন-কথা লিখিত হইতেছে তাঁহারই নিজের ভাষা এই গ্রন্থমধ্যে বহু স্থানে ব্যবহার করিয়াছি। বঙ্গের সাহিত্যরথিগণ তাঁহার চরিত্রসম্বন্ধে যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, এই গ্রন্থমধ্যে অনেক স্থলে

তাহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই। সময় ও সুযোগ অভাবে তাঁহাদের অনেকের নিকট অনুমতি লওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। আশা করি আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়া তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

আমার আত্মীয়স্বজন অনেকে আমাকে এই কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। পরলোকগত মহাত্মার বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, রিপন কলেজের শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয়গণের নিকট আমি বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছি। কৃতজ্ঞতার সহিত আমি তাঁহাদের নিকট আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

লালগোলার স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত রাজা রাও যোগীন্দ্র-নারায়ণ রায় বাহাদুর স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এই পুস্তকের মুদ্রণ-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট সাহায্য না পাইলে আমি গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতাম কিনা সন্দেহ। কোন বাক্যের ভাষায় তাঁহার নিকট হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইবার সাধ্য আমার নাই।

মফঃস্বলবাসী গ্রন্থকারকে প্রুফ সংশোধনকার্য্যে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থমধ্যে কতকগুলি বর্ণাশুদ্ধি রহিয়াছে। বারান্তরে সেগুলির সংশোধনের চেষ্টা করা হইবে।

জেমো, কান্দি,
মুরশিদাবাদ,
৫ই চৈত্র ১৩৩০

শ্রীআশুতোষ বাজপেয়ী

সূচী

পরিশিষ্ট

চিত্রাবলী

রামেন্দ্রসুন্দর

জীবন-কথা

উপক্রমণিকা

আমরা যে সকল উচ্চ শ্রেণীর বাঙ্গালীকে খাঁটি বাঙ্গালী বলিয়া অভিহিত করি, মূলতঃ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই খাঁটি বাঙ্গালী নহেন। কিঞ্চিদধিক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষগণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগমন করিয়া বঙ্গদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎ-কালাগত মহাপুরুষদিগের অধস্তন বংশ হইতে রামেন্দ্রসুন্দরের উৎপত্তি ঘটে নাই। কিঞ্চিদধিক দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণ মধ্যভারতবর্ষ হইতে আগমন করিয়া বঙ্গদেশে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা জিঝৌতিয়া ব্রাহ্মণ-শ্রেণিভুক্ত ছিলেন।

জিঝৌতি প্রদেশের কথা

মধ্যভারতে ঘন বনরাজিশোভিতা, নগনদী-সরঃ-সরিৎ-সম্পচ্ছালিনী রমণীয় প্রকৃতির শ্যাম স্নিগ্ধ নিকেতনে জিঝৌতি নামক একটি প্রাচীন প্রদেশ আছে; এই জিঝৌতি প্রদেশই বর্ত্তমান বুন্দেল খণ্ড। হুয়েংচাং আবুরিহান্ আল-বিরূণী, ইবন্‌বতুতা প্রভৃতি প্রাচীন ভ্রমণকারিগণ বর্ত্তমান বুন্দেলখণ্ড এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানকে জিঝৌতি প্রদেশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত প্রদেশে জিঝৌতিয়া ব্রাহ্মণ নামে একশ্রেণির ব্রাহ্মণ বাস করেন। খ্রীষ্টীয়

সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েংচাং এই স্থান পরিদর্শন করেন। তিনি চিচিতো বা জিঝৌতি নামে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—তৎকালে জিঝৌতি রাজার সদ্ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। অনেক-গুলি সঙ্ঘারামে তখন বৌদ্ধ স্থবিরগণ বাস করিতেন।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে সুলতান মামুদ কালিঞ্জর দুর্গের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, তৎকালে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবুরিহান্ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, তিনি ঐ প্রদেশকে জিঝৌতি প্রদেশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কানিংহাম সাহেব তাঁহার 'ভারতবর্ষের প্রাচীন ভূতত্ব' নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ৪৮১-৪৮৩ পৃষ্ঠায় জিঝৌতি সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"From the accounts of Abu Rihan and 'ibn Batuta, it is evident that the province of Jajhoti corresponded with the modern district of Bundelkhand * * * Bundelkhand in its widest extent is said to have comprised all the country to the south of the Jumna and Ganges, from the Betwa river on the west to the temple of Vindhya-vasini Devi on the east, including the districts of Chanderi, Sagar and Bilhari near the sources of the Narbada on the south. But these are also the limits of the ancient country of the Jajhotia Brahmans, which according to Buchanan's information, extended from the Jumna on the north to the Narbada on the south, and from Urcha on the Betwa river on the west to the

Bundela Nala on the east. The last is said to be a small stream which falls into the Ganges near Benares and within two stages of Mirzapur.

During the last twenty-five years I have traversed this tract of country repeatedly in all directions and I have found the Jajhotia Brahmans distributed over the whole province, but not a single family to the north of the Jumna or to the west of the Betwa.

A. Cunningham,

Ancient Geography of India. I. pp. 481-483.

তাৎপর্য্য ঃ—আবুরিহানাদির বর্ণনা অনুসারে বোধ হয় জিঝৌতি প্রদেশ বর্ত্তমান বুন্দেলখণ্ড। আসল বুন্দেলখণ্ডের সীমা উত্তরে গঙ্গা ও যমুনা, পশ্চিমে বেটোয়া নদী, পূর্ব্বে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির, দক্ষিণে চন্দেরী, সাগর ও নর্ম্মদার উৎপত্তিস্থান বিলহারী জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই সীমার মধ্যে জঝোতিয়া ব্রাহ্মণগণের প্রাচীন দেশ বর্ত্তমান। বুকানানের মতে জঝোতিয়ার বাসভূমি উত্তরে যমুনা হইতে দক্ষিণে নর্ম্মদা এবং পশ্চিমে বেটোয়া তীরস্থ উর্চা হইতে পূর্ব্বে বুঁদেলা নালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বুঁদেলা নালা মির্জাপুর হইতে দুই চটি মাত্র দূরে কাশীর নিকটে গঙ্গায় পড়িতেছে ; গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে আমি এই সমগ্র প্রদেশে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিয়াছি ; দেখিয়াছি, এই সমগ্র প্রদেশে জঝোতিয়া ব্রাহ্মণ বাস করে ; কিন্তু যমুনার উত্তরে বা বেটোয়ার পশ্চিমে এক ঘরও জঝোতিয়া দেখি নাই।

সার হেনরি ইলিয়ট তাঁহার Memoirs of the Races of the North-Western Provinces of India গ্রন্থে জিঝৌতিয়াদিগের সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ। বীমস্ সাহেবের

প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থের ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণে প্রথম ভাগে ১৪৯ পৃষ্ঠে সংলগ্ন যে মানচিত্র আছে, তাহাতে সরোয়ারিয়া, জিঝৌতিয়া, কণৌজিয়া প্রভৃতি ব্রাহ্মণ শ্রেণীর অবস্থান প্রদর্শিত হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশের উত্তরে বুন্দেলখণ্ডের দক্ষিণাংশে জিঝৌতিয়াগণের অবস্থান নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

উইলিয়ম কুক তাঁহার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসিগণের বিবরণবিষয়ক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে জিঝৌতিয়া সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত বিবরণ দিয়াছেন :—

A branch of the Kanoujiya Brahmans who take that name from the country Jejákasukti, which is mentioned in the Madanpur inscription. Of this General Cunningham writes :—

The first point deserving of notice in these two short but precious records is the name of the country, Jejákasukti, which is clearly the Jajáhuti of Abu Rihan. The meaning of the word is doubtful, but it was certainly the name of the country, as it is coupled with *desa*. I may add, also, that there are considerable numbers of Jajahutiya Brahmans and Jajahutiya Baniyas in the old country of the Chandels of Bundelkhand. I would indentify Jajahuti with the district of Sandrabatis of Ptolemy.

* * * * *

The Jami-ut-tawárikh of Rashid-ud-din quoting from Abu Rihan al Biruni, mentions the kingdom of Jajhoti

as containing the cities of Gwalior and Kalinjar and that its capital was at Khajuraho.

কুক সাহেবের উক্তির মর্ম্ম এই ঃ—

জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ কণোজিয়ার শাখা। মদনপুর লিপিতে যে যেজাক্‌-ভুক্তি নামক দেশের উল্লেখ আছে, কানিংহাম সাহেব বলেন, এই দেশ ও আবুরিহানের উল্লিখিত জঝোতি প্রদেশ অভিন্ন। তাঁহার অনুমানের ভিত্তি এই যে, চন্দেল জাতির প্রাচীন অবস্থান ভূমি বুন্দেলখণ্ডে জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ ও জিঝোতিয়া বণিক্‌ অদ্যাপি বাস করে। গ্রীক্‌ ভূগোলবিৎ টলেমি উল্লিখিত Sandrabatis প্রদেশও এই স্থান বলিয়া কানিংহামের ধারণা। আলবিরুণী বলিয়াছেন, গোয়ালিয়র ও কালিঞ্জর নগর জঝোতি প্রদেশের অন্তর্গত। খাজুরাহো ইহার রাজধানী ছিল।

সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে জিঝৌতি প্রদেশে অতি পরাক্রমশালী চন্দ্রাত্রেয় বা চন্দেল্ল বংশ রাজত্ব করিতেন। এই চন্দেল্ল বংশের যশোগৌরবের কথা এক কালে সমগ্র ভারতে রাষ্ট্র হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে চন্দেল্ল-বংশীয় রাজগণ তাঁহাদের রাজ্যের সীমা যমুনাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া-ছিলেন। এই বংশীয় দ্বিতীয় নরপতির নাম ছিল বাক্‌পতি। তাঁহার জয়শক্তি ও বিজয়শক্তি নামক দুই পুত্র ছিল। জয়শক্তি জেজ্জাক্‌ বা জেজা, বিজয়শক্তি বিজ্জাক্‌ বা বিজা নামে অভিহিত হইতেন। চন্দ্রাত্রেয় বংশের সম্প্রতি আবিষ্কৃত বহু শিলালিপিতে উভয় ভ্রাতার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। লক্ষ্ণৌ যাদুঘরে রক্ষিত শিলাখণ্ডসমূহের মধ্যে মহোবা বা মহোৎসব নগরে প্রাপ্ত একখানি শিলাখণ্ডে খোদিত আছে—"জেজাখ্যয়াত নৃপতিঃ স বভূব জেজাভুক্তিঃ পৃথোরিব যতঃ পৃথিবীয়মাসীৎ"। অনন্তর জেজা নামে নৃপতি হইয়াছিলেন, যেমন পৃথু হইতে পৃথিবীর নামকরণ হইয়াছে, সেইরূপ তাঁহার নাম অনুসারে জেজাভুক্তি নাম হইয়াছিল।

যেমন প্রাচীন তীরভুক্তি অধুনা "তিরহোত বা ত্রিহুত" নামে অভিহিত হয়, সেইরূপ জেজাভুক্তি অধুনা জঝ্‌হোতি বা জিঝৌতি নামে খ্যাত হইয়াছে। জিঝৌতি প্রদেশের নামকরণ সম্বন্ধে শিলালিপির উল্লিখিত ঐ লিপিকে আমরা সমীচীন বলিয়া মানিয়া লইতে পারি।

জিঝৌতি প্রদেশে ছত্রপুর রাজ্যের অন্তর্গত খাজুরাহো, হামিরপুর জেলায় অবস্থিত মহোৎসব নগর বা মহোবা, এবং বান্দা জেলার অধীন কালিঞ্জর নগর প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্যের অপূর্ব্ব নিদর্শনসকল বক্ষে ধারণ করিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। খাজুরাহো এক সময়ে চন্দ্রাত্রেয় বা চান্দেল্ল রাজপুতগণের রাজধানী ছিল। তাহার বহু নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এক কালে এখানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব নিতান্ত কম ছিল না। এক্ষণে কালধর্ম্মের প্রভাবে এখানকার সমস্ত বৌদ্ধকীর্ত্তিই লোপ পাইতে বসিয়াছে। ঘণ্টাই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এবং খাজুরাহো গ্রামের নিকটবর্ত্তী কয়েকটি ধ্বংসাবশেষকে কেহ কেহ বৌদ্ধমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া অনুমান করেন।

মুসলমান ঐতিহাসিক ইবন্‌বতুতা ১৩৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এই স্থানে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি খাজুরাহোকে কাজুরা নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এই স্থানে অনেক হিন্দু দেবদেবীর মন্দির আছে, সময়ে সময়ে অনেক সাধুসন্ন্যাসীর সমাবেশ হয়। অনেক মুসলমান পর্য্যন্ত মন্ত্র-তন্ত্র ও ইন্দ্রজাল বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের নিকট গমন করেন। এলাহাবাদ নাইনি ষ্টেশন ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে ও গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান্ পেনিনস্যুলার রেলওয়ের সংযোগস্থান। উক্ত সংযোগস্থলের দক্ষিণ দিকে গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান্ পেনিনস্যুলার রেলপথের মাণিকপুর ষ্টেশন হইতে যে পথটি পশ্চিম উত্তর অভিমুখে ঝাঁসি, গোয়ালিয়র, ঢোলপুর হইয়া আগ্রা ফোর্ট পর্য্যন্ত গিয়াছে, সেই পথে ঝাঁসি এবং মাণিকপুর অংশের মধ্যবর্ত্তী স্থানে হরপালপুর

ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে ঝট্‌কা যোগে দীর্ঘ ৮৫ মাইল পথ অতিক্রম করিলে খাজুরা • গ্রামে পৌছান যায়। ঐ পথেরই মধ্যবর্ত্তী স্থানে মহোবা নগর অবস্থিত; তথায় রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। তদ্ভিন্ন কানপুর এবং আগ্রা ফোর্ট ষ্টেশন হইতেও গ্রেট ইণ্ডিয়ান্ পেনিনসুলার রেল যোগে ঝাঁসি হইয়া মহোবা এবং হরপালপুর উভয় ষ্টেশনে পৌছান যায়।

খাজুরাহোর প্রাচীন নাম খর্জ্জুরপুর বা খর্জ্জুরবাহক। প্রবাদ আছে, প্রাচীনকালে এই নগরের সিংহদ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটি স্বুবর্ণময় খর্জ্জুর বৃক্ষ স্থাপিত ছিল, সেই কারণে ইহা খর্জ্জুরপুর নামে অভিহিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে খর্জ্জুরপুর একখানি সামান্য গ্রামে পরিণত হইয়াছে, ইহার লোক সংখ্যা ১২৫৫ জন মাত্র। একদিন ঐ সামান্য গ্রামখানি এক পরাক্রান্ত রাজবংশের রাজধানী ছিল। হুয়েংচাংএর সময়ে ঐ স্থানের দ্বাদশটি দেব মন্দিরে সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ সেবাইত নিযুক্ত ছিল। মামুদ গজনীর সময় নন্দরায় খাজুরাহো পরিত্যাগ করিয়া কালিঞ্জর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন; পরে চন্দেল্ল রাজগণ মহোৎসব নগরে (মহোবায়) বাস করিতে আরম্ভ করেন; তথায় তাঁহাদের বহু কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় হইতে খাজুরাহোর দুর্গতি ঘটিতে আরম্ভ করে। কুতবুদ্দীন আবেক মহোবা অধিকার করিলে চন্দেল্ল রাজগণ পুনরায় কালিঞ্জর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। পাঠান সম্রাট্ শেরশাহ কালিঞ্জর অধিকার করিয়া চন্দেল্লবংশের ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন।

খাজুরাহো গ্রাম হিন্দুদিগের একটি পবিত্র তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত। লোকে উহাকে পুরীতীর্থ নামে অভিহিত করে; ঐ পুরীতীর্থে প্রতি বৎসর ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বসন্তকালে একটি বড় মেলা বসিয়া থাকে, মেলাটি মাসাধিককাল স্থায়ী হয়; তদুপলক্ষে ঐ স্থানে বহুলোকের সমাগম হয়। পুরীতীর্থে হিন্দুদিগের কারুশিল্পখচিত বহু প্রাচীন দেবমন্দির বিদ্যমান

রহিয়াছে, বৌদ্ধ এবং জৈন মন্দিরের প্রাচীন নিদর্শন এখনও তথায় দেখিতে পাওয়া যায়।

১০২১ খ্রীষ্টাব্দে গজনীর সুলতান মাম্মুদ কালিঞ্জর দুর্গ আক্রমণ করিবার সময় এবং ১৪৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সেকেন্দর লোদী এই প্রদেশের মধ্য দিয়া অভিযান করিবার সময় এই স্থানের অনেকগুলি প্রসিদ্ধ মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন। কালের অত্যাচার সহ্য করিয়া ও বিদ্বেষভাবদুষ্ট বিধর্ম্মীদিগের ধ্বংসনীতির হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া এতদিন ধরিয়া কতকগুলি মন্দির আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছে।

ছত্রপুরের বর্ত্তমান মহারাজ বিশ্বনাথসিংহ বাহাদুরের পিতামহ মহারাজ প্রতাপসিংহজী প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে কতকগুলি দেবমন্দিরের জীর্ণ অঙ্গের সংস্কার করিয়াছেন। বর্ত্তমান মহারাজও দেশের প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন লইয়া থাকেন। এই মন্দিরসমূহের সংস্কার সাধনে লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে ; ছত্রপুরের রাজকোষ এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট সম অংশে ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন এইস্থানে একটি ক্ষুদ্র যাদুঘরও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অনেকগুলি প্রস্তর মূর্ত্তি এবং কারুশিল্প সমন্বিত প্রস্তরখণ্ডাদি সংগৃহীত হইয়া ঐ যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে।

খাজুরাহোর মন্দিরগুলি শিল্পকলার অপূর্ব্ব নিদর্শন। বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর মন্দিরের কথা ছাড়িয়া দিলে এই মন্দিরগুলি শিল্পকলার হিসাবে শ্রেষ্ঠতম আসন পাইবার যোগ্য।

খাজুরাহোর মন্দিরগুলির মধ্যে কতকগুলি বিধর্ম্মী স্পৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া অধুনা উহাদের অভ্যন্তরস্থ দেবমূর্ত্তিগুলির কেহ পূজা করে না। পূজিত দেবগণের মধ্যে অধুনা সর্ব্বোপরি মাতঙ্গেশ্বর বা মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। শিবরাত্রির দিন ঐ মন্দিরে সমারোহের সহিত পূজার অনুষ্ঠান হয়। প্রতিবৎসর ঐ দিন ছত্রপুরের মহারাজ বাহাদুর শোভাযাত্রা করিয়া

ঐ মন্দিরে পূজা দিতে গমন করেন। শিবরাত্রির দিন হইতে খাজুরাহোর বিখ্যাত মেলার আরম্ভ হয়।

জিঝৌতিয়া ব্রাহ্মণের কথা

সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে যুজহরসিংহের সময় যজ্ঞ করিতে কয়েকজন ব্রাহ্মণ আসিয়া খাজুরাহো ও নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিয়াছিলেন। এই যুজহরসিংহ ও শিলালিপির উল্লিখিত জেজাখ্যাত নৃপতি অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। যুজহরসিংহের আনীত সেই ব্রাহ্মণবংশ হইতে জিঝৌতিয়া ব্রাহ্মণ শ্রেণীর উৎপত্তি ঘটিয়াছে। প্রাচীন কালে জিঝৌতিয়া ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে অনেক বড় বড় পণ্ডিত, দার্শনিক ও রাজনীতিবিৎ মন্ত্রীর উদ্ভব হইয়াছিল। বর্ত্তমান কালেও জিঝৌতিয়া ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে গভীর জ্ঞান-সম্পন্ন অনেক পণ্ডিত দেখিতে পাওয়া যায়।

জিঝৌতিয়া ব্রাহ্মণগণের নামোৎপত্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা যজুর্হোতা ব্রাহ্মণ বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন। কানিংহাম সাহেব লিখিয়াছেন—

The Brahmans derive the name of Jajhotia from Yajur-hota an observer of Yajur-veda, but as the name is applied to the Beniyas or grain-dealers, as well as to the Brahmans, I think it almost certain that it must be a mere geographical designation derived from the name of the country Jajhoti. This opinion is confirmed by other well known names of the Brahmanical tribes, as Kanojiya from Kanoje, Gaur from Gaur, Sarwariya or Sarjupariya from Sarajupar, Dravira from Dravira in the

Dekhan, Maithila from Mithila. etc. These examples are sufficient to show the prevalence of geographical names amongst the divisions of the Brahmanical tribes and as each division is found most numerously in the province from which it derives its name, I conclude with some certainty that the country in which the Jajhotia Brahmans preponderate must be the actual province of Jajhoti.

A. Cunningham,

Ancient Geography of India I.

ইহার তাৎপর্য্য এই যে—জিঝৌতিয়াগণের মতে জিঝৌতিয়া নাম যজুর্হোতার অপভ্রংশ; কিন্তু জঝোতিয়া ব্রাহ্মণ ব্যতীত জঝোতিয়া বণিকেরও অস্তিত্ব দেখিয়া আমার বিশ্বাস জঝোতিয়া নাম "জঝোতি" দেশের নাম হইতে উৎপন্ন। এইরূপ অন্য স্থলেও দেখা যায়। কণৌজিয়া কণৌজ হইতে, গৌড়ীয়া গৌড় হইতে, সরৌরিয়া সরযূ পার হইতে, দ্রাবিড়ী দাক্ষিণাপথের দ্রাবিড় হইতে ও মৈথিলী মিথিলা হইতে উৎপন্ন। এই সকল উদাহরণে বোধ হয় ব্রাহ্মণগণের শ্রেণীবিভাগ ভৌগলিক নাম অনুসারেই হইয়াছে; অপিচ যে প্রদেশের নামে যে শ্রেণী, সেই প্রদেশেই সেই শ্রেণীর আধিক্য দেখা যায়। আমার সিদ্ধান্ত এই, যে প্রদেশে জঝোতিয়া ব্রাহ্মণের বাস, সেই প্রদেশের নাম জঝোতি।

জিঝৌতি দেশের ভৌগলিক নাম অনুসারে উক্ত ব্রাহ্মণ শ্রেণীর নাম জিঝৌতিয়া হইয়াছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

জিঝৌতিয়া ব্রাহ্মণগণ কান্যকুব্জ বা কণৌজিয়া ব্রাহ্মণশ্রেণীর অন্যতম শাখা বলিয়া পরিচিত। J. N. Bhattacharyya প্রণীত "Hindu

Castes and Sects" নামক গ্রন্থ হইতে কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

Kanojia—They hold a very high position among the Brahmans of Northern India. They form one of the five divisions, called Panchgaur. The Brahmans of Bengal take a great pride in claiming to have been originally Konojia. The name is derived from the ancient Hindu city Kanauj, at the confluence of the Ganges and the Kalinadi, in the district of Farrakkabad. The Kanojias are found in almost every part of Northern India. But their original home is the tract of country which, before the time of Wellesly formed the western half of the Kingdom of Oudh including the modern districts of Pilibhit, Bareily, Shajehanpur, farrakkabad, Cawnpur, Fatepur, Hamirpur, Banda and Allahabad. The usual surnames of the Kanojias are the following :—Awasti, Dikshit, Dobey or Dwibedi, Pande, Misra, Sukul, Tewari or Trivedi, Chaube or Chaturvedi, Bajpeyi, Pathak.

* * * *

There are learned Sanskritists and English scholars among the Kanojias. Many of them practise agriculture and it is said, some till the soil with their own hands. The majority of them are Sivites. There are among

them a few Saktas and Srivaishnavas also. The Sivites and Srivaishnavas are strict vegetarians. There are some Ganja-smokers and Bhang-eaters among the Kaonjias, but very few that would even touch the spirituous liquor.

মর্ম্ম এই যে, উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কনৌজিয়া অতি উচ্চ স্থান অধিকার করেন। পঞ্চগৌড় নামক ব্রাহ্মণগণের পাঁচটি শ্রেণীর মধ্যে তাঁহারা অন্যতম। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণ মূলতঃ কনৌজিয়া শ্রেণীভুক্ত বলিয়া গৌরব প্রকাশ করেন। ফরাক্কাবাদ জেলায় অবস্থিত গঙ্গা এবং কালী নদীর সঙ্গমস্থলে প্রাচীন কনৌজ নগর হইতে তাঁহাদের নামকরণ হইয়াছে। উত্তর ভারতের সকল প্রদেশেই কনৌজিয়াদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু অযোধ্যার পশ্চিমার্দ্ধ এবং পিলিভিৎ, বেরিলি, সাহজাহানপুর, ফরাক্কাবাদ, কানপুর, ফতেপুর, হামিরপুর, বান্দা, এবং এলাহাবাদ জেলা তাঁহাদের আদি স্থান। কনৌজিয়াদিগের উপাধি দীক্ষিত, দুবে বা দ্বিবেদী, পাণ্ডে, মিশ্র, শুকুল, তেওয়ারী বা ত্রিবেদী, চোবে বা চতুর্ব্বেদী, বাজপেয়ী এবং পাঠক।

কনৌজিয়াদিগের মধ্যে সংস্কৃত এবং ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত অনেক পণ্ডিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কৃষিকার্য্য করিয়া থাকেন; কেহ কেহ স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ করেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই শৈব ও শাক্ত; বৈষ্ণবের সংখ্যা কম। শৈব ও বৈষ্ণবগণ নিরামিষভোজী। কনৌজিয়াদিগের মধ্যে কেহ কেহ গাঁজা এবং ভাঙ্গ ব্যবহার করেন; কিন্তু মদ্য কেহ স্পর্শও করেন না।

কুক সাহেব তাঁহার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার জাতিতত্ত্ব নামক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে জিঝৌতিয়াদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

According to a list procured at Mirzapur their gotras

are Awasthi, Bhareriya Tivari, Arjuriya Kot, Goutamiya of Ladhpur, Patariya of Kannaura, Pathak of Kalyanpur, Gangele of Matayaya, Richhatiya of Pipari, Bajpeyi of Binware, Dikshit of Panna, Kariya Misra, Sandele Misra. The above fifteen gotras intermarry on equal terms, below these are five, which are lower and give daughters to the higher fifteen, but are not given by them in return. These are Sirsa, Soti, Sonakiya, Ranaiya, Bhonreli Dube. This list has little resemblance to that given by Mr. Sherring (Hindu Caste I. 56)

W. Cooke.

Tribes and Castes of the N. W. Provinces and Oudh III

কুক সাহেবের উক্তির মর্ম্ম এই যে, তিনি মির্জ্জাপুর হইতে জিঝৌতিয়াগণের পঞ্চদশ গোত্রের (গোত্র নহে গাঁই এবং উপাধি) নাম সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং বলেন তদ্ভিন্ন আরও নিম্নবর্ত্তী পাঁচ গোত্র আছে, ইঁহারা উচ্চতর গোত্রে কন্যা দান করেন, কিন্তু তাঁহাদের কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন না।

গত ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের সেনসাস রিপোর্টে জিঝৌতিয়াদিগের সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে।—

There is no authority for the spelling Jijhotia which agrees with none of the recognised definitions (See Cooke, Vol. III. Page 56). Another name of Bundel khand and neighbouring tracts appears to have been Yudhavati ; whilst the Vishnu Dharma Puran calls the country between the Vindhyas Jumna and Narbada,

Yudhadesh. This is the tract where Jijhotias are chiefly found. The Jijhotias have lately met to discuss caste origins at Srinagar Mahoba and accepted the theory that they got their name from one Jujhar Singha a ruler of remote antiquity, who settled in Bundelkhand and finding no Brahmans there importedt he Kanaujas from the north side of the Jumna and called by this name.

(Extract from the Report of the Census, 1911.)

জিঝৌতিয়া শব্দের বর্ণনির্ণয় সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। প্রচলিত কোন সংজ্ঞার সহিত ইহার সঙ্গতি নাই। বুন্দেলখণ্ড ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহকে যুধবতী বলিত বলিয়া বোধ হয়। বিষ্ণুপুরাণে বিন্ধ্য, যমুনা ও নর্ম্মদার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশসমূহ যুধদেশ নামে উল্লিখিত হইয়াছে; এই সকল স্থানে জিঝৌতিয়াগণ প্রধানতঃ বাস করেন। সম্প্রতি জিঝৌতিয়াগণ তাঁহাদের জাতির মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত শ্রীনগর-মহোবায় সমবেত হইয়া এইরূপ স্থির করেন যে, তাঁহারা যুজহর সিংহ নামক কোন প্রাচীন রাজার নাম হইতে স্বীয় নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই যুজহর সিংহ বুন্দেলখণ্ডে বাস করিয়াছিলেন। তিনি তথায় কোন ব্রাহ্মণ দেখিতে না পাইয়া যমুনার উত্তর তীর হইতে কনৌজিয়াগণকে লইয়া আসেন; তাঁহারাই জিঝৌতিয়া নামে পরিচিত হন।

জিঝৌতিয়াদিগের মূল সমাজে কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত আছে। ৩, ১৩, ৫৩ এই তিন ঘরের মধ্যে ৩ ঘর উত্তম, ১৩ ঘর মধ্যম, এবং ৫৩ ঘর অধম। কনৌজিয়াদিগের ন্যায় জিঝৌতিয়াদের মধ্যে দীক্ষিত, দুবে বা দ্বিবেদী, তেওয়ারি বা ত্রিবেদী, চৌবে বা চতুর্ব্বেদী, পাণ্ডে, উপাধ্যায়, মিশ্র, বাজপেয়ী এবং পাঠক উপাধিবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান আছেন।

কুক সাহেব তাঁহার গ্রন্থে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের সেনসাস হইতে জিঝৌতিয়া ব্রাহ্মণগণের মোট সংখ্যা ৬১৬২২ জন নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার বিবরণ নিম্নে সঙ্কলিত হইল।

সাহারাণপুর	১
আগরা	১
ইটা	১
বেরিলি	৪
কাণপুর	৭৭
বান্দা	৭৩৪
হামিরপুর	৯৪৯৭
ঝাঁসি	২০৫১৯
জালৌন	১১১৪০
ল'িতপুর	১৬২৫৮
গাজিপুর	১৩২
গোরখ্পুর	৩১৮৪
ফয়জাবাদ	৭৪

গত ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের সেনসাস রিপোর্ট হইতে আগরা এবং অযোধ্যার সম্মিলিত প্রদেশ এবং মধ্যভারতের জিঝৌতিয়াদিগের সংখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি।

	পুরুষ	স্ত্রী
যুক্তপ্রদেশে মোট	৩৪,৩৩২	৩১,৯৩৭
ব্রিটিশ রাজ্যে মোট	৩৪,৩৩২	৩১,৯৪৩
আগরা প্রদেশে মোট	৩৪,৩২৪	৩১,৯৩৬
আগরা ডিবিসনে মোট	৩৩২	২৩৮
আগরা জেলায়	২	০

	পুরুষ	স্ত্রী
মথুরা জেলায়	১	০
ফরাক্কাবাদ জেলায়	৮৩	১৫৭
মৈনপুরী জেলায়	১৮৯	৬২
এটোয়া জেলায়	৫৭	১৯
রোহিলখণ্ড ডিবিসনে মোট	০	০
এলাহাবাদ ডিবিসনে মোট	৩০১০২	২৭৫৮৬
এলাহাবাদ জেলায়	৩	৩
কানপুর জেলায়	৪৭	২৭
বান্দা জেলায়	৯৩	১২৩
হামিরপুর জেলায়	৮,৫০২	৭,৯৯১
ঝাঁসি জেলায়	১৬,৮৪৭	১৫,৪৫১
জালৌন জেলায়	৪,৬১০	৩,৯৯০
বেনারস ডিবিসনে মোট	১০৬	৬৪
বেনারস জেলায়	০	৩
গাজীপুর জেলায়	১০৬	৬১
গোরক্ষপুর ডিবিসনে মোট	৩,৭৭২	৪,০৩৩
গোরক্ষপুর জেলায়	২,৬৮৬	২,৯৪৮
বস্তি জেলায়	১,০৮৬	১,০৮৬
কুমায়ুন ডিবিসনে মোট	০	০
অযোধ্যা প্রদেশে মোট	৮	৭
লক্ষ্ণৌ ডিবিসনে মোট	০	০
ফয়জাবাদ ডিবিসনে মোট	৮	৭
ফয়জাবাদ জেলায়	৮	৭

	পুরুষ	স্ত্রী
দেশীয় রাজ্যে মোট	০	১৪
রামপুর রাজ্যে	০	১৪
মধ্যভারতে মোট	৬৩,০০০	
মালব দেশে মোট	৮,৪০০	
উত্তর গোয়ালিয়র এবং বুন্দেলখণ্ডে	৫৩,৮০০	
বাঘেল খণ্ডে	৮০০	

জিঝৌতিয়া ব্রাহ্মণগণ বর্ত্তমান সময়ে নানা কারণে নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেও জিঝৌতিকেই তাঁহাদের প্রধান সমাজ বলিয়া উল্লেখ করেন।

বাঙ্গালা দেশে জিঝৌতিয়া ব্রাহ্মণের আগমনের কথা

শেরশাহ কালিঞ্জর নগর অধিকার করিলে, অনেকগুলি বড় বড় জিঝৌতিয়া পরিবার দেশত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বাস করিয়াছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে সবিতারায় নামক এক ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা দেশে আগমন করেন। অম্বররাজ মানসিংহ দিল্লীশ্বর আকবর কর্ত্তৃক ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বিহারে অবস্থান করিয়া গিধোরের জমিদার পূরণমল্ল ও খরগপুরের জমিদার সংগ্রামসিংহ সহায়কে দমন করেন। তাঁহার বক্সিরূপে সবিতাচাঁদ তাঁহার সহিত বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছিলেন।

কোচবিহারের অধিপতি রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ মানসিংহকে ভগিনী সম্প্রদান করিয়া দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করেন। তাঁহার আত্মীয়জন ও সামন্তবর্গ এই কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে উদ্যোগ করিলে

মানসিংহ ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে হেজাজখাঁকে সেনাসহ কোচবিহারে প্রেরণ করেন। হেজাজখাঁ রাজাকে মুক্ত করিয়া স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসেন। সবিতা-রায় ঐ সময়ে হেজাজ খাঁর সহকারিরূপে কোচবিহারে যুদ্ধার্থ উপস্থিত ছিলেন।

শাহবাজখাঁ খরগপুরের বিদ্রোহী জমিদারকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাকে মোগলের বশ্যতা স্বীকার করাইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে সম্ভবতঃ সবিতারায় তাঁহার সহকারিরূপে উপস্থিত ছিলেন।

কিঞ্চিদধিক দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বংশীবদন নামক এক ব্রাহ্মণ কবি সংস্কৃত শ্লোকে ফত্তেসিংহ রাজবংশের একখানি কুলপঞ্জিকা রচনা করিয়াছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সেই পুঁথিখানি অবলম্বন করিয়া গত ১৩০৭ বঙ্গাব্দে "পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন; ঐ গ্রন্থে বংশীবদনবিরচিত নিম্নবর্ণিত শ্লোকগুলি হইতে আমরা সবিতা রায় সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি।

রাজশ্রীমানসিংহঃ ক্ষিতিপতিতিলকঃ শ্রীলদিল্লীশ্বরেণ
যাবদ্বঙ্গীয়দুষ্টক্ষিতিপতি বিজয়ায়ৈব সংপ্রেষিতো যঃ।
তৎসাহায্যং চিকীর্ষুঃ স্বয়মিহ সবিতারায় এষ প্রতাপী
পুত্রাভ্যাং বঙ্গমাগাৎ ত্রিভুবনজয়শীলৈশ্চ পৌত্রৈশ্চতুর্ভিঃ ॥
যুদ্ধে শ্রীসবিতা স্ববন্ধুভিরলং দুষ্টান্ ক্ষিতীশানরীন্
কোচাড়্-কোচবিহার-দুর্জ্জয়-খরগ্পুরাদি-দেশস্থিতান্।
আরূঢ়ঃ কবচী মরুজ্জবহয়ং চর্ম্মাসিমাত্রাশ্রয়ো
জিত্বাসৌ সমতোষয়চ্চ নৃপতিং বিখ্যাপয়ন্ শূরতাম্ ॥

ততশ্চ রায়ঃ সবিতা নৃপাণাং
ভূমৌচ রাজ্ঞোহধিকৃতো বভূব।
রাজা পুনঃ প্রীতমনাস্তমূচে
ধীমানসৌ শ্রীযুতমানসিংহঃ ॥

আগচ্ছ ত্বরিতং সহৈব ময়কা দিল্লীশমুর্ব্বীপতিং
পত্নীং ভোগবিধাবতীবকুশলাং সম্পাদয়িষ্যে ততঃ।
শ্রুত্বৈতন্নৃপভাষিতঞ্চ সবিতা তঞ্চাহ হৃষ্টঃ স্বয়ং
গন্তাহং ভবতা সহৈব হি মমাপীচ্ছাপি চৈতাদৃশী॥
যাস্যন্ ভূপতিনা সহৈব সবিতা বাঞ্ছন্ প্রিয়াণাং প্রিয়ং
পুত্রাদীনবদৎ স্বয়ং হি সকলান্ প্রায়ঃ প্রতিজ্ঞাপয়ন্।
বুদ্ধ্যৈশ্বর্য্যবলাদয়ো ন হি গুণাশ্চৈকত্র তিষ্ঠন্ত্যতো
যুষ্মাকস্ত্বিহ মৎকৃতেষু নিখিলেষ্বাস্তাং সমা স্বামিতা॥
যোগ্যং যস্য যদেব তত্তু কুরুত স্বীয়ং হি কার্য্যং সদা
নিঃশঙ্কং বসত প্রমাদরহিতা অস্যাধিকারস্য চ।
পত্নী সর্ব্বরসাধিকাঽবিশয়িতা কার্য্যা মমৈবাখ্যয়া
সর্ব্বেষামিহসর্ব্বভূমিবিষয়া ভূয়াচ্চ বঃ স্বামিতা॥
গত্বা তত্র ততং পরন্তু সবিতা রায়ো হি দিল্লীশ্বরাৎ
পত্নীং প্রীতিকরীং কুলস্য পরমং সংপাপ্য যত্নেন সঃ।
কায়স্থাবনীপালশূরসয়িদান্ যুদ্ধে তথা হড্ডিপান্
ফত্তেসিংহমুখক্ষিতাবধিকৃতো জাতো হি জিত্বৈব তান্॥
পুত্রাভ্যাং সবিতা ক্ষিতিং বহুসরং পৌত্রৈঃ প্রপৌত্রৈস্তথা
ভুক্ত্বা ভোগ্যবতীং স্ববাহুকলিতাং রায়স্ততোঽস্তং গতঃ।
পুত্রাস্তা বুভুজুশ্চ কামবশতো নির্ম্মায় নানাপুরীঃ
কর্ত্রাজ্ঞাপ্রতিপালকাঃ কিল পৃথগ্‌ভাবাদৃতে মেদিনীম্॥

পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা ২-৪ পৃষ্ঠা

১। ক্ষিতিপতিতিলক রাজা মানসিংহ দিল্লীশ্বরকর্ত্তৃক বঙ্গদেশের দুষ্ট নৃপতিগণের বিজয়ের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার সাহায্য

করিবার জন্য প্রতাপবান্ সবিতা রায় দুই পুত্র ও ত্রিলোকজয়শীল চারি পৌত্রের সহিত বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন।

২। সবিতা রায় বায়ুবেগ অশ্বে আরোহণ করিয়া কবচ ধারণ করিয়া অসিচর্ম্মমাত্র আশ্রয়ে আপন বন্ধুগণসহকারে কোচাড়, কোচবিহার, খরগপুর প্রভৃতি দেশের দুর্জ্জয় দুষ্ট শত্রু রাজগণকে জয় করিয়া আপনার বীরত্ব বিস্তার করিলেন ও রাজা মানসিংহের প্রীতি জন্মাইলেন।

৩। তদনন্তর সবিতা রায় সেই সকল রাজার ভূমি অধিকার করিলে ধীমান্ রাজা মানসিংহ প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন।

৪। তুমি অবিলম্বে আমার সহিত পৃথ্বীপতি দিল্লীশ্বরের নিকট চল। সেখানে তোমার জন্য ভূমিভোগার্থ সুবিহিত পত্রী (সনন্দ) দেওয়াইব। মানসিংহের কথা শুনিয়া সবিতা বলিলেন, আমারও সেই ইচ্ছা; আপনার সহিতই আমি যাইব।

৫। সবিতা মানসিংহের সহিত যাইবার সময় আপনার পুত্রগণের মঙ্গল কামনায় তাঁহাদিগকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া বলিলেন, বুদ্ধি, ঐশ্বর্য্য, বল প্রভৃতি গুণ সর্ব্বদা একাধারে থাকে না; এই জন্য আমার উপার্জ্জিত সম্পত্তিতে তোমাদের সকলের সমান অধিকার থাকিবে।

৬। তোমরা সকলে যাহার যেমন যোগ্য কার্য্য সম্পাদন কর, ও নিঃশঙ্ক ও প্রমাদশূন্য হইয়া বাস কর। আমি আপন নামে নির্দ্দোষ ও নিশ্ছিদ্র সনন্দ আনিব। তোমরা সকল ভূমি সমান অধিকারে ভোগ করিবে।

৭। তৎপরে সবিতা রায় দিল্লীশ্বরসমীপে গমন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে যত্নসহকারে আপন বংশের প্রীতিউৎপাদক সনন্দ প্রস্তুত করিয়া লইলেন। পরে কায়স্থ রাজাকে ও শূর সৈয়দগণকে ও হাড়িগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ফত্তেসিংহ ভূমি অধিকার করিলেন।

৮। সবিতা পুত্রদ্বয় ও পৌত্রগণ ও প্রপৌত্রগণ সহিত বহু বৎসর

বাহুবলে উপার্জ্জিত ভোগ্যবস্তু সমন্বিত ভূমিভোগ করিয়া অস্ত গেলেন। পুত্রগণ ও কর্ত্তার আজ্ঞামতে একান্নভুক্ত থাকিয়া ইচ্ছামত নানা গ্রাম নির্ম্মাণ করিয়া সম্পত্তি ভোগ করিতে থাকিলেন।

বাঙ্গালা দেশে মোগল অধিকার স্থাপনার সমকালে সবিতারায় ১০০৭ বঙ্গাব্দে বাদশাহের নিকট হইতে সনন্দ লইয়া ফত্তেসিংহে বাস করেন। ঐ সময়ে আমরা বঙ্গে প্রথম জিঝৌতিয়া ব্রাহ্মণদিগের উপনিবেশ স্থাপনের সময় বলিয়া মনে করিতে পারি।

বাঙ্গালায় আসিবার পূর্ব্বে সবিতারায়ের নিবাস কোথায় ছিল জানা যায় না। এই সবিতারায়ই বাঙ্গালা দেশের ফত্তেসিংহ জিঝৌতিয়া সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার কুলোপাধি 'দীক্ষিত', গোত্র 'পুণ্ডরীক', প্রবর 'পুণ্ডরীক অঘমর্ষণ অসিত দেবরাত বৈশম্পায়ন'। ঐ সবিতারায়ের প্রতিষ্ঠিত রাজ-বংশকে আশ্রয় করিয়া ঐ সময়ে এবং তাহার পরবর্ত্তীকালে কয়েক ঘর জিঝৌতিয়া, কণৌজিয়া, মৈথিল ও ভূমিহার ব্রাহ্মণ এবং রাজপুত ক্ষত্রিয়-জাতি বাঙ্গালা দেশে আসিয়া ফত্তেসিংহ অঞ্চলে বাস করিয়াছিলেন।

ফত্তেসিংহ বংশের প্রতিষ্ঠাতা সবিতারায় সম্বন্ধে কিংবদন্তী যাহা এখনও প্রচলিত আছে, তাহা এইরূপ।

আকবর শাহের সময়ে এই প্রদেশ একজন হাড়ি রাজার অধীন ছিল। হাড়ি রাজার নাম ফত্তেসিংহ; তদনুসারে প্রদেশের নাম ফত্তেসিংহ। হাড়ি রাজার রাজধানী ফত্তেপুর গ্রাম কান্দির দক্ষিণপশ্চিমে তিন ক্রোশমধ্যে। হাড়ি রাজা বাদশাহের বিরুদ্ধাচারী ছিলেন। রাজা মানসিংহ এই পথে যাইবার সময় হাড়ি রাজাকে দমন করেন। মানসিংহের সেনাধ্যক্ষ অথবা বক্সি সবিতারায় হাড়ি রাজাকে পরাস্ত করেন; ফত্তেপুর হইতে অনতিদূরে যেখানে হাড়িবংশের ধ্বংস হয়, সে স্থানকে অদ্যাপি মুণ্ডমালা বলে। সবিতা-রায় পুরস্কারস্বরূপ ফত্তেসিংহ পরগণা ও পলাশী পরগণা লাভ করেন।

বাঙ্গালা দেশে জিঝৌতিয়াদিগের বাসভূমি ফত্তেসিংহের কথা

ফত্তেসিংহ বর্ত্তমান মুরশিদাবাদ জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশস্থিত একটি বিস্তৃত পরগণা। পূর্ব্বে ইহার আয়তন বহু বিস্তৃত থাকিলেও এক্ষণে সদর ও কান্দি সবডিবিসনের সীমার মধ্যে পরগণাটি অবস্থিত। অধুনা কান্দি ও ভরতপুর থানার প্রায় সমগ্রভাগ এবং বড়োঁয়া, গোকর্ণ, খড়গ্রাম সুজাগঞ্জ ও বেলডাঙ্গা থানার কিয়দংশ লইয়া ফত্তেসিংহ পরগণা। ইংরাজ অধিকারের প্রথম সময়ে কয়েকটি বড় বড় খণ্ড ফত্তেসিংহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক্ পৃথক্ পরগণার সৃষ্টি করিয়াছে। রাধাবল্লভপুর, কান্তনগর, গোপীনাথপুর, মুনিয়াডিহি প্রভৃতি পরগণাসকল ফত্তেসিংহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট ফত্তেসিংহ আবার দুইভাগ হইয়া, জেমো ও বাঘডাঙ্গা দুইটি স্বতন্ত্র রাজসংসারের সৃষ্টি করিয়াছে। জেমো ও বাঘডাঙ্গার বিবাদ নিষ্পত্তির সময় দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দসিংহ ও কান্তবাবু প্রভৃতি মীমাংসকগণ কর্ত্তৃক ফত্তেসিংহের ঐরূপ অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়াছিল।

আইন-ই-আকবরীতে সরকার শরীকাবাদ মধ্যে ফত্তেসিংহের উল্লেখ আছে। তৎকালে ফত্তেসিংহের রাজস্ব ২০৯৬৪৬০ দাম * ছিল।

ফত্তেসিংহে নিষ্কর সম্পত্তির পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। ফত্তেসিংহবাসী বহু লোক, রাজগণদত্ত সেই সকল নিষ্কর সম্পত্তি অদ্যাপি ভোগ করিতেছে। সবিতারায়ের বংশধরগণ ব্রাহ্মণ শূদ্র ও মুসলমান নির্ব্বিশেষে বহু নিষ্কর সম্পত্তি দান করিয়াছেন। ব্রাহ্মণদিগের প্রতিষ্ঠিত অনেক গৃহে দেবসেবা এবং মুসলমানদিগের পীরস্থানের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য রাজগণ বিস্তর সম্পত্তি দান করিয়াছেন এবং তাঁহারা স্থানে স্থানে অনেকগুলি শিবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সেবার জন্য ভূমিদান করিয়াছেন। ঐ শিবালয়ের অধিকাংশ

* ৪০ দামে এক টাকা।

অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ সকল দানোত্র ভূমি যত কাল ফত্তেসিংহ বাসিগণের ভোগাধিকারে থাকিবে, ততদিন সবিতারায়ের বংশধর ও উত্তরাধিকারিগণের কীর্ত্তি এতদঞ্চলে অক্ষুণ্ণ রহিবে।

রেনেল সাহেবের মানচিত্রে উত্তরে রাজসাহী, দক্ষিণে বর্দ্ধমান, পূর্ব্বে ভাগীরথীর পরপারে নদীয়া, এবং পশ্চিমে বীরভূম এই চারিটি প্রকাণ্ড জমিদারীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে ফত্তেসিংহের স্থান চিত্রিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান ফত্তেসিংহের সীমা মোটামুটি এইরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়,—উত্তরে ময়ূরাক্ষী-সংযুক্তা দ্বারকা নদী, পূর্ব্বে ভাগীরথী, পশ্চিমে ময়ূরাক্ষী নদী, এবং দক্ষিণ সীমা কিছুদূর পার হইয়া গেলে অজয় নদ।

ফত্তেসিংহের নামোৎপত্তির সম্বন্ধে স্থানীয় জনশ্রুতি আছে যে, ঐ অঞ্চল ফত্তেসিংহ নামে একজন হাড়ি রাজার অধীনে ছিল। সবিতারায় ঐ হাড়ি রাজাকে পরাস্ত করিয়া ফত্তেসিংহ অধিকার করিয়াছিলেন। ঐ হাড়ি রাজার নাম অনুসারে এই অঞ্চলের নাম ফত্তেসিংহ হইয়াছিল।

ব্লকম্যান সাহেব তাঁহার বাঙ্গালার ভৌগলিক বিবরণ নামক গ্রন্থে অনুমান করিয়াছেন যে, বাঙ্গালার পাঠান অধিপতি ফতেশাহ ও বরবক শাহ হইতে ফত্তেসিংহ ও বরবক সিংহ নামক দুইটি সন্নিহিত পরগণার নামকরণ হইয়াছে।

হাণ্টার তাঁহার Annals of Rural Bengal গ্রন্থে বীরভূমি সম্বন্ধে যে জনশ্রুতি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, পশ্চিম প্রদেশ হইতে বীরসিংহ ও ফত্তেসিংহ নামক দুই ভ্রাতা এই প্রদেশে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম অনুসারে বীরভূমি ও ফত্তেসিংহ নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

বর্ষার সময় ফত্তেসিংহ ভূমির অনেক স্থান জলমগ্ন হয়। ময়ূরাক্ষী ও দ্বারকা নদী ছোটনাগপুরের সন্নিহিত পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া বীরভূমির মধ্য দিয়া বহু শাখা প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক ফত্তেসিংহে প্রবেশ করিয়াছে। বর্ষাকালে তাহাদের জলপ্রবাহ ফত্তেসিংহ প্রদেশকে প্লাবিত করিয়া গঙ্গায়

পতিত হয়। ময়ূরাক্ষী নদী দ্বারকার সহিত মিলিত হইয়া দক্ষিণমুখে প্রায় কাটোয়ার নিকট পর্য্যন্ত গিয়া গঙ্গায় মিশিয়াছে। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্ত্তীস্থান উচ্চভূমি। এই উচ্চভূমি ও পশ্চিম রাঢ়ের উচ্চ ভূমির মধ্যে যে নিম্নভূমি আছে, দ্বারকা ও ময়ূরাক্ষী নদীর জল বর্ষাকালে তথায় সঞ্চিত হইয়া একটা প্রকাণ্ড হ্রদে পরিণত হয়। এই নিম্নভূমি, পশ্চিমে জেমোকান্দি ও পূর্ব্বে ভাগীরথীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। ইহার নাম হিজোল। হিজোল পূর্ব্বকালে আরও নিম্নভূমি ছিল, ইহার আয়তনও অধিকতর বিস্তৃত ছিল। দ্বারকা ও ময়ূরাক্ষী নদীর আনীত মৃত্তিকায় বৎসর বৎসর ইহা পূরিয়া উঠিতেছে।

ফতেসিংহের প্রধান স্থানের নাম কান্দি। জেমো ও কান্দি একত্র করিয়া জেমোকান্দি বলাও রীতি আছে। জেমোকান্দি ভাগীরথীতীর হইতে চারিক্রোশ পশ্চিমে উত্তরবাহিনী ময়ূরাক্ষী নদীর পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত। ইহা একটি বর্দ্ধিষ্ণু জনপদ। এখানে সবডিবিসনাল কোর্ট ও দুইটি দেওয়ানি কোর্ট আছে। একটি উচ্চ শ্রেণির ইংরাজী বিদ্যালয় ও উৎকৃষ্ট চিকিৎসালয়ের অবস্থানে স্থানটি উন্নতিশীল। কান্দি মিউনিসিপালিটীর মধ্যে কান্দি, জেমো, বাঘডাঙ্গা, ছাতিনাকান্দি ও রসোড়া নামক পাঁচটি বিভাগ আছে। কিঞ্চিদূন দ্বাদশ সহস্র লোক ঐ পাঁচটি বিভাগে বাস করে। জেমোকান্দি ফতেসিংহ রাজগণের বাসভূমি।

ফতেসিংহের অন্তর্গত জেমো, কান্দি, বাঘডাঙ্গা, ছাতিনাকান্দি, রসোড়া, পাঁচথুপী, যজান প্রভৃতি স্থানে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের সমাজ বর্ত্তমান উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের পূর্ব্বপুরুষ সোমেশ্বর ঘোষ ও অনাদিবর সিংহের বংশধরগণ ফতেসিংহের মধ্যে বাস করেন। স্থানীয় সমাজে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণেরও বেশ প্রতিপত্তি আছে।

অনাদিবর সিংহের বংশধর সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও

তাঁহার পৌত্র পুণ্যশ্লোক লালাবাবু কান্দির অধিবাসী ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের বংশধরগণ কলিকাতা প্রবাসী হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়া কান্দির উন্নতি। কান্দির রাজবংশের মহানুভব উদারচরিত রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও: কুমার গিরিশচন্দ্রের নাম ফতেসিংহবাসিগণ চিরকাল কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির সহিত স্মরণ করিবে।

সবিতারায় যে কায়স্থ অবনীপালকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ অনাদিবর সিংহের বংশ হইতে তাঁহার উদ্ভব হইয়াছিল।

পাঠান রাজত্বকালে ফতেসিংহে মুসলমান প্রাধান্য ঘটিয়াছিল। ফতেসিংহ বাসী অনেক পরিবার ঐ সময়ে মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করে। ফতেসিংহের দক্ষিণাংশে অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত মুসলমানবংশ বাস করিতেছেন। সবিতারায় সৈয়দবংশীয় সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণের হস্ত হইতে ফতেসিংহের কতিপয় অংশ অধিকার করিয়াছিলেন।

ফতেসিংহ পরগণার উত্তর প্রান্তবর্ত্তী গোকর্ণ থানার পূর্ব্বে ভাগীরথী তীরে "রাঙ্গামাটী" নামে একখানি গ্রাম আছে। ঐ গ্রামখানি প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কান্দি হইতে উত্তর পূর্ব্বে সাতক্রোশ দূরে বহরমপুরের কিছু দক্ষিণে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে একটি রক্তবর্ণ উচ্চভূমির উপর ঐ গ্রামখানি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। জনশ্রুতি এই যে, লঙ্কার বিভীষণ আসিয়া স্বর্ণবৃষ্টি করিয়াছিলেন, তদবধি ভূমির বর্ণ লাল। এই রক্তবর্ণ মৃত্তিকা বীরভূমির লাল মাটীর পূর্ব্ব সীমান্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। বাঙ্গালার ব-দ্বীপের পশ্চিম সীমায় এই লাল মাটী। ছোটনাগপুরের পাহাড় মধ্যে বিদ্যমান লোহার সংস্পর্শে মৃত্তিকার বর্ণ এইরূপ; ময়ূরাক্ষী দ্বারকা প্রভৃতি রাঢ়ের নদীর জল এই কারণে রক্তবর্ণ। রাঙ্গামাটী গ্রামে প্রাচীনকালে কোন সমৃদ্ধ রাজার রাজধানী ছিল। প্রাচীন অট্টালিকাদির অবশেষ অদ্যাপি তথায় বর্ত্তমান। রাজবাড়ী, রাক্ষসীডাঙ্গা প্রভৃতি

স্থান প্রাচীন স্মৃতির পরিচায়ক। কৃষকেরা ভূমি কর্ষণ করিতে করিতে মাঝে মাঝে প্রচীন মুদ্রাদি পাইয়া থাকে।

লেয়ার্ড, বেভারিজ প্রভৃতি ইংরাজ পণ্ডিতগণ রাঙ্গামাটীর প্রাচীন তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন। হাণ্টারের Statistical Account of Bengalএর মুর্শিদাবাদ খণ্ডে তৎকালসংগৃহীত সংবাদ লিপিবদ্ধ আছে। মুর্শিদাবাদের ভূত-পূর্ব্ব জজ প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বেভারিজ সাহেব বলেন, রাঙ্গামাটী প্রাচীন কর্ণ-সুবর্ণ রাজ্যের রাজধানী। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত কর্ণ-সুবর্ণ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তৎকালে হর্ষবর্দ্ধন আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ ছিলেন; তাঁহার সহিত নরেন্দ্র গুপ্তের বিরোধ ঘটিয়াছিল, তিনি যুদ্ধে হর্ষ-বর্দ্ধনের নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন। বাণভট্ট প্রণীত হর্ষচরিতে নরেন্দ্রগুপ্ত গৌড়েশ্বর নামে অভিহিত হইয়াছেন। গৌড়েশ্বর হর্ষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধনকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া হত্যা করেন। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতি-শোধার্থ হর্ষবর্দ্ধন কর্ণসুবর্ণ আক্রমণ করিয়া গৌড়েশ্বরকে পরাভূত করেন।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েংচাং কর্ণ-সুবর্ণের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তৎকালে উক্ত স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের যথেষ্ট প্রচার ছিল। রাক্ষসীডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান বৌদ্ধমঠের ভগ্নাবশেষ বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। নরেন্দ্র গুপ্ত ঘোর বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন, তাঁহার শাসনকালে কর্ণসুবর্ণ রাজ্যে বৌদ্ধদিগকে বিশেষভাবে নিপীড়িত হইতে হইয়াছিল। হুয়েংচাংএর সময় বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশঃ তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম্মে পরিণত হইতেছিল। আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বত্রই ঐ সময়ে বৌদ্ধ মঠসকল বৈষ্ণব বা শাক্ত মঠে পরিণত হইতেছিল এবং বৌদ্ধ দেবমূর্ত্তিসকল হিন্দু দেবদেবীর নাম ও সংজ্ঞা গ্রহণ করিতেছিল।

সম্ভবতঃ পালরাজদিগের শেষ সময়ে বৌদ্ধ উপাসনা বিকৃত হইয়া ধর্ম্মপূজাতে পরিণত হইতেছিল। ফতেসিংহ অঞ্চলে অদ্যাপি ধর্ম্মপূজা বিস্তৃত

ভাবে প্রচলিত রহিয়াছে। অধিকাংশ গ্রামেই বৈশাখী পূর্ণিমায় ক্বচিৎ বা জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় ধর্ম্মরাজ ঠাকুরের বিশেষ পূজা হয়। নিম্নশ্রেণীর লোকে পরম উৎসাহের সহিত ঐ পূজায় যোগদান করিয়া থাকে। ধর্ম্মরাজের পূজা উপলক্ষে যে সকল অনার্য্যজনোচিত বীভৎস ব্যাপারের অনুষ্ঠান করা হয়, ডাক্তার ওয়াডেল বলেন, তিব্বত ও সিকিম প্রদেশের প্রচলিত বৌদ্ধ লামা ধর্ম্মের বিবিধ অনুষ্ঠানের সহিত তাহাদের বিস্ময়কর সাদৃশ্য আছে।

চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তীকালে ফত্তেসিংহ অঞ্চলে বৈষ্ণব মতের প্রতিষ্ঠা ঘটে। মালিহাটি গ্রামে বৈষ্ণবপ্রধান শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধরগণ বাস করেন। ঐ বংশের রাধামোহন ঠাকুর "পদামৃতসমুদ্র" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। "পদকল্পতরুর" সঙ্কলনকর্ত্তা কৃষ্ণকান্ত মজুমদার ও গোকুলানন্দ সেন টেঁয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। মনোহরসাহী কীর্ত্তনের জন্যও ফত্তেসিংহের প্রসিদ্ধি আছে।

ফত্তেসিংহের জমিদারগণ প্রজাবৎসল ও দানশীল বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহারা অনেকে নূতন নূতন গ্রাম ও জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, ঐ সকল গ্রাম ও জলাশয় স্থাপয়িতাদের নাম গ্রহণ করিয়া অদ্যাপি তাঁহাদের গৌরব প্রকাশ করিতেছে।

ফত্তেসিংহের জিঝৌতিয়া সমাজের কথা

ফত্তেসিংহের জিঝৌতিয়া সমাজের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সকলেই মাধ্যন্দিন শাখাধ্যায়ী শুক্ল যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ। ইঁহারা জমিদারী, লাখেরাজ, জোত জমি ইত্যাদি ভূসম্পত্তিজাত আয় হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। দুই চারিজন কৃতী পুরুষের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির কথা ছাড়িয়া দিলে, সমাজের অধিকাংশ পরিবার তাহাদের ভূমি সম্পত্তি সবিতারায়ের বংশধরগণের নিকট হইতে দানসূত্রে অথবা ব্যবস্থামত প্রাপ্ত হইয়া ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

অধ্যাপনা ও যাজনবৃত্তি সকল পরিবারই পরিত্যাগ করিয়াছেন, কাজেই কনৌজিয়া বা মৈথিল শ্রেণির ব্রাহ্মণ হইতে তাঁহাদিগকে পুরোহিত গ্রহণ করিতে হয়। কোন শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক যজনানুষ্ঠান একবারে চলিতে পারে না। শূদ্রের দান গ্রহণ কিংবা শূদ্রের বাড়ী ভোজন করা তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। মূল সমাজে তান্ত্রিক দীক্ষাগ্রহণ প্রথা প্রচলিত নাই। জিঝৌতিয়াগণ বাঙ্গালাদেশে আসিয়া বাঙ্গালীদিগের অনুকরণে বাঙ্গালী গুরুর নিকট হইতে তন্ত্রমতে শক্তি বা বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি আচারঅনুষ্ঠান তাঁহাদিগের স্বশাখানুযায়ী গৃহ্য কর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে সম্পাদিত হয়। স্বশাখানুযায়ী গৃহ্য কর্ম্মের পদ্ধতি অনেকগুলি চলিত আছে, তন্মধ্যে ভরদ্বাজ গোত্রীয় নারায়ণ দ্বিবেদিকৃত দশকর্ম্মপদ্ধতি প্রধান।

জিঝৌতিয়াগণ বঙ্গদেশে প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা ও প্রচলিত আচার ব্যবহার অবিচারিতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু বিবাহাদি সংস্কারবিষয়ে ইঁহারা সকলেই বাঙ্গালীদিগের সহিত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। শাস্ত্রীয় কর্ম্মকাণ্ড এবং কুলাচার সবই পশ্চিম দেশের পদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়।

ভাষা ও পরিচ্ছদে ফত্তেসিংহের পশ্চিমা ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিবেশী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ হইতে পৃথক্ করিয়া চিনিবার উপায় নাই। ইঁহাদের গৃহে নিত্য নৈমিত্তিক দেবসেবা ঠিক প্রতিবেশী বাঙ্গালীদিগের ন্যায় অনুষ্ঠিত হয়। শাক্তগণের গৃহে দুর্গোৎসব, শ্যামাপূজা প্রভৃতি উপলক্ষে ছাগ, মেষ, মহিষ বলি দেওয়া হয়। বৈষ্ণবগণ কেহ কেহ বৈষ্ণব গোস্বামী শিষ্যদের অনুগমন করেন, কিন্তু তান্ত্রিক কদাচার বা বৈষ্ণব অনাচার এখনও জিঝৌতিয়াদিগের গৃহে প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই।

পশ্চিম হইতে আসিয়া যে কয়ঘর জিঝৌতিয়া কণৌজিয়া, মৈথিল ও ভূমিহার ফত্তেসিংহে বাস করিয়াছেন, তাঁহারা স্থানীয় সমাজে "পশ্চিমা

ব্রাহ্মণ” নামে কথিত হন। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা “বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ” নামে পরিচিত। উপনিবিষ্ট পশ্চিমা ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা অধিক নহে, তাঁহাদের সমাজ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ। পশ্চিম দেশে ভিন্ন সমাজের ব্রাহ্মণদিগের সহিত চলিবার রীতি আছে কি না জানি না। বাঙ্গালী রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রের মধ্যে সম্মিলন অসম্ভব। উপনিবিষ্ট পশ্চিমাদের মধ্যে সংখ্যার অল্পতা হেতু ঐরূপ অসম্ভব অনেকটা সম্ভব হইয়াছে।

ফত্তেসিংহের জিঝৌতিয়েরা স্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য শ্রেণীতে কন্যা দান করিতেন না; কিন্তু ভিন্ন শ্রেণীর কন্যা গ্রহণ করিতে আপত্তি করিতেন না। অধুনা তাঁহারা ভিন্ন শ্রেণীতে কন্যা দান করিতে বাধ্য হইতেছেন। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদিগের সহিত এখনও কোনরূপ আদান প্রদান চলে নাই।

বাঙ্গালায় আসিয়া জিঝৌতিয়া ব্রাহ্মণদিগের বংশবিস্তার ঘটিল না। বাঙ্গালার জলবায়ুর কারণে, অথবা অন্য কোন কারণে বলিতে পারি না, অনেক জিঝৌতিয়া পরিবারের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। বৈদ্যনাথ ঝার খণ্ডে কতকগুলি জিঝৌতিয়া ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করেন। তথা হইতে এক ঘর জিঝৌতিয়া ব্রাহ্মণ প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে ফত্তেসিংহ রাজবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া ফত্তেসিংহের অন্তর্গত জেমোতে আসিয়া বাস করিয়াছেন। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ঐ সমাজের সহিত ফত্তেসিংহ সমাজের কুটুম্বিতা ছিল। বৈবাহিক সূত্রে আর এক ঘর মালবী ব্রাহ্মণও ঐ স্থান হইতে আসিয়া জেমোতে বাস করিয়াছিলেন, কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। মালদহ জেলায় এক ঘর জিঝৌতিয়া ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহাদের সহিত ফত্তেসিংহের জিঝৌতিয়া-দিগের কুটুম্বিতা আছে। সম্প্রতি তদ্বংশীয়েরা মালদহের বাস ত্যাগ করিয়া ফত্তেসিংহ ঢেঁয়া গ্রামে বাস করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালার অন্য কোন স্থানে

জিঝৌতিয়া ব্রাহ্মণের বাস আছে কি না, অবগত নহি ; ফত্তেসিংহ সমাজের নিকট তাহা অজ্ঞাত।

উদরান্ন সংস্থানের জন্য এখনও জিঝৌতিয়াদের স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন না হইলেও বৈষয়িক অথবা পারিবারিক বিষয়ে কাহারও উন্নতি নাই ; গৃহস্থগণের অবস্থা পূর্ব্বের অপেক্ষা অনেকাংশে হীনতর হইয়া পড়িয়াছে।

বিবাহের পূর্ব্বে তিলকদানের সময় বরের মর্য্যাদাস্বরূপ কন্যাপক্ষীয়গণ কিছু অর্থ দিতেন, ইহা সনাতন প্রথা। পূর্ব্বে এই অর্থের পরিমাণ যৎসামান্য ছিল, সংখ্যায় সাত হইতে পঁচিশ পর্য্যন্ত ছিল। রাজপরিবারেরা কেবল একশত টাকা মর্য্যাদা দিতেন। বরকে তিলকের সময় কিঞ্চিৎ অর্থ দেওয়া প্রথা পশ্চিম দেশের সকল সমাজে প্রচলিত আছে। অধুনা প্রতিবেশী বাঙ্গালীদিগের অনুকরণে সমাজে বরপণ স্বরূপ কুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে এবং পণের পরিমাণ দুইএক স্থলে সহস্র মুদ্রা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

সমাজে এতকাল ধরিয়া ইংরাজী শিক্ষার বিশেষ আদর অথবা প্রভাব ছিল না। অধুনা দেশে বহুল ইংরাজী শিক্ষার প্রচারফলে অনেকে ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাহার ফলে দুই চারিজন কৃতবিদ্য পুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহাদের সকলের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইংরাজী আচার স্থানীয় সমাজকে এখনও অভিভূত করিতে পারে নাই ; দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা উপস্থিত গ্রন্থে বর্ণিত মহাপুরুষের চরিত্র উল্লেখ করিতে পারি।

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদিগের সহিত অনেক স্থলে পশ্চিমাদের হুঁকা ব্যবহার চলিত আছে। উভয় সমাজের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ফলাহারে এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করেন ; কিন্তু সামাজিক ভাবে কেহ কাহারও স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করেন না। পশ্চিমাদের সহিত স্থানীয় সমাজ এতদিন বেশ সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন। দুঃখের বিষয় অধুনা এই সমাজ-বিদ্বেষের

কালে পূর্ব্বের সেই সদ্ভাবের বন্ধন তুই এক স্থলে শিথিল হইতে দেখা গিয়াছে। সমাজের মঙ্গলার্থ সমাজপতিগণের এ বিষয়ের প্রতীকার সাধনের নিমিত্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

ফত্তেসিংহে খাঁটি জিঝৌতিয়ার সংখ্যা নিতান্ত অল্প ; গণনা করিতে গেলে অধুনা ইঁহারা মূলত দ্বাদশ ঘর মাত্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এই মূল বার ঘর এক্ষণে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইয়া মোট বিয়াল্লিশটি ঘরের স্থষ্টি করিয়াছে। বুন্দেলখণ্ডের মূল সমাজের সহিত এক্ষণে ইঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই। সেই মূল সমাজের সহিত বহুদিন বিচ্ছেদ ঘটায় এই বিয়াল্লিশ ঘরের মধ্যে কাহারও কৌলিন্যমর্য্যাদা প্রকাশ করিবার উপায় নাই। আপনার কৌলিন্যমর্য্যাদার পরিচয়ও কেহ অবগত নহেন।

ফত্তেসিংহবাসী জিঝৌতিয়াগণের মূল বংশের নির্ঘণ্ট।

বাসস্থান	উপাধি	গোত্র	সংখ্যা
১। জেমো	দীক্ষিত	পুণ্ডরীক	১
২। জেমো	বাজপেয়ী	মেহরস্ (মেধস্ ?)	১
৩। জেমো	ত্রিবেদী	গর্গ	১
৪। মাধুনিয়া	তুবে	কাশ্যপ	১
৫। বহরা	ত্রিবেদী	গর্গ	১
৬। বহরা (কান্দি)	তুবে	শাণ্ডিল্য	১
৭। ব্রাহ্মণপাড়া	চৌবে	ভরদ্বাজ	১
৮। আন্দুলিয়া (জেমো)	ত্রিবেদী	গর্গ	১
৯। রায়পুর	তুবে	বাৎস্য	১
১০। টেঁয়া	ত্রিবেদী	বন্ধুল	১
১১। টেঁয়া	উপাধ্যায়	শাণ্ডিল্য	১
১২। বাছরা	মিশ্র	মেহরস্	১

উক্ত মোট মূল বার ঘর হইতে অধুনা ইঁহারা মোট বিয়াল্লিশ ঘরে পরিণত হইয়াছেন।

গোত্র	উপাধি	গ্রাম	সংখ্যা
পুরণ্ডীক	দীক্ষিত	জেমো	৫
		মাধুনিয়া	১
		কল্যাণপুর	১
বন্ধুল	ত্রিবেদী	জেমো	১
		টেঁয়া	৫
মেহরস্ (মেধস্)	বাজপেয়ী	জেমো	১
ঐ	মিশ্র	বাছরা	১
ভরদ্বাজ	চৌবে	জেমো	১
		ব্রাহ্মণপাড়া	৩
বাৎস্য	দুবে	জেমো	২
		আন্দুলিয়া	১
কাশ্যপ	দুবে	মাধুনিয়া	৪
গর্গ	ত্রিবেদী	বহরা	৯
		জেমো	৩
শাণ্ডিল্য	উপাধ্যায়	টেঁয়া	২
ঐ	দুবে	কান্দি	১

প্রথম অধ্যায়

পূর্ব্বপুরুষগণের কথা

মহারাষ্ট্র-মোগল-বিপ্লবে নিগৃহীত হইয়া মধ্যভারতের বুন্দেলখণ্ডবাসী অনেক গৃহস্থ পরিবার তাহাদের জন্মভূমির মমতা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল। মনোহররাম তেওয়ারি পুত্র হৃদয়রামের সহিত স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া, পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহারা ছোটনাগপুরের দুর্গম পর্ব্বতশ্রেণী ও বনভূমি অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালাদেশের ফত্তেসিংহে আসিয়া ফত্তেসিংহ-জিঝৌতিয়া সমাজের দলপুষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহারা টেঁয়াগ্রামে আপনাদের বাসস্থান নির্ব্বাচন করেন। টেঁয়াগ্রাম জেমোকান্দির অগ্নিকোণে প্রায় ছয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত। হৃদয়রাম ও মনোহররাম ঠিক কোন্ সময়ে আসিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করিবার উপায় নাই। বিগত দেড় শত বৎসর হইতে দুই শত বৎসরের মধ্যে আসিয়াছিলেন বলিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি।

হৃদয়রাম বন্ধুলগোত্র বন্ধুলাঙ্গিরস-বার্হস্পত্যপ্রবর যজুর্ব্বেদান্তর্গত মাধ্যন্দিন শাখাধ্যায়ী জিঝৌতিয়া ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম ফুলমণি। ফুলমণির গর্ভে হৃদয়রামের একটি পুত্র জন্মিয়াছিল, সেই পুত্রের নাম দয়ারাম। দয়ারামের পত্নী অভয়াদেবী; তাঁহাদের বিশেষ বিবরণ আমরা কিছু সংগ্রহ করিতে পারি নাই। গদাধর, বৈদ্যনাথ, বিশ্বনাথ

ও রামনারায়ণ নামে তাঁহাদের চারিটি পুত্র ও মোহনমোহিনী নামে একটি কন্যা জন্মিয়াছিল।

জ্যেষ্ঠ গদাধরের পত্নী অম্বিকা দেবীর গর্ভে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই। দ্বিতীয় ভ্রাতা বৈদ্যনাথের পত্নী ত্রিপুরা দেবী; তাঁহার গর্ভে নবকিশোর ও বলভদ্র নামে দুই পুত্র হয়। তৃতীয় ভ্রাতা বিশ্বনাথ নিঃসন্তান ছিলেন। কনিষ্ঠ রামনারায়ণ দুই বিবাহ করিয়াছিলেন; প্রথমা পত্নীর নন্দকিশোর ও রাজকিশোর নামে দুই পুত্র হয়। দ্বিতীয়া পত্নী পার্ব্বতীদেবীর গর্ভে হরিশ্চন্দ্র, পরেশনাথ, রাধামাধব ও মধুসূদন এই চারি পুত্র ও পাঁচুমণি নামে এক কন্যা জন্মিয়াছিল। মাধুনিয়া নিবাসী রামশঙ্কর দুবের সহিত পাঁচুমণির বিবাহ হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ গদাধর দ্বিতীয় ভ্রাতার কনিষ্ঠ পুত্র বলভদ্রকে এবং নিঃসন্তান তৃতীয় ভ্রাতা বিশ্বনাথ কনিষ্ঠ ভ্রাতার দ্বিতীয় পুত্র রাজকিশোরকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগিনী মোহনমোহিনীর সীতারাম ত্রিবেদীর সহিত বিবাহ হইয়াছিল। হরচন্দ্র (ফকীর বাবু) নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল। তাঁহাদের কথা পরে বলা হইবে।

গদাধর দিনাজপুরে ব্যবসায় বাণিজ্য এবং মহাজনী কার্য্য করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ইংরাজ রাজত্ব স্থাপনা কালে, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর ইজারাদারদিগের বর্ব্বরোচিত অত্যাচারের ফলে উত্তর বঙ্গ শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। তদবস্থায় গদাধরের দিনাজপুরে কার্য্য চালাইবার সুবিধা নষ্ট হয়; তিনি তথাকার কার্য্য বন্ধ করিয়া জন্মস্থান টেঁয়াগ্রামে ফিরিয়া আসেন। তিনি তীক্ষ্ণ ধী-শক্তিসম্পন্ন বিষয়ী লোক ছিলেন, তাঁহার কর্ম্মদক্ষতার কথা অচিরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। কিছুকাল পরে তদানীন্তন ফত্তেসিংহের (জেমোর) রাজা নীলকণ্ঠ সীতারাম ত্রিবেদী এবং গদাধর ত্রিবেদীকে তাঁহার পুত্রগণের ও সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত

করিয়া যান। গদাধর তৎপূর্ব্বে কর্ম্মসূত্রে জেমোর রাজসংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, বিশেষ দক্ষতার সহিত নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছিলেন।

গদাধর টেঁয়া গ্রামে বাসোপযোগী একখানি সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন, তদ্বংশধরগণ অধুনা ঐ অট্টালিকার সন্নিহিত স্থানে ভিন্ন ভিন্ন আবাস নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সেই অট্টালিকার ভগ্নাংশ লইয়া স্বগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া গদাধর তন্মধ্যে 'শ্রীধর' শালগ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্ত্তীকালে ঐ বাড়ীর সন্নিহিত স্থানে তাঁহার বংশধরগণ একটি দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে উক্ত শালগ্রামদেবের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তাঁহারা অদ্যাপি যথারীতি ঐ দেবসেবা পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন।

জেমোর রাজবাড়ীতে কর্ম্ম করিবার সময় গদাধর তাঁহার পূর্ব্বার্জ্জিত অর্থ দ্বারা ফত্তেসিংহে বিস্তর নিষ্কর ভূমি এবং মুরশিদাবাদ ও বীরভূম জেলায় কয়েক খানি গ্রামের জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি জেমোতে কয়েকটি শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার বংশধরগণ কর্ত্তৃক সেই মন্দিরগুলির সংস্কার সাধিত হইয়াছে। গদাধর স্বীয় কর্ম্মপরায়ণতার গুণে সেকালে তাঁহার দেশবাসিগণের নিকট বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত পুরুষরূপে পরিগণিত হইতেন। তাঁহারা পরিবারবর্গ টেঁয়ার বাবু নামে খ্যাত হয়েন। তাঁহার ভ্রাতৃগণ একান্নবর্ত্তী থাকিয়া গদাধরের উপার্জ্জিত সম্পত্তি পরম সুখে ভোগ করিয়াছিলেন।

রাজা নীলকণ্ঠের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ চরিত্রগুণে গদাধরের প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন; পরিশেষে তিনি তাঁহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিবার বাসনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। গদাধর জীবনে প্রভূত অর্থ, যশঃ

এবং প্রতিপত্তি লাভ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে ১২১৯, বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে দেহত্যাগ করেন।

আমরা এই সময়ে গদাধরের সমসাময়িক জিঝৌতিয়া সমাজের দুই জন কর্ম্মদক্ষ পুরুষের উল্লেখ করিতে পারি, এক জন সীতারাম ত্রিবেদী ও অপর কাশীনাথ বাজপেয়ী। সীতারাম তৎকালে এক জন বিশেষ প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন। রাজা নীলকণ্ঠ সীতারামকে পশ্চিম প্রদেশ হইতে আনয়ন করিয়া কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। সেই পত্নীর মৃত্যু হইলে সীতারাম গদাধর ত্রিবেদীর ভগিনী মোহনমোহিনীর পাণিগ্রহণ করেন। সীতারাম অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ও ক্ষমতাবান্ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। আপন ক্ষমতায় তিনি যথেষ্ট ভূমিসম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সীতারামের বুদ্ধিশক্তি কিন্তু সর্ব্বদা সরল ভাবে পরিচালিত হইত না। এইজন্য তাঁহার শত্রুরও অভাব ছিল না। প্রসিদ্ধি আছে একবার রাজা নীলকণ্ঠ কোন গুরু অভিযোগে মুরশিদাবাদে বিচারার্থ আবদ্ধ হন, বিচারে তাঁহার গুরুদণ্ডের সম্ভাবনা ছিল; তখন সীতারাম তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষে ছিলেন। সম্ভাবিত বিপদে ভয়কাতর নীলকণ্ঠ সীতারামের শরণাগত হইলেন, সীতারাম রাত্রিকালে কৌশলক্রমে বিচারালয়ের গ্রন্থাগারে (রেকর্ড গৃহে) প্রবেশ করিয়া নথীর অংশবিশেষ পরিবর্ত্তন করিয়া দেন, ফলে রাজা নীলকণ্ঠ অব্যাহতি লাভ করেন।

সীতারামের পুত্র হরচন্দ্র পিতার উপার্জ্জিত সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহার স্বল্প জীবনে অধিকাংশ সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছিল, অবশিষ্ট যাহা ছিল, তাঁহার মৃত্যুর পর বিক্রীত হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার বাস ভূমির চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। হরচন্দ্রের পত্নী ব্রহ্মময়ী দেবী আপনার ভগিনী ভগবতী দেবীর অন্যতম পুত্র রাধিকাসুন্দরকে পুত্ররূপে পালন করিয়াছিলেন। রাধিকাসুন্দর রামেন্দ্রসুন্দরের মাতামহ ছিলেন।

জেনো নূতনবাড়ী

৪ পৃষ্ঠা

কাশীনাথ বাজপেয়ী একজন কর্ম্মদক্ষ বিষয়ী লোক ছিলেন। তিনি আপন ক্ষমতাবলে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন। কিছুকাল ধরিয়া তিনি ফত্তেসিংহ (বাঘডাঙ্গা) রাজসংসারে কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। উত্তরকালে বাঘডাঙ্গার রাজার সমগ্র সম্পত্তি দীর্ঘকালের জন্য ইজারা লইয়া তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং সীতারাম ত্রিবেদীর পুত্র হরচন্দ্রের সম্পত্তি মস্তফাপুর, মহাদেবনগর ও সদাশিবপুর বার্ষিক ৯৩৩৯৬৶৮ জমায় ১২২৫ সাল পর্য্যন্ত ইজারা লইয়াছিলেন। কাশী নাথের ভাগিনেয়ী রোহিণী দেবী রামেন্দ্রসুন্দরের পিতামহী ছিলেন। উত্তর কালে ঐ কাশীনাথের ভ্রাতুষ্পৌত্র বসন্তলাল বাজপেয়ীর সহিত রামেন্দ্রসুন্দরের পিতৃস্বসার বিবাহ হইয়াছিল।

গদাধরের মৃত্যুর কিছুকাল পরে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ নবকিশোরের পুত্র বলভদ্রের সহিত কন্যা দয়াময়ী দেবীর বিবাহ দেন। গদাধর বলভদ্রকে নিজের পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া আপনার উত্তরাধিকারী করিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুকালে পুত্র বলভদ্রের নয় বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল।

বলভদ্র ১২১০ সাল ৩০ চৈত্র মঙ্গলবার শুক্ল প্রতিপদ রাত্রি চতুর্দ্দশ দণ্ডের সময় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। স্বরূপ সুকান্ত বলভদ্রের দেহ যৌবনে পূর্ণতা লাভ করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল।

রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ কন্যার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে অনেক গুলি নিষ্করভূমি ও কয়েকখানি জমিদারী দান করেন, এবং বাস করিবার জন্য রাজবাড়ীর সন্নিকটে তাঁহাকে একটি নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এইরূপে জেমোর "নূতন বাড়ীর" স্থাপনা হয়। বাড়ীটি এক্ষণে শতবর্ষের পুরাতন হইলেও সাধারণের নিকট অদ্যাপি নূতন বাড়ী নামেই অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

বলভদ্র শ্বশুরের নির্ম্মিত নূতন বাড়ীতে স্থায়িভাবে বাস করেন নাই,

সময়ে সময়ে অসিয়া কিছু দিন যাপন করিয়া যাইতেন। শ্যালক কুমার কালীনারায়ণের সহিত তাঁহার অতিশয় সৌহার্দ্দ ছিল। তাঁহারা উভয়েই শারীরিক শক্তির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। উভয়েরই বিক্রম সম্বন্ধে অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। দুঃখের বিষয় তাঁহারা উভয়েই পূর্ণ যৌবনে অল্প বয়সে ইহধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কালীনারায়ণ পত্নী জগদম্বা দেবী ও শিশু পুত্র মহীন্দ্রনারায়ণকে রাখিয়া ছাব্বিশ বৎসর বয়সে পিতামাতার সমক্ষে লোকান্তরিত হন। বলভদ্র ১২৪৬ বঙ্গাব্দে ১৮ জ্যৈষ্ঠ ৩৫ বৎসর ২ মাস বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার তিন পুত্র—কৃষ্ণসুন্দর, ব্রজসুন্দর ও ভুবনসুন্দর, এবং এক কন্যা তিনকড়ি দেবী। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণসুন্দরের জন্মকাল ১২৩৩ সাল ৬ শ্রাবণ শ্রবণা নক্ষত্র মকর রাশি কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথি। ব্রজসুন্দর ১২৩৭ সালের ১৪ কার্ত্তিক উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র মীনরাশি শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র ভুবনসুন্দর অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইতেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। শুনিতে পাই ভুবনসুন্দর দেহের লাবণ্যে ভুবনসুন্দরই ছিলেন। কন্যা তিনকড়ি দেবীর বিবাহের পূর্ব্বেই মৃত্যু হয়।

স্বামীর পরলোক গমনের পর বিধবা দয়াময়ী দেবী তাঁহার অপরিণত-বয়স্ক সন্তানগুলিকে অতি যত্নের সহিত লালন পালন করিয়াছিলেন। ভুবনসুন্দরের মৃত্যুতে তিনি বড় শোক পাইয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন পুত্রগণের আহারের সময় উপস্থিত থাকিয়া নিজ হস্তে আহার্য্য দিতেন; এ নিয়মের কখনও ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ভুবনসুন্দরকে হারাইয়া পুত্রশোক-কাতরা জননী পূর্ব্ববৎ তিনটি পাত্রে আহার্য্য প্রস্তুত করিতেন, দুই পুত্রের জন্য দুইটি রাখিয়া অপরটি জলে ভাসাইয়া দিতেন। তদানীন্তন রাজবাড়ীর কর্ম্মকর্ত্তা ব্রজমোহন ঘোষ মহাশয় ইহা দেখিয়া তাঁহাকে একটি দেবসেবা স্থাপন করিবার পরামর্শ দেন এবং আহার্য্য ঐরূপে জলে বিসর্জ্জন না দিয়া

দেবসেবায় অর্পণ করিবার প্রস্তাব করেন। তাঁহার পরামর্শ সমীচীন মনে করিয়া দয়াময়ী দেবী "নূতন বাড়ীতে" ১২৫৮ বঙ্গাব্দে "লক্ষ্মী-জনার্দ্দন" শালগ্রাম দেবের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

উক্ত ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে টেঁয়াবাসী জ্ঞাতিগণের সহিত দয়াময়ী দেবীর সম্পত্তির অংশ লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। উভয় পক্ষ সেই বিরোধের জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হন। বহু অর্থ নষ্ট করিয়া দীর্ঘকাল অশান্তিভোগের পর উভয় পক্ষের চৈতন্য সঞ্চার হয়; তাঁহারা বুঝিলেন এ ভাবে বিরোধ মীমাংসার অর্থ বিষয়ের ধ্বংস সাধন। তখন তাঁহারা দেশের কয়েকজন ভদ্রলোকের মীমাংসা অনুসারে বিষয়ের আয় ভাগ করিয়া লইলেন। অদ্যাপি তাঁহাদের কোন ভূসম্পত্তি নির্দ্দিষ্টরূপে বিভক্ত হয় নাই, উৎপন্ন অর্থ সকলে অংশমত বিভাগ করিয়া লইতেছেন। আমি প্রাচীনাদের মুখে শুনিয়াছি, উক্ত বিষয়ের মীমাংসা হইয়া গেলে টেঁয়ার বাবুগণ জেমোর নূতন বাড়ীতে আগমন করিয়া দয়াময়ী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। দয়াময়ী তাঁহার বালক পুত্রগণের হস্ত ধারণ করিয়া বাবুদের সমক্ষে উপস্থিত হইলে, উভয় পক্ষের হৃদয়োচ্ছ্বাসজনিত অশ্রুপ্রবাহে সকলের গণ্ডস্থল প্লাবিত হইয়াছিল। পরিতাপকাতর হৃদয়ে পরস্পর ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া তাঁহারা হৃদয়ে বিমল শান্তি অনুভব করিয়াছিলেন। সে দৃশ্য, যিনি দেখিয়াছিলেন, তাঁহার স্মৃতিপটে বহুদিনের জন্য অঙ্কিত ছিল।

দয়াময়ী দেবী ১২৩৯ সালের চৈত্র মাসে পিতৃহীনা হয়েন। নৌকাযোগে কাশী যাইবার পথে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ বৎসর পরে ১২৫৩ সালে তাঁহার পত্নী রামমণি দেবী বিধবা কন্যা দয়াময়ী ও পৌত্র মহীন্দ্রনারায়ণকে রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। ভাগ্যহীনা জননীর একমাত্র সন্তান মহীন্দ্রনারায়ণ পিতামহীর আদ্য শ্রাদ্ধ ক্রিয়া শেষ করিয়া দুই মাস পরে স্নেহময়ী জননীর হৃদয়ে দারুণ পুত্রশোকানল জ্বালিয়া দিয়া

দ্বাবিংশ বর্ষ বয়স পূর্ণ না হইতেই ১২৫৪ সালে বৈশাখ মাসে পরলোক গমন করিলেন। কৃষ্ণসুন্দর ও ব্রজসুন্দর মাতুলানী জগদম্বাদেবীর পুত্রশোক নিবারণের জন্য রহিলেন।

মহীন্দ্রনারায়ণ দুই বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিধবা পত্নীদ্বয় বিমলাসুন্দরী ও বামাসুন্দরী দেবী শ্বশ্রূ জগদম্বা দেবীর নির্ব্বাচন অনুসারে ১২৫৪ সালে চৈত্র মাসে ভাগীরথীতীরবর্ত্তী জগন্নাথপুর নিবাসী রামধন রায়ের পুত্র ঠাকুরদাসকে দত্তক গ্রহণ করেন। দত্তক গ্রহণান্তর পুত্রের নাম হইল নরেন্দ্রনারায়ণ। পুত্রের দেহসৌষ্ঠবে মুগ্ধ হইয়া জগদম্বা দেবী তাঁহাকে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। উত্তরকালে এই পুত্রের চরিত্র-সৌন্দর্য্যে জনসমাজ মুগ্ধ হইয়াছিল। পুণ্ডরীক বংশের উজ্জ্বলতম রত্নগণের মধ্যে নরেন্দ্রনারায়ণ অন্যতম ছিলেন।

কুবুদ্ধি লোকের প্ররোচনায় বালিকা বিমলাসুন্দরী কয়েক বৎসর পরে দত্তক গ্রহণের অনুমতি পত্র ও গৃহীত দত্তককে অস্বীকার করিয়া রাজদ্বারে অভিযোগ আনয়ন করেন। এই অভিযোগের ফলে রাজবাড়ীতে বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটে। বিমলাসুন্দরীর পক্ষীয় লোকগণ রাজবাড়ীর কর্ত্তা হইয়া উঠে। রাণী জগদম্বা রাজবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠা পুত্রবধূ ও দত্তক পৌত্র নরেন্দ্রনারায়ণকে সঙ্গে লইয়া নূতন বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কৃষ্ণসুন্দর ও ব্রজসুন্দর উভয় ভ্রাতা উক্ত গৃহবিবাদে প্রথমতঃ কোন পক্ষই অবলম্বন করেন নাই। তদানীন্তন জেলার কলেক্টর কৃষ্ণসুন্দর ও ব্রজসুন্দরকে উত্তরাধিকারী নির্ণয় করিয়া বিষয়ভার গ্রহণ করিবার পরামর্শ দেন। রাণীদের জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুমতি লইয়া উপযুক্ত বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন। রাণী জগদম্বা ঐ প্রস্তাবক্রমে ভগিনেয়দিগকে বিষয়ভার গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা মাতুলানীর প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই; তাঁহারা

বলিয়াছিলেন, "আমরা যখন দত্তক নির্ব্বাচন করিয়া আনিয়াছি, এবং আমাদিগের পরামর্শ অনুসারে আপনারা দত্তক গ্রহণ করিয়াছেন, তখন ঐ দত্তককে বঞ্চিত করিয়া তাহার প্রাপ্য বিষয় ভোগ করিবার ধর্ম্মতঃ আমাদের অধিকার নাই।" তাঁহাদের ঐরূপ ত্যাগশীলতা দেখিয়া রাণী জগদম্বা ও তৎকালীন জনসমাজ অতিমাত্র মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

রাণী জগদম্বা তখন রাজসংসারকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার ভাগিনেয়দিগকে পোষ্যপুত্রের পক্ষ অবলম্বন করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। কৃষ্ণসুন্দর ও ব্রজসুন্দর উভয় ভ্রাতা আর উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। পরিশেষে তাঁহাদের উদ্যোগে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে উচ্চ বিচারালয়ে বিরোধের মীমাংসা হইল, নরেন্দ্রনারায়ণ দত্তক সাব্যস্ত হইলেন। বিমলাসুন্দরী কিছুদিন পিত্রালয়ে বাস করিয়া স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন, এবং পুত্রের মাতৃস্থান গ্রহণ করিলেন। পরবর্ত্তীকালে মাতৃপক্ষে স্নেহ ও পুত্রপক্ষে ভক্তির অনুমাত্র ব্যতিক্রম দেখিতে না পাইয়া লোকে চমৎকৃত হইয়াছিল। সম্পত্তি কিছুদিন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন থাকিল। নাবালক নরেন্দ্রনারায়ণ কলিকাতায় ওয়ার্ড ইনষ্টিটুটে পরলোকগত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তত্ত্বাবধানে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হস্তে গেলে রাণী জগদম্বা দেবী বোর্ড অব রেভেনিউর নির্দ্দেশক্রমে নাবালকের অভিভাবিকা নিযুক্ত হন। কৃষ্ণসুন্দর ও ব্রজসুন্দর উভয় ভ্রাতা ১২৬১ সালের ৩০ কার্ত্তিক তারিখে একখানি রেজেষ্টারী দলিলদ্বারা ডিহি মস্তফাপুর নামক নিজেদের একটি জমীদারী জামিন রাখিয়া রাণী জগদম্বাকে অভিভাবিকা নিযুক্ত করিবার সাহায্য করিয়াছিলেন। কৃষ্ণসুন্দর ত্রিবেদী অতি শান্তিপ্রিয় নিরীহপ্রকৃতি লোক ছিলেন, নিজের বিষয়কর্ম্মের পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি দিন যাপন করিতেন, বাহিরের ঝঞ্চাট সহ্য করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না।

ব্রজসুন্দর ত্রিবেদীও বিষয়ী লোক ছিলেন ; কিন্তু বিষয়িজনসুলভ কপট ও চতুর বৃত্তি তাঁহার নির্ম্মল ও পরিশুদ্ধ অন্তঃকরণকে কখনও কলুষিত করিতে পারে নাই। লোভের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া কখনও তিনি ন্যায় পথ হইতে বিচলিত হয়েন নাই। মাতুলানীর আদেশক্রমে তিনি কিছুকাল জেমো রাজসংসারের কর্ম্ম পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া রাণী জগদম্বা দেবী হিন্দু শাস্ত্রোল্লিখিত যাবতীয় পূজা পার্ব্বণ ও ব্রতাদির অনুষ্ঠান সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

ব্রজসুন্দর ত্রিবেদীর কৃষিকার্য্যে বিশেষ উৎসাহ ছিল। কৃষিকার্য্যোপ-যোগী সবল, সুন্দর ও পুষ্টদেহ অনেকগুলি বলীবর্দ্দ তাঁহার গো-শালার শোভা বর্দ্ধন করিত। এক দল বেতনভোগী কৃষাণ ক্ষেত্রের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করিত। শস্য সংগ্রহের সময়, গোলাবাড়ীতে নানাবিধ স্তূপীকৃত শস্যের পরিমাণ ও পর্ব্বতপ্রমাণ বিচালির গাদা দর্শক-গণের চিত্তে বিস্ময় উৎপাদন করিত। ব্রজসুন্দর সঞ্চয়ী পুরুষ ছিলেন না ; তাঁহার গৃহ নিয়ত অতিথি ও অভ্যাগতজনে পূর্ণ থাকিত। অতিথি-সেবায় এবং আশ্রিত পোষ্যবর্গের ভরণপোষণার্থ সংগৃহীত শস্যের অধিকাংশ ব্যয় হইত। তাঁহার গৃহে একজন স্বজাতীয়া দরিদ্র কন্যা পাচিকার কার্য্য করিতেন ; তিনি প্রতিদিন একটি ভোজের অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দিতেন। অন্নদাতার পরিবারবর্গের প্রতি তাঁহার অশেষ স্নেহ ছিল। বলা বাহুল্য উত্তরকালে বৃদ্ধ বয়সে তিনি কর্ম্মে অপটু হইলে, রামেন্দ্রসুন্দর ও তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহাকে আজীবন যত্নের সহিত প্রতিপালন করিয়াছিলেন। পিতামহী স্থানীয়া উক্ত মহিলাকে রামেন্দ্রসুন্দর বড় ভালবাসিতেন। তিনি তাঁহাকে আদর করিয়া "খাঁ সাহেব" বলিয়া ডাকিতেন।

কৃষ্ণসুন্দর ও ব্রজসুন্দর উভয় ভ্রাতা বিপুলকায় ব্যক্তি ছিলেন। দর্শক মাত্রেই তাঁহাদিগের শরীরের বিশালতা দেখিয়া বিস্মিত হইত। সাধারণ

কুর্শি বা চেয়ারে তাঁহাদের বসিবার স্থান হইত না, সেই জন্য তাঁহারা নিজের ব্যবহারের জন্য বৃহদাকার চেয়ার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সাধারণ শিবিকার মধ্যে তাঁহারা প্রবেশ করিতে পারিতেন না, তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র শিবিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ষোল জন বাহকে আরোহী সমেত শিবিকা বহন করিত। তাঁহাদের দেহে অসাধারণ শক্তি ছিল; কিন্তু দেহের স্থূলতা বশতঃ তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেন না, অল্প পরিশ্রমে কাতর হইয়া পড়িতেন। একবার দ্রব্যজাত পূর্ণ একটি বৃহদাকার কাষ্ঠের সিন্দুক দ্বিতল হইতে নিম্নতলে আনিবার প্রয়োজন হইয়াছিল, দশ বার জন বলিষ্ঠ যুবক একযোগে ধরিয়া উহাকে নাড়িতে পারে নাই; ব্রজসুন্দর একাকী সিন্দুকটিকে ধরিয়া গৃহতল হইতে প্রায় এক হাত উর্দ্ধে তুলিয়াছিলেন। তিনি সিন্দুকের এক ধারে এবং অপর ধারে যুবকগণ ধরিয়া বহন করিয়া নিম্নতলে লইয়া আসিয়াছিলেন।

বহু অর্থব্যয় করিয়া কৃষ্ণসুন্দর ও ব্রজসুন্দর তাঁহাদের বাড়ীর বহিরাঙ্গনে একখানি সুন্দর বাঙ্গলা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, ঐ গৃহখানি তাঁহারা বৈঠকখানারূপে ব্যবহার করিতেন। ১২৮২ সালে গ্রামদাহকালে উহা ভস্মীভূত হইয়াছিল; অধুনা সেই গৃহের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্যের খ্যাতি অদ্যাপি লোকমুখে কথিত হইয়া থাকে। ঐ গৃহের অভ্যন্তরভাগ গ্রামবাসিগণ কর্ত্তৃক সদাসর্ব্বদা নানাবিধ খেলা, আমোদ-প্রমোদ এবং পুরাণপাঠাদিতে মুখরিত থাকিত।

কৃষ্ণসুন্দর প্রথমা পত্নী মনোমোহিনী দেবীর মৃত্যুর পর কাশীনাথ বাজপেয়ীর ভাগিনেয়ী রোহিণী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ঐ যশস্বিনী মহিলার গর্ভে মিত্রাবরুণ তুল্য দুই পুত্র তাঁহাদের চরণস্পর্শে কিছু কাল ধরাপৃষ্ঠ পবিত্র করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

ব্রজসুন্দর বহরা গ্রামনিবাসী সীতারাম ত্রিবেদীর কন্যা তিনকড়ি

দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি মাত্র কন্যা সন্তান ছিল, তাঁহার নাম যোগীন্দ্রমোহিনী দেবী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যোগীন্দ্রমোহিনীর সহিত কাশীনাথ বাজপেয়ীর ভ্রাতুষ্পৌত্র বসন্তলাল বাজপেয়ীর বিবাহ হইয়াছিল। বসন্তলাল কান্দি ইংরাজী স্কুলে চল্লিশ বৎসরের অধিক কাল শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। তাঁহার তিনটি পুত্র, জ্যেষ্ঠ আশুতোষ এই দীন গ্রন্থকার; মধ্যম শ্রীমান্ জগদীশ কান্দি দেওয়ানি বিচারালয়ের উকীল; এবং কনিষ্ঠ শ্রীমান্ উমাপতি কলিকাতা রিপন কলেজে বিজ্ঞান শাস্ত্রের অধ্যাপকতা করিতেছেন। আমরা উক্ত তিন সহোদরই রামেন্দ্রসুন্দরের আশ্রয়ে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছি।

ব্রজসুন্দর জেমোর নূতন বাড়ীতে ১২৭০ বঙ্গাব্দে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহমূর্ত্তি ও শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং দুর্গোৎসব ও শ্যামাপূজার প্রবর্ত্তন করিয়া যান। এতদিন নূতন বাড়ীতে কোন স্বতন্ত্র দেবালয় ছিল না, বাড়ীর মধ্যে একটি দ্বিতল প্রকোষ্ঠে লক্ষ্মীজনার্দ্দন শালগ্রাম প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ব্রজসুন্দর বাড়ীর দক্ষিণপ্রান্তসংলগ্ন স্থানে একটি স্বতন্ত্র দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া তথায় দুর্গোৎসব ও শ্যামাপূজা নির্ব্বাহ এবং রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তির স্থাপনা করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরবাড়ীতে নিয়মিত ভাবে শাক্ত বৈষ্ণব ও শৈবগণের আরাধ্য দেবদেবীর পূজাকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় তাঁহার সমগ্র স্নেহ অধিকার করিয়া পুত্রের স্থান পূর্ণ করিয়াছিলেন। ব্রজসুন্দর শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন, কিন্তু তিনি দুর্গোৎসব বা শ্যামাপূজা উপলক্ষে অস্ত্রাঘাতে বলি প্রথা প্রবর্ত্তন করেন নাই; সেই জন্য জেমোর নূতন বাড়ীতে কোন পূজা উপলক্ষে জীব বলি দেওয়া হয় না।

ব্রজসুন্দর ত্রিবেদী কাব্যামোদী লোক ছিলেন। তিনি 'মাধব সুলোচনা' নামে একখানি গদ্যপদ্যময় নাটক ও 'স্বর্ণ সিন্দুরসিংহ বা গৌরলাল সিংহ'

দেবালয়

১২ পৃষ্ঠা।

নামে একখানি প্রহসন বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। পৌরাণিক সাহিত্যালোচনায় তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল, তিনি যত্নের সহিত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং বহু অর্থব্যয়ে সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, মহাপুরাণ ও উপপুরাণাদির হস্তলিখিত পুঁথিসকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন; স্বয়ং নিয়মিতরূপে পুরাণ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃগণকে শুনাইতেন।

১২৬৭ সালে কৃষ্ণসুন্দর ও ব্রজসুন্দর উভয় ভ্রাতা তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। তখন তীর্থে তীর্থে রেল বিস্তার হয় নাই; তাঁহারা সপরিবারে নৌকাযোগে যাত্রা করিয়াছিলেন। মাতুলানী জগদম্বা দেবী তাঁহার পুত্র-বধূদ্বয় ও আত্মীয় স্বজন সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের অনুগমন করেন। নানাতীর্থ ভ্রমণ করিয়া এক বৎসর পরে সকলে বাড়ী ফিরিলেন। পথের অনিয়মে কৃষ্ণসুন্দর দুরারোগ্য ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন; দুই মাস পরে ১২৬৮ সালের চৈত্রের প্রারম্ভে তাঁহার দেহাত্যয় ঘটিল। দয়াময়ী দেবী পুত্রশোকে অন্ধ হইলেন। মধ্যম ভ্রাতা ব্রজসুন্দর সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া শাস্ত্রালোচনায় ও ধর্ম্মচর্চ্চায় কোনরূপে ছয় বৎসর অতিবাহন করিয়া ১২৭৪ সালে ফাল্গুন মাসের ২৩ তারিখে বৃদ্ধা জননীর সম্মুখে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুগমন করিলেন।

চরিত্রমাহাত্ম্যে কৃষ্ণসুন্দর ও ব্রজসুন্দর ত্রিবেদী তৎকালে সকলের মাননীয় ছিলেন। ইতর ভদ্র সকলকেই তাঁহারা চরিত্রবলে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। জেমোর নূতন বাড়ী তাঁহাদের জীবনকালে আনন্দকুটীরে পরিণত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পিতা ও পিতৃব্যের কথা

কৃষ্ণসুন্দরের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ গোবিন্দসুন্দর ১২৫৫ সালের ২৩ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার রাত্রি দুই দণ্ডের সময়, এবং কনিষ্ঠ উপেন্দ্রসুন্দর ১২৫৮ সালের ৫ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার কৃষ্ণা দ্বাদশী দিবা তিন দণ্ডের সময় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। বাল্যকালে উভয় ভ্রাতা কিছুকাল কান্দি ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। গোবিন্দসুন্দর বলিষ্ঠকায় পুরুষ ছিলেন, তিনি সর্ব্ববিধ শারীরিক ও মানসিক শক্তির আরাধনা করিতেন। বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া তিনি শক্তিসাধনায় প্রবৃত্ত হন। তৎকালে রাজা নরেন্দ্র নারায়ণের তুল্য বলশালী পুরুষ সে অঞ্চলে ছিল না। নরেন্দ্রনারায়ণ পশ্চিমদেশ হইতে কতকগুলি বলশালী মল্লবীর আনয়ন করিয়া তাহাদিগের নিকট মল্লবিদ্যা অভ্যাস করিতেন। গোবিন্দসুন্দর ও বসন্তলাল সেই খেলায় নরেন্দ্রনারায়ণের সহযোগী ছিলেন।

গোবিন্দসুন্দরের কৃষিকার্য্যে আসক্তি ছিলনা। পিতৃব্যের পরলোক, গমনের পর তিনি অধিকাংশ কর্ষণোপযোগী ভূমি খাজানায় বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন সামান্য আকারে কৃষিকার্য্য পরিচালনা করিয়া শেষে তাহাও বন্ধ করিয়া দেন। *

১২৬৫ সালে গোবিন্দসুন্দরের বিবাহ হইয়াছিল। তৎকালে অর্থাৎ ৬৩ বৎসর পূর্ব্বে জেমোকান্দি অঞ্চলের বাজারদর কিরূপ ছিল, তাহা পাঠকগণের গোচরার্থে ঐ বিবাহের খরচের তালিকা হইতে কতকগুলি খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ ও মূল্য উদ্ধৃত করিলাম। বর্ত্তমান কালের বাজারদরের সহিত পাঠকগণ উহার তুলনা করিয়া দেখিবেন।

মাতা রোহিণী দেবী ১২৮৪ সাল ২৫ মাঘ শ্রীপঞ্চমীর রাত্রি তিন প্রহরের সময় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করেন। উক্ত ঘটনার তিন মাস পরে ১২৮৫ সালের ২৫ বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমীতে পুত্রশোককাতরা দয়াময়ী দেবী সংসারের সর্ব্বপ্রকার জ্বালা যন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। পৌত্রগণ সমারোহের সহিত পিতামহীর ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

আতপ চাউল (মিহি)	১১/	২০৲	চিনি (উৎকৃষ্ট)	৫/	৪২৷০
আতপ চাউল (মোটা)	৫৪/	৭২৲	চিনি (সাধারণ)	২০/	১৪০৲
উষ্ণ চাউল (মিহি)	৭৫/	১০০৲	গুড়ের ভুরা (উৎকৃষ্ট)	৮/	৪৪৲
উষ্ণ চাউল (মোটা)	৫০০/	৫১৯৲	ঐ (সাধারণ)	৭/	২৮৲
মুড়ির জন্য চাউল	৬০/	১০০৲	মণ্ডা	১০/	৯০৲
কলাই	১০০/	১০০৲	পেঁড়া	১/	৯৲
অড়হর	৪৪/	৪৪৲	ছাপা সন্দেশ	১/	৯৲
মুগ	১০/	১৬৲	ক্ষীর পুলি	।৫	৩৷০
মটরের দাউল	৩/	৪৲	মুরকী (ভাল)	৬/	১৮৲
ছোলার দাউল	৮/	৯।০	ঐ (সাধারণ)	২৫/	৫০৲
বরবটী	২/	৩৲	খণ্ড	১০/	২৫৲
লবণ	৩০/	৮০৲	বাতাসা	৪/	৩২৲
সরিষার তৈল (ভাল)	১৫/	৯৭৷০	মিঠাই, ছানাবড়া,	প্রতি মণ	
সরিষার তৈল (সাধারণ)	২৫/	১৫০৲	রসগোল্লা প্রভৃতি	৯৲	
তামাক	১০/	৪০৲	মিষ্টান্নের পরিমাণ	* * * *	
চিড়া	৫০/	৭৫৲	দুগ্ধ	৩০/	৩৭৷০
আটা	৫০/	১২৫৲	দধি (উৎকৃষ্ট)	১৫/	৩৭৷০
মটকী ঘৃত	১২/	১৫০৲	ঐ (সাধারণ)	২৫/	৩১৷০
গব্য ঘৃত	৩/	৪৮৲	পান ৩০০০০		১১৲

একবার জগদ্ধাত্রী পূজোপলক্ষে বহরমপুরের কতকগুলি ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়া জেমোর রাজবাড়ীতে দুই রাত্রি দুইখানি নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন। সেই অভিনয় দেখিয়া ১২৮৭ সালে গোবিন্দসুন্দর ও উপেন্দ্রসুন্দর উভয় ভ্রাতা, জেমার রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ ও বাঘডাঙ্গার রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণের সহযোগিতা লাভ করিয়া গ্রামের প্রতিবেশী ভদ্রলোকদিগকে লইয়া একটি অভিনেতৃ-সম্প্রদায় গঠন করেন। গোবিন্দ-সুন্দরের রচিত 'দ্রৌপদীনিগ্রহ' ও 'বেণীসংহার' নাটকের অভিনয় হয়। ১২৮৮ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে জেমোর নূতন বাড়ীতে নব-নির্ম্মিত রঙ্গমঞ্চে "কৃষ্ণ কুমারী" ও "অশ্রুমতীর" অভিনয় হইয়াছিল। রাজা যোগীন্দ্র-নারায়ণ, গোবিন্দসুন্দর ও বসন্তলাল উৎকৃষ্ট অভিনেতা ছিলেন। অভি-মন্যুবধ অবলম্বন করিয়া গোবিন্দসুন্দর আর একখানি নাটক লিখিয়া শেষ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার অভিনয় ঘটিয়া উঠে নাই। আষাঢ় মাসে সেই অভিনয়মঞ্চে সহসা যবনিকাপাত ঘটিল।

গোবিন্দসুন্দর ও উপেন্দ্রসুন্দর উভয়ে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। গণিতে, বিজ্ঞানে বিশেষতঃ জ্যোতিষে গোবিন্দসুন্দরের স্বাভাবিক আনুরক্তি ছিল। তিনি যত্নসহকারে চর্চ্চা করিয়া জ্যোতিষশাস্ত্রে গভীর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। স্বদেশভক্তি তাঁহার হৃদয়ের অলঙ্কার-স্বরূপ ছিল। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় একখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম দিয়াছিলেন "বঙ্গবালা।" উহার ভূমিকায় তিনি যাহা লিখিয়া-ছিলেন, তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

"বাঙ্গালীর জয়ডঙ্কা বাজেনা বাজেনা।
বঙ্গদেশে নাহি হয় সমর ঘোষণা ॥
রণক্ষেত্রে বীরমদে মত্ত হতজ্ঞান।
হয় নাই বহুদিন বাঙ্গালীসন্তান ॥

এবে বঙ্গ জনস্থান নিস্তব্ধ নীরব।
কোন দিকে নাহি আর কোন কলরব॥
রাজ-নীতি আলোচনা—দুরূহ ভাবনা।
রাজ্যরক্ষা হেতু চিন্তা, সাম্রাজ্যবাসনা॥
এ সকল কষ্টকর কার্য্যে বাঙ্গালীরে।
প্রবৃত্ত হইতে আর না হয় সংসারে॥
দর্শন বিজ্ঞান শাস্ত্রে মস্তিষ্কচালনা।
জ্যোতিষের গূঢ় তত্ত্ব করিতে গণনা॥
বিরত হয়েছে এবে আর্য্যপুত্রগণে।
শিল্পবাণিজ্যাদি হত সাম্রাজ্যের সনে॥
ধন, মান, বিদ্যা, বল সকলি কারণ।
পরমুখাপেক্ষী এবে বাঙ্গালীনন্দন॥
সতীত্বে পবিত্রআত্মা, প্রেমিকা, সরলা।
একমাত্র ধন এবে বঙ্গে বঙ্গবালা॥
এই হেতু বঙ্গবালা যত্নে চিত্র ক'রে।
সমর্পণ করিলাম বাঙ্গালীর করে॥
ভয় হয় বাঙ্গালীর একমাত্র ধন।
চিত্রদোষে পাছে হয় বিকৃতবরণ॥
কিন্তু তাহে ক্ষতি নাই; বিশেষতঃ জ্ঞানী।
দৃষ্যপটে আস্থা নাহি করিবেক জানি॥"

স্বদেশপ্রীতির কথা তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বহির্গত হইত। স্বদেশের কথা কহিবার সময় তাঁহার কণ্ঠস্বরের বিকৃতি ও লোমহর্ষণ ঘটিত। স্বভাবপ্রদত্ত গম্ভীর স্বরে উদ্দীপনার ভাষায় তাঁহার অষ্টমবর্ষীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রটির মনে স্বদেশভক্তি সঞ্চারিত করিবার জন্য তিনি কতই না প্রয়াস পাইতেন।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ২৪এ মে তারিখে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ জেমোতে একটি বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। গোবিন্দসুন্দর তাহার সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ছাত্রেরা এখানে বিনা বেতনে পড়িতে পায়। বৎসর বৎসর পাঠশালার পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে তখন উৎসব হইত। হার্ডিঞ্জ সাহেবের সময় স্থাপিত কান্দি মডেল স্কুলের গবর্ণমেণ্টদত্ত সাহায্য ব্যতীত অবশিষ্ট ব্যয়ের ও তত্ত্বাবধানের ভার নরেন্দ্রনারায়ণের হস্তে পড়িয়াছিল। দুই স্কুলের একত্র পরীক্ষা গ্রহণ ও একত্র পুরস্কার বিতরণ হইত। মডেল স্কুল কিছুকাল পরে উঠিয়া যায়। অধুনা জেমো পাঠশালা মাইনর স্কুলে উন্নীত হইয়া প্রতিষ্ঠাতার নাম অনুসারে 'নরেন্দ্রনারায়ণ স্কুল' নামে পরিচিত, এবং তাঁহার উইলে নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তির আয় হইতে অদ্যাপি তদ্বংশধরগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে।

১২৮৩ সালে কান্দির দাতব্য চিকিৎসালয়ের বিশৃঙ্খলার জন্য নরেন্দ্র নারায়ণ ও গোবিন্দসুন্দরের প্রতিবাদে মুরশিদাবাদের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যাকেঞ্জি সাহেব (উত্তরকালে লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর স্যর আলেকজন্দার ম্যাকেঞ্জি) অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া উঠেন। উভয় পক্ষ হইতে গরম গরম চিঠি-পত্র চলিতে লাগিল। সাহেবের তীব্র অসন্তোষ উৎপাদন সত্ত্বেও তাঁহাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বিচলিত হইল না। সাহেব গোবিন্দসুন্দরকে শাস্তির ভয় দেখাইলেন। গোবিন্দসুন্দর নির্ভীক হৃদয়ে অটল ভাবে নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিতে লাগিলেন। শেষে ডিস্‌পেন্সরির বিশৃঙ্খলা প্রতিপন্ন হইল। ম্যাকেঞ্জি সাহেব তখন একেবারে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, এবং স্বয়ং ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া রাজবাড়ীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। তিনি জেমোর পাঠশালা পরিদর্শন করিয়া লিখিয়া গেলেন, "বাবু নরেন্দ্রনারায়ণকে স্থানীয় লোকে রাজা বলিয়া থাকে, তিনি সর্ব্বতোভাবে রাজোপাধির যোগ্য।"

পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট-প্রবর্ত্তিত নিয়ম অনুসারে কান্দির সবডিবিসনাল

অফিসার কান্দি মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইতেন, করদাতারা ভাইস চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন করিতেন। গোবিন্দসুন্দর কয়েক বৎসর ধরিয়া করদাতাদের নির্ব্বাচন অনুসারে উক্ত মিউনিসিপালিটির ভাইস চেয়ারম্যানের কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কান্দির অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

সর্ব্ববিধ শারীরিক ও মানসিক শক্তির তিনি আরাধনা করিতেন। সর্ব্ববিধ ক্ষুদ্রতা, কপটতা ও সঙ্কীর্ণতা ভয়ে তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিত। অসামান্য নির্ভীকতা ও সহিষ্ণুতা সময়ে সময়ে তাঁহার বন্ধুবর্গের নিকট গোঁয়ারতমি বলিয়া প্রতিভাত হইত। সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যে তিনি অগ্রণী ছিলেন। প্রথমে তিনি নির্গুণ ব্রহ্মবাদী ছিলেন, শেষে কিন্তু সগুণ ঈশ্বরোপাসনার পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি আচার বিষয়ে শাস্ত্রীয় নিয়ম যথাসাধ্য পালন করিতেন; কিন্তু আচারবিরোধী নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথন নিন্দা করিতেন না। তাঁহাদের উদ্যম, কর্ম্মপরতা ও স্বদেশানুরাগ তাঁহার প্রীতি আকর্ষণ করিত। কাহারও নিন্দা করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। কোনরূপ কুসংস্কার তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারিত না। শেষ জীবনে নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ও ব্রতোপবাসাদি কৃচ্ছ্র সাধনায় তিনি অত্যন্ত মনোযোগী হইয়া পড়িয়াছিলেন।

গোবিন্দসুন্দর ১২৮৮ সালের এক আষাঢ় প্রভাতে বন্ধুবর্গ বেষ্টিত হইয়া বসিয়াছিলেন, এমন সময় ক্ষৌরকার আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার দক্ষিণ গণ্ডের নিম্ন প্রান্তে একটি অতি ক্ষুদ্রাকার ব্রণ প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি ক্ষৌরকারকে ব্রণটি কাটিতে আদেশ করিলেন। ক্ষৌরকারের সাহসে কুলাইল না। তখন তিনি ভগিনীপতি বসন্তলালকে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে বলিলেন। বসন্তলাল ঐ প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ ঐরূপ কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিলেন।

গোবিন্দসুন্দর উহা সামান্য মনে করিয়া তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিবার আবশ্যক বোধ করিলেন না। সকলে উঠিয়া গেলে তিনি নিজে একখানি দর্পণ ও কাঁচির সাহায্যে ব্রণটি কাটিয়া ফেলিলেন। পরদিন সমগ্র মুখমণ্ডল ফুলিয়া উঠিল। রাত্রিকালে উহা আরও বৃদ্ধি পাইল। চারি দিন পরে ১৮ই আষাঢ় বেলা প্রায় এক প্রহরের সময় তিনি দেহত্যাগ করিলেন। ঐরূপ অপ্রত্যাশিত আকস্মিক বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না, পরিজনবর্গ দারুণ শোকে অভিভূত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। তাঁহার সহোদর উপেন্দ্রসুন্দর, এবং রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ উভয়েই সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। বহু শুশ্রূষার পর তাঁহাদের চৈতন্য সঞ্চার হইয়াছিল। গোবিন্দসুন্দরের বিরহে নরেন্দ্রনারায়ণের সকল উৎসাহ চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছিল। আমার পিতৃদেব বসন্তলাল বলিতেন, গোবিন্দসুন্দরের কথানুসারে ব্রণে অস্ত্র প্রয়োগ করিলে নিমিত্তের ভাগী হইয়া চিরজীবন তাঁহার অন্তঃকরণ দারুণ পরিতাপানলে দগ্ধ হইত ; ভগবান্ সুমতি দিয়া তাঁহাকে ক্ষান্ত করিয়াছিলেন।

মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন গোবিন্দসুন্দর তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট বাল্য বন্ধু খোসবাসপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত বিনোদলাল রায় মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, “বিনোদ, আমার দিন ফুরাইল, তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে।” বিনোদলাল বলিয়াছিলেন,—“ব্রণ হইয়া মুখ ফুলিয়াছে বলিয়া জীবনে হতাশ হইতেছ কেন ?” গোবিন্দসুন্দর উত্তরে বলিয়াছিলেন, “শরীরের অবস্থা উপলব্ধি করিয়া বুঝিতেছি আমার জীবনী-শক্তি ক্রমে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে, আর মিথ্যা প্রবোধ বাক্যের প্রয়োজন নাই ভাই, বড় দুঃখের কথা রামেন্দ্র ভবিষ্যতে কত বড় লোক হইবে, তাহা দেখিয়া যাইবার অবসর আমি পাইলাম না, এই আক্ষেপ লইয়া আমাকে যাইতে হইতেছে।” বৃদ্ধ বিনোদলাল তাঁহার সেই বন্ধু

ও বন্ধুপুত্রকে হারাইয়া আজ সেই কথার উল্লেখ করিয়া অশ্রুপাত করিতেছেন।

গোবিন্দসুন্দরের দুইটি পুত্র ও চারিটি কন্যা জন্মিয়াছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামেন্দ্রসুন্দরের কথা পরে বলিব। কনিষ্ঠ দুর্গাদাস ১২৮১ সালে ২৫এ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। গোবিন্দসুন্দরের জ্যেষ্ঠা কন্যা সতী দেবী, তৃতীয়া কন্যা রমা দেবী এবং কনিষ্ঠা কন্যা গৌরী দেবীর সহিত যথাক্রমে নরেন্দ্রনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র পূর্ণেন্দুনারায়ণ, চতুর্থ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ এবং কনিষ্ঠ পুত্র বরদেন্দুনারায়ণের বিবাহ হইয়াছিল। বহরা গ্রামের রজনীকান্ত ত্রিবেদী গোবিন্দসুন্দরের দ্বিতীয়া কন্যা গায়ত্রী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।

উপেন্দ্রসুন্দর বাল্যকাল হইতে ভগ্নস্বাস্থ্য ছিলেন। তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিবার আশায় কিছু কাল মুঙ্গেরে যাপন করেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিলে বিবিধ চিকিৎসার পর ডাক্তার স্থলজারের চিকিৎসায় পীড়ার কতকটা উপশম হয়, সেই কারণে হোমিওপ্যাথিতে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে; তদবধি তিনি প্রত্যহ শতাধিক রোগীকে ঔষধ বিতরণ করিতেন। রোগীকে ঔষধ বিতরণ তাঁহার পরদুঃখকাতর করুণাকোমল জীবনের প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল। পরকে আপনার করিবার ক্ষমতা তেমন কেহ আর দেখিবে না। তাঁহার অন্তঃকরণ বালকের ন্যায় কোমল ও সরল ছিল। তাঁহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রতিভা চন্দ্রমার ন্যায় পূত রশ্মি বিস্তার করিয়া চতুর্দ্দিক্ সুধাসিক্ত করিত। সেই নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের রশ্মিতে যে একবার অবগাহন করিয়াছে, আজীবন সে তাহা ভুলিতে পারিবে না। তিনি হাস্য কৌতুক ও রঙ্গরসপ্রিয় সরল উদারপ্রকৃতি লোক ছিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ এমনই উপাদানে গঠিত

ছিল যে, তিনি নিম্নতর শ্রেণীরও লোকের সকাশে স্বীয় দোষের কথা উল্লেখ করিয়া তাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না।

উপেন্দ্রসুন্দর একবার তাঁহার বাড়ীর সংলগ্ন ভূমিতে ফলের বাগান প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে নরেন্দ্রনারায়ণের নিকট হইতে বৃক্ষের চারা আনয়ন করিয়াছিলেন। প্রতিবেশী একজন তন্তুবায় তৎকালে নিজের প্রাঙ্গনে কয়েকটি আম্রবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল। এক জন প্রতিবেশী উপেন্দ্রসুন্দরকে বলে, আপনার বাগানের চারা তন্তুবায় চুরি করিয়া লইয়াছে। উপেন্দ্রসুন্দর তাহা শুনিয়া সেই তন্তুবায়কে ডাকিয়া আনিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন। তন্তুবায় অত্যন্ত ভীত হইয়া সজল নয়নে যুক্তকরে আপনার নির্দ্দোষিতার কথা উল্লেখ করে। উপেন্দ্রসুন্দরের মনে সন্দেহের উদয় হয়, তিনি নরেন্দ্রনারায়ণের এক কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিয়া রোপিত বৃক্ষগুলি পরীক্ষা করিতে বলেন। পরীক্ষার পর তন্তুবায়ের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন হইল। উপেন্দ্রসুন্দর তৎক্ষণাৎ সর্ব্বজনসমক্ষে নিজের আসন হইতে উঠিয়া সেই তন্তুবায়ের কর ধারণ করিয়া তাহাকে মিষ্ট বাক্যে কহিলেন—"ভাই, না জানিয়া তোমাকে মিথ্যা তিরস্কার করিয়াছি, তুমি মনে বড় ব্যথা পাইয়াছ, এই অন্যায় কার্য্যে আমিও বড় দুঃখিত হইয়াছি, তুমি আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।" তন্তুবায় উপেন্দ্রসুন্দরের ঐরূপ অপ্রত্যাশিত বিপরীত ব্যবহারে একবারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। শেষে উপেন্দ্রসুন্দর তাহাকে অভয় দিয়া মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন।

উপেন্দ্রসুন্দরের স্মৃতিশক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য এতই প্রয়াস পাইয়াছিলেন যে, হেম্পেলের লিখিত দুই খণ্ড মেটেরিয়া মেডিকা নামক বৃহৎ গ্রন্থ হইতে যে কোন অংশ অনর্গল আবৃত্তি করিতেন। সংস্কৃত শ্লোক রচনাতেও

তাঁহার পটুতা ছিল। তিনি অতি শীঘ্র মধুর পদ বিন্যাস করিয়া বিবিধ ছন্দে শ্লোক রচনা করিতেন। স্বাস্থ্যাভাবে বাধ্য হইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করার পরেও সংস্কৃত শিক্ষায় পরীক্ষার্থীর ন্যায় তাঁহার আগ্রহ ছিল। সেক্স-পীয়রের Pericles Prince of Tyre অবলম্বন করিয়া তিনি একখানি সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন ও ভারতবর্ষের মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস সংস্কৃত শ্লোকে ছন্দোবদ্ধ করেন। তাঁহার রচিত 'রামাষ্টক' শীর্ষক একটি স্তোত্র ও 'বসন্তবর্ণন' শীর্ষক একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

রামাষ্টকম্

দশরথনৃপসূনুং দেবতানাং প্রপূজ্যম্।
অবধৃতনরদেহং রাক্ষসানাং বধায়।
সকলফলদদেবং দীর্ঘবাহুং শুভাঙ্গং।
বিকচ-কমল-নেত্রং রামচন্দ্রং নমামি ॥ ১ ॥

প্রথিতবিমলকীর্ত্তিং সূর্য্যবংশপ্রদীপং।
নরপতিকুলপূজ্যং দিব্যকান্তিং দধানং।
ভুবনবিদিতশৌর্য্যং সর্ব্বনিস্তারহেতুং।
বিকচ-কমল-নেত্রং রামচন্দ্রং নমামি ॥ ২ ॥

নিজজনকনিদেশাৎ সীতয়া ধর্ম্মপত্ন্যা।
প্রিয়হিতকরভ্রাত্রা লক্ষ্মণেনাপি সার্দ্ধং।
বিগতসুখদরাজ্যং যাতবন্তং বনান্তে।
বিকচ-কমল-নেত্রং রামচন্দ্রং নমামি ॥ ৩ ॥

মৃগকুলপরিসেব্যে চীরিণং তস্থিবাংসং।
বিহগচরিতরম্যে কাননে ধৈর্য্যবন্তং।
সুরপতিসমবীর্য্যং বিভ্রতং শান্তমূর্ত্তিং।
বিকচ-কমল-নেত্রং রামচন্দ্রং নমামি ॥ ৪ ॥

অতিখলতরদুষ্টো রাক্ষসো বাহুবীর্য্যৈঃ।
নগবরসমদেহো রাবণো যস্য নষ্টঃ।
খরশরধরভূপং সর্ব্বদং তং সুরূপং।
বিকচ-কমল-নেত্রং রামচন্দ্রং নমামি ॥ ৫ ॥

দশবদনবধাদ্ধি ধার্ম্মিকাঃ পুণ্যবন্তঃ।
মুনিবৃষভগণা যং ভূমিপং সংস্তবন্তি।
বিজিতরিপুকুলং তং শ্যামলং দিব্যরূপং।
বিকচ-কমল-নেত্রং রামচন্দ্রং নমামি ॥ ৬ ॥

সুমৃগচপলনেত্রাং মৈথিলীং যঃ প্রিয়াং স্বাং।
গহনমতিসুঘোরং প্রেরয়ামাস তন্বীং।
সকলগুণনিধানং নীরদাভং তমীশং।
বিকচ-কমল-নেত্রং রামচন্দ্রং নমামি ॥ ৭ ॥

ধনজনপরিপূর্ণাং ভারমুক্তাং ধরিত্রীং।
ঋষিগণকৃতযজ্ঞাং রাক্ষসান্ যঃ প্রহত্য ন্।
শমনভবনমাশু প্রেষ্য বীর প্রচক্রে।
বিকচ-কমল-নেত্রং রামচন্দ্রং নমামি ॥ ৮ ॥

বসন্তবর্ণনম্

ঝরঝরঝর নাদৈর্ব্বাতি বায়ুঃ সমন্তাৎ
কুহুকুহুকুহু শব্দান্ কোকিলঃ সন্তনোতি।
কুসুমশরসমেতঃ শীতরাজং বিজিত্য
প্রবিশতি ঋতুরাজো রাজধানীং বসন্তঃ ॥ ১ ॥

বৃক্ষাঃ সমস্তা নবপত্রভূষিতা
নতাগ্রশাখা অচিরোদ্ভবৈঃ ফলৈঃ।
সমীক্ষ্য সর্ব্বে ঋতুরাজমাগতং
নমন্তি সানন্দমিবাদরেণ ॥ ২ ॥

ভৃঙ্গাশ্চ সর্ব্বে মকরন্দলোভিতাঃ
পুষ্পান্তরং যান্তি বিহায় পুষ্পং।
পিবন্ত্যনাস্বাদিতপূর্ব্বমত্রতে
মধুপ্রমত্তানবপুষ্পসম্ভবং ॥ ৩ ॥

সকলবিহগবর্গাঃ শাল্মলীনাং দ্রুমানাং
বিকচকুসুমশাখাপ্রান্তসংসক্তদেহাঃ।
অপচিততরগাত্রাঃ শীতর্ত্তুপ্রভাবাৎ
জয় জয় জয় শব্দান্ গাপয়ন্ত্যত্র হর্ষাৎ ॥ ৪ ॥

অস্তং গতে তত্র মরীচিমালিনি
রথঞ্চ রূঢ়ে হরিতাশ্বসংযুতং।
প্রকাশয়ত্যেষ ততো বসন্তঃ
প্রিয়াং স্বকীয়ামৃতুরাজ শব্দভাক্ ॥ ৫ ॥

পুষ্পদ্রুমাণাং নবমালিকানাং
নবোদ্‌গতৈর্ম্মালতীনাং দলৈশ্চ।
পুষ্পৈরনেকৈশ্চ নিলীনভৃঙ্গৈঃ
ঋতোর্বসন্তস্য গুণা বিভান্তি ॥ ৬ ॥

নৃত্যন্তি সর্ব্বে শিখিনঃ সমন্তাৎ
নভো নিরীক্ষ্যনমিতাননৈর্মুহুঃ।
দৃষ্ট্বাতদাতে ঋতুরাজমাগতং
কুর্ব্বন্তি তত্রৈব মনোহরং কলং ॥ ৭ ॥

জলাশয়স্থান্নলিনীদলাচ্চ
সংগৃহ্য পুষ্পাচ্চ বিভাত বায়ুঃ।
মন্দং স্বনং তত্র সদৈব কুর্ব্বন্
বিস্তারয়ত্যেষ ততঃ সুগন্ধং ॥ ৮ ॥*

উপেন্দ্রসুন্দর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হারাইয়া তাঁহার ব্যাধিক্লিষ্ট দেহ-ভার বহিয়া কোনরূপে কিঞ্চিদধিক তিন বৎসর কাল অতিবাহন করিয়া-ছিলেন। ১২৯১ সালে তাঁহার ব্যাধি কঠিন ভাব ধারণ করে। কলিকাতা হইতে আহূত পরলোকগত ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের চিকিৎসাগুণে ব্যাধির কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছিল, কিন্তু তাহার ফল স্থায়ী হয় নাই; অল্পদিন পরেই আবার উহা পূর্ব্বভাব ধারণ করে। সেবারে আবার মজুমদার মহাশয়কে আহ্বান করা হয়, কিন্তু তাঁহার চিকিৎসার আর প্রয়োজন হয় নাই। ৬ই কার্ত্তিক ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পরদিন বেলা তৃতীয়

* রচয়িতার বাল্যবন্ধু কান্দির ভূতপূর্ব্ব উকীল শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত রায় মহাশয়ের নিকট কবিতাটি প্রাপ্ত হইয়াছি।

প্রহরের সময় আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীবর্গের সম্মিলিত শোকোচ্ছ্বাস ও ব্যাকুলতা তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

উপেন্দ্রসুন্দরের দুই পুত্র ও এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকমল ১২৮৩ সালে ৯ই ভাদ্র জন্মগ্রহণ করেন; তিনি অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইতেই মুঙ্গের নগরে বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৩০১ সালের ৬ই বৈশাখ দিবসে দেহত্যাগ করিয়াছেন। কনিষ্ঠ পুত্র নীলকমল ১২৮৭ সালে ১০ই কার্ত্তিক ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। কন্যা সাবিত্রী দেবীর সহিত নরেন্দ্রনারায়ণের তৃতীয় পুত্র শরদিন্দুনারায়ণের বিবাহ হইয়াছে।

"পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকার" পরিশিষ্ট অংশে রামেন্দ্রসুন্দর নরেন্দ্র-নারায়ণের যে সকল গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা সেই ভাষায় নরেন্দ্রনারায়ণ, গোবিন্দসুন্দর ও উপেন্দ্রসুন্দরের চরিত্রকে একত্র করিয়া বলিতে পারি—উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় তাঁহারা তাঁহা-দের উন্নত মস্তক কখনও অবনত করেন নাই; অথচ স্বাভাবিক সৌজন্য ও বিনয়গুণের আধার হইয়া সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তেজস্বিতায় তাঁহারা সকলের ভীতির আস্পদ ছিলেন; কোমলতায় তাঁহারা সকলের আশ্রয়স্থল ছিলেন। কঠোর ও কোমল গুণের যুগপৎ সমাবেশে তাঁহাদের মহিমান্বিত চরিত্র সকলের বিস্ময়কর ছিল। সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যে তাঁহারা উৎসাহের সহিত নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন; তাঁহাদের নেতৃত্ব ব্যতীত স্থানীয় সমাজে কোন সদনুষ্ঠানই সম্পন্ন হইত না। স্থানীয় সমাজের নেতার পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহারা চরিত্রবলে সমাজ শাসন করিতেন। তাঁহারা বর্ত্তমান থাকিতে ইতর ভদ্র বিবাদ মীমাংসার জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হইবার আবশ্যক বোধ করিত না। দুষ্কৃতকারী, কোথায় তাঁহাদের কর্ণগোচর হইবে এই আশঙ্কায়, অতি সঙ্গোপনে দুষ্ক্রিয়া সাধনে বাধ্য হইত। তাঁহাদের চরিত্রবল অপরকে

সংযত রাখিতে সমর্থ হইত। বিপৎকালে ইতরভদ্র সকলেই তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিত। সকলেই জানিত, আপৎকালে তাঁহাদের আশ্রয়গ্রহণ নিষ্ফল হইবে না। সাহায্যপ্রার্থী বা ভিক্ষার্থীকে তাঁহারা কখনও বিমুখ করেন নাই। তাঁহাদের সৌজন্যের ও মিষ্টবাক্যের অসাধারণ বশীকরণশক্তি ছিল। অপরিচিত ব্যক্তি একবার তাঁহাদের স্পর্শে আসিলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বশীভূত হইয়া পড়িত। তাঁহাদের প্রতিশ্রুতির কখনও ব্যতিক্রম হয় নাই। নীচ কর্ম্মে কখনও তাঁহারা প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহাদের পরিবারবর্গ ও স্বজনগণমধ্যে তাঁহাদের আদেশ সম্রাটের ন্যায় লঙ্ঘনাতীত ছিল। সেই আদেশ প্রদানের জন্য তাঁহাদিগকে ও আদেশ পালনের জন্য অপরকে কখনও পরিতপ্ত হইতে হয় নাই। উপেন্দ্রসুন্দরের চরিত্রে আরও একটু বিশেষত্ব ছিল, কোমলভাব তাঁহার অন্তর-নিহিত গাম্ভীর্য্যকে অনেক সময়ে সরস করিয়া রাখিত।

পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকায় রামেন্দ্রসুন্দর লিখিয়াছেন, "পিতৃপুরুষ-গণের তপঃসঞ্চিত পুঞ্জীভূত পুণ্যরাশি, বজ্রাদপি কঠোর ও কুসুমাদপি কোমল, হিমাচলের ন্যায় উন্নত ও মহোদধির ন্যায় গভীর, মানব হৃদয়ের সমগ্র সদ্বৃত্তিসমূহের সমষ্টীকৃত সমবায়, সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, এক হইয়া ও মূর্ত্তিত্রয় পরিগ্রহ করিয়া, লোকশিক্ষার জন্য ধরাধামে বিচরণ করিতেছিলেন। কাল-পূর্ণ হইলে তিন মূর্ত্তি একে একে অন্তর্হিত হইল।"

কৃষ্ণসুন্দর ত্রিবেদীর সম্মতিক্রমে ব্রজসুন্দর ত্রিবেদী দুইটি মধ্যবিত্ত ঘরের কন্যা আনিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার নির্ব্বাচন সকল সময়ে সুফল প্রসব করিয়াছিল। গোবিন্দসুন্দরের পত্নীর নাম চন্দ্রকামিনী দেবী এবং উপেন্দ্রসুন্দরের পত্নীর নাম ছিল বগলা দেবী। ঐ মহীয়সী মহিলাদ্বয়ের আদর্শ দেবোপম চরিত্র তাঁহাদের আজন্মশুদ্ধ দেবোপম স্বামীদিগের অপাপবিদ্ধ আদর্শ চরিত্রের সমতুল্য ছিল। যোগ্য পতির

গোবিন্দসুন্দর ২৮পৃষ্ঠা

চন্দ্রকামিনী দেবী ২৯পৃষ্ঠা

সহিত যোগ্য পত্নীর সম্মিলন ঘটিয়া, 'যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে' এই বাণীর সম্পূর্ণ সার্থকতা সাধন করিয়াছিল। চন্দ্রকামিনী ও বগলাদেবীর চিত্তে আত্মীয়পর ভেদজ্ঞান ছিল না। তাঁহাদের সন্তানবর্গ এবং আত্মীয় ও আশ্রিত জনগণকে তাঁহারা তুল্যরূপেই দর্শন করিতেন। লোকসেবার জন্য তাঁহারা সর্ব্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। ভিক্ষার্থীকে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া তাঁহাদের অভ্যাস ছিল না,—অঞ্জলি ভরিয়া ভিক্ষা দিতেন। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বিধবাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম তাঁহারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। সাধনার বলে মানবচরিত্রসুলভ সর্ব্বপ্রকার লোভনীয় বস্তু পরিহার করিয়া তাঁহারা নিজ চরিত্রকে সংযত করিয়া আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কঠোর ব্রতোপবাসাদি কৃচ্ছ্র সাধনায় যদি ধর্ম্ম থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা অক্ষয় ধর্ম্মসম্পদের অধিকারিণী হইয়াছেন বলিতে পারি। স্বামীরা অনেকগুলি অল্পবয়স্ক বালকবালিকার গুরুভার তাঁহাদের স্কন্ধে অর্পণ করিয়া অল্প বয়সে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন। ছেলেদের শুধু খাওয়াইয়া পরাইয়া বড় করিয়া তুলিতে পারিলেই পিতামাতার কর্ত্তব্য সাধন করা হয় না—তাহাদের মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। অভিভাবকহীন বালকবালিকাগণ তাহাদের মাতার কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া প্রকৃত মানুষ হইয়াছিল।

দেবদ্বিজে চন্দ্রকামিনী ও বগলা দেবীর অসাধারণ ভক্তি ছিল। তাঁহারা গুরুজনদিগকে প্রত্যক্ষ দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন। ব্রজসুন্দর ত্রিবেদীর সহধর্ম্মিণী আমার মাতামহী তিনকড়ি দেবীর অঙ্কে আমি মানুষ হইয়াছি, তাঁহাকে অনেক দিন বাঁচিতে দেখিয়াছি। তাঁহার পক্ষে বধূদিগের প্রতি অপার স্নেহ, এবং পক্ষান্তরে শাশুড়ীর প্রতি অশেষ ভক্তি এমনটি আমরা কখনও দেখি নাই, জীবনে কখনও তাহা বিস্মৃত হইতে পারিব না। সেই স্নেহশীলা বৃদ্ধা শাশুড়ীকে সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টাকে

তাঁহারা পরম পুণ্যের কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। আমরা এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি, শাশুড়ী বধূতে কোন দিন কোন বিষয় লইয়া মনোন্তর ঘটে নাই।

চন্দ্রকামিনী দেবী তাঁহার স্বামীর ন্যায় কিছু গম্ভীর ও শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন। কেহ কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করিলে, তাহার প্রতি কঠোর শাসনবাক্য প্রয়োগ করিবার আবশ্যক হইত না, তাঁহার গম্ভীর মুখমণ্ডলে বিরক্তির ভাব দেখিলেই অন্যায়কারী একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত। স্বামীর ন্যায় বগলা দেবীর সরল মুক্ত অন্তঃকরণ হইতে সর্ব্বদা সুধার ধারা বহিয়া যাইত। একবার সেই ধারায় যে অবগাহন করিয়াছে, সেই স্নিগ্ধ হইয়াছে।
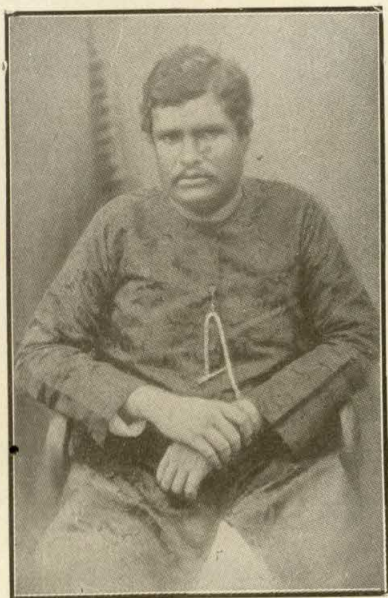
উপেন্দ্রসুন্দর ৩০পৃষ্ঠা।
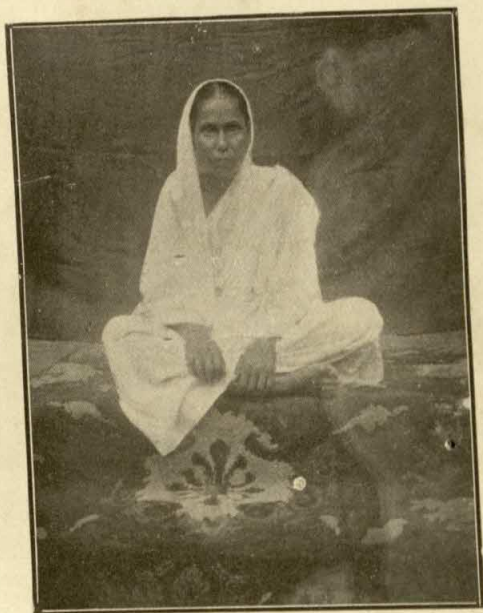
বগলা দেবী　　　　৩১পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়

শৈশব ও পূর্ব্ব ছাত্রজীবন

১২৭১ বঙ্গাব্দের ৫ই ভাদ্র শনিবার কৃষ্ণা চতুর্থী তিথিতে শুভক্ষণে গোবিন্দসুন্দরের পত্নী চন্দ্রকামিনী দেবী জেমোর নূতন বাড়ীতে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র বহির্ব্বাটীতে পিতামহ ব্রজসুন্দরের নিকট সেই শুভ সংবাদ প্রেরিত হইল; পৌত্র-মুখ নিরীক্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে ব্রজসুন্দর সূতিকা-গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং পরক্ষণেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এই শিশু উত্তরকালে প্রতিভাবলে, বিদ্যাবত্তায় ও চরিত্র-গুণে অক্ষয় যশঃ-সম্পদ লাভ করিয়া আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবে, সুধীজনাকাঙ্ক্ষিত গৌরবময় পদ লাভ করিয়া জনসমাজে প্রচুর খ্যাতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে, এবং ইহার গৌরব-প্রভায় আমাদের বংশের নাম সমগ্র দেশে রাষ্ট্র হইয়া পড়িবে, সেই শুভদিন দেখিবার অবসর আমার জীবনে ঘটিবে না, তৎপূর্ব্বেই আমাকে পরপারের আহ্বানে লোকান্তরে যাইতে হইবে। যাঁহারা বর্ত্তমান রহিবেন, তাঁহারা দেখিবেন।" কথা বলিবার সময় স্বভাব-কবি ব্রজসুন্দরের হৃদয়োচ্ছ্বাসজনিত অশ্রুপ্রবাহে গণ্ডস্থল প্লাবিত হইয়াছিল। ঊর্দ্ধলোক হইতে বিধাতা পুরুষ সেই মহা-পুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন, এবং তৎসাধনে যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ব্রজসুন্দর যেন ভবিষ্যৎকে জানিয়াই সেই লোকরঞ্জন সর্ব্বজনপ্রিয় পৌত্রের নাম রাখিয়াছিলেন "রামেন্দ্রসুন্দর।"

কৃষ্ণসুন্দর পৌত্র রামেন্দ্রসুন্দরকে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।

রামেন্দ্রসুন্দর ভূমিষ্ঠ হইবার সার্দ্ধ দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার দেহাত্যয় ঘটিয়াছিল। পিতামহতুল্য ব্রজসুন্দরকে আমরা পিতামহ বলিয়া প্রসঙ্গের অবতারণা করিলাম। পিতা ও পিতৃব্যকে বাবা, এবং মাতা ও পিতৃব্যপত্নীকে মাতৃসম্বোধনের রীতি আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। তাই ব্রজসুন্দরকে পিতামহ সম্বোধন করিলে ক্ষতি নাই।

দুঃখের বিষয় বিধাতা পুরুষ কোন মানবকেই সকল সুখ-সম্পদ সৌভাগ্যের অধিকারী করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। রামেন্দ্রসুন্দর বাল্যকাল হইতে দৈহিক সুখে বঞ্চিত ছিলেন। ক্ষীণাঙ্গ শিশু নিত্য নূতন রোগ ভোগ করিয়া শৈশব উত্তীর্ণ করিল। অত্যধিক স্নেহাদর লাভ করিয়া বালক পিতামহের প্রতি অতিমাত্র আসক্ত হইয়া পড়িল, পিতামহের কণ্ঠলগ্ন হইয়া তাঁহার প্রশস্ত পৃষ্ঠোপরি দিবসের অনেক সময় কাটাইয়া দিত। ব্রজসুন্দরের বিশাল দেহে ক্ষীণাঙ্গ ক্ষুদ্র বালককে ঝুলিতে দেখিয়া অনেকে উপহাসচ্ছলে বলিত "বাদুড় ঝুলিছে যেন তেঁতুলের গাছে।" ক্ষুদ্র পৌত্রটির সকল কথা হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও পিতামহ নানাবিধ অদ্ভুত গল্পের অবতারণা করিয়া বালকের চিত্তরঞ্জন করিবার প্রয়াস পাইতেন। দুঃখের বিষয় সেই আদরযত্ন লাভ করিবার অবসর বালকের অদৃষ্টে অধিক দিন ঘটিয়া উঠে নাই, বালকের চারি বৎসর বয়স পূর্ণ না হইতেই পিতামহকে পরপারের আহ্বানে সকল বিসর্জ্জন দিয়া চলিয়া যাইতে হইয়াছিল।

ব্রজসুন্দরের পরলোক গমনের পর বালক তাহার পিতৃব্য উপেন্দ্রসুন্দরের একান্ত অনুগত হয়। বাল-স্বভাব উপেন্দ্রসুন্দর বালক ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত খোলা প্রাণে মিশিয়া, আদর করিয়া, যত্ন করিয়া তাহাকে অচ্ছেদ্য প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন; তাঁহার জীবনান্ত পর্য্যন্ত সে বন্ধন সমান ভাবে অটুট ছিল। চারি বৎসর পূর্ণ হইলে পঞ্চম বৎসরের প্রারম্ভে

এক শুভ দিনে পিতা বালককে বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত করিলেন। পিতা এবং পিতৃব্যের চেষ্টায় দুই দিনেই বালকের বর্ণপরিচয় হইল। পিতা এবং পিতৃব্য উভয়েই তাহাকে মুখে মুখে বর্ণবিন্যাস-কৌশল শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বর্ণপরিচয়ের পর স্বরবর্ণযুক্ত বর্ণ-বিন্যাস শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে এক দিন বালক তাহার পিতা গোবিন্দসুন্দরের কথার প্রতিবাদ করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণকে স্তম্ভিত করিয়াছিল। পিতা বালককে অভ্যাস করিতে বলিলেন, 'ম, র আর মূর্দ্ধন্য ণ, মরণ'। পুত্র পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, 'না মোরণ হইবে'। উচ্চারণ করিবার সময় আমরা সাধারণতঃ শব্দের আদিস্থিত 'ম' অক্ষরটিকে 'মো' বলিয়া উচ্চারণ করি। এরূপ প্রশ্ন করিলে শিক্ষক মহাশয়গণ সাধারণতঃ তাঁহাদের ক্ষুদ্র শিক্ষার্থীদিগের প্রতি অবিচারিত ভাবে তিরস্কার করিয়া থাকেন; কিন্তু এ ক্ষেত্রে বুদ্ধিমান্ পিতা পুত্রকে ধমক না দিয়া উচ্চারণ বৈষম্যের বিষয় ভালরূপে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, বালক যুক্তিযুক্তরূপে তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়া নিজের প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিল। পাঠাভ্যাসকালে নানাজাতীয় সমস্যার কথা বালকের মনে উদিত হইত, সেই সকল সমস্যাপূরণের জন্য বালক পিতা এবং শিক্ষকগণের নিকট নানাপ্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে চমৎকৃত করিত।

বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ শেষ করিলে গোবিন্দসুন্দর পুত্রকে তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে জেমোর পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। বালক নিয়মিত সময়ে বিদ্যালয়ে যাতায়াত আরম্ভ করিল, ছুটির দিনে, কিংবা শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন কোন দিন অপারক হইলে বিদ্যালয়ে যাইত না, তদ্ভিন্ন ইচ্ছা করিয়া কোন দিন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত হইত না। নিরীহ ও

শান্ত-স্বভাব বালক কখন সহপাঠিগণের সহিত ঝগড়া করিয়া তাহার স্বভাবসিদ্ধ শান্ত প্রকৃতির বিপরীত ভাবের পরিচয় দেয় নাই। কোন সহপাঠী তাহার বিরুদ্ধে কখন শিক্ষকদিগের নিকট কোনরূপ অভিযোগ আনয়ন করে নাই।

বালক রামেন্দ্রসুন্দর অল্প বয়সে গণিত শাস্ত্রে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিল। তৎকালীন প্রথানুসারে বালককে আট বৎসর বয়সেই জ্যামিতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইত। অল্পবয়স্ক বালকদিগের নিকট জ্যামিতি শাস্ত্র অতি বিভীষিকার বস্তু। বালক দুই বৎসরের মধ্যেই জ্যামিতির প্রথম খণ্ডের যাবতীয় অনুশীলনী সমেত প্রতিজ্ঞাগুলির নির্ভুলরূপে সমাধান করিত, এবং পাটীগণিত ও শুভঙ্করী-সংক্রান্ত সকল প্রকার সমস্যাগুলি অনায়াসে মীমাংসা করিয়া দিত। পিতা ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি গল্পচ্ছলে পুত্রকে শিক্ষা দিতেন। তাহার নিকট বীরগণের বীরত্বের কথা ও দেশের জন্য আত্মত্যাগের কাহিনী জ্বলন্ত ভাষায় ব্যক্ত করিয়া তিনি তাঁহার অষ্টমবর্ষীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রটির মনে স্বদেশভক্তি সঞ্চারিত করিবার জন্য কতই না প্রয়াস পাইতেন। পিতার নিকট স্বদেশপ্রেমের উপদেশ লাভ করিয়া বাল্যকালেই রামেন্দ্রসুন্দরের মনে স্বদেশভক্তিরসের সঞ্চার হইয়াছিল। উত্তরকালে সেই ভাব মানস-ক্ষেত্রে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া তাঁহাকে দেশমাতার ভক্ত সন্তানরূপে পরিণত করিয়াছিল। তাঁহার অন্তিমকালেও আমরা তাঁহার অন্তরমধ্যে ঐ ভাবের পূর্ণবিকাশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

দিবাবসানে রজনীযোগে নির্ম্মল আকাশে গ্রহনক্ষত্ররাজি ফুটিয়া উঠিলে, পিতা ঊর্দ্ধদেশে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া গ্রহনক্ষত্রগণের নাম, তাহাদের গতি, এবং ঋতুভেদে তাহাদের স্থান পরিবর্ত্তনের বিষয় সরল ভাষায় পুত্রকে বুঝাইয়া দিতেন। বালক একবার যাহা শিখিত তাহা ভুলিত না।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে মে রামেন্দ্রসুন্দর প্রথমে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, তথায় পাঠাভ্যাস করিবার সময় পিতা পুনঃ পুনঃ পুত্রকে শিক্ষা দিতেন, "ক্লাসের পরীক্ষায় সকলের উচ্চে না থাকিতে পারিলে গৌরব নাই; কিন্তু ফাঁকি দিয়া উচ্চে উঠিবার চেষ্টা লজ্জার কথা"। প্রতিবার বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পাঁচ বৎসর পরে রামেন্দ্রসুন্দর একাদশ বৎসর বয়সে ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে নবেম্বর মাসে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেন, এবং সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া গবর্ণমেণ্ট দত্ত বৃত্তি লাভ করেন।

গোবিন্দসুন্দর পুত্রের কৃতিত্বে পরম আহ্লাদিত হইয়া বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদিগকে লইয়া একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করেন।

ম্যাকেঞ্জি সাহেব জেমো বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবার সময় পরীক্ষার ছলে বালক রামেন্দ্রসুন্দরকে কয়েকটি ভৌগলিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই প্রশ্ন ও উত্তর নিম্নে বিবৃত হইল।

সাহেব। গঞ্জাম কি এবং কোথায়?

বালক। উড়িষ্যার দক্ষিণে মান্দ্রাজ প্রদেশের একটি জেলা।

সাহেব। উহার প্রধান নগরের নাম কি?

বালক। বহরমপুর।

সাহেব। তোমাদের জেলার এক্ষণে প্রধান নগরের নাম কি?

বালক। বহরমপুর।

সাহেব। দুইটি বহরমপুরে প্রভেদ বুঝিব কি প্রকারে?

বালক। একটি বঙ্গদেশের মুরশিদাবাদ জেলার প্রধান নগর বহরমপুর, অপরটি মান্দ্রাজ প্রদেশের গঞ্জাম জেলার নগর বহরমপুর।

সাহেব ঐরূপ উত্তর লাভ করিয়া প্রফুল্ল মুখে সমবেত ভদ্রজনদিগকে বলিলেন,—"আমি কিছুকাল গঞ্জামে ছিলাম, তাহার স্মৃতি এখনও ভুলিতে পারি নাই, বাঙ্গালা দেশে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসিয়া ভূগোলের

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার সময় সেই গঞ্জামের কথা আমার মনে পড়ে। বাঙ্গালা দেশে কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রের মুখে গঞ্জাম সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর আমি পাই নাই। অদ্য এই বালকের নিকট উত্তর পাইয়া বড়ই প্রীতি লাভ করিলাম।” এই কথা বলিয়া তিনি আদর করিয়া বালকের পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য তৎকালে ছেলেদের পাঠ্যপুস্তকে গঞ্জাম জেলার উল্লেখ ছিল না। বৃহত্তর পুস্তক পাঠ করিয়া একাদশবর্ষীয় বালক সমগ্র ভারতের এবং সমগ্র পৃথিবীর ভৌগলিক বৃত্তান্ত সুচারুরূপে আয়ত্ত করিয়াছিল।

পাঠশালায় পড়িবার সময় বালক দৈনন্দিন পাঠ আয়ত্ত করিতে অধিক সময় দিত না; কোন দিন দুই এক ঘণ্টার অধিক সময় অধ্যয়ন করিত না। ঐ অল্প সময়ের মধ্যে সে সকল বিষয়ের পাঠ অতি সুন্দররূপে অভ্যাস ও আয়ত্ত করিয়া লইত, তৎকালে অনন্য মনে একান্তচিত্ত সাধকের ন্যায় সকল ভুলিয়া নিজের কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত রহিত এবং কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া পরে অবশিষ্ট সময় খেলিয়া বেড়াইত। এক দিন প্রাতঃকালে আটটার পূর্ব্বে বালককে খেলা করিতে দেখিয়া পিতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “পড়াশুনা না করিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছ কেন?” বালক নির্ভয় অন্তঃকরণে উত্তর দিয়াছিল, দৈনন্দিন নির্দ্দিষ্ট পাঠ অভ্যাস না করিয়া সে কখনও খেলিয়া বেড়ায় না। পিতা পুত্রের ঐরূপ কথায় বিশ্বাস না করিয়া তাহার দৈনিক পাঠের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য তিনি পুত্রের নিকট যেরূপ উত্তর পাইবার আশা করিয়াছিলেন তদধিক উত্তর লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পর দিন রবিবারে পরীক্ষা গ্রহণ-কালে পুরাতন পাঠ হইতে পিতা পুত্রকে বহুবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সকল প্রশ্নের উত্তরে তিনি সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। সেই অবধি আর কোন দিন তিনি পুত্রকে পড়িতে বসিবার জন্য আদেশ করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই।

বাল্যকালে নিজের দ্রব্যের প্রতি রামেন্দ্রস্থন্দরের বিশেষ দৃষ্টি ও যত্ন ছিল। নিজের পেন্সিলটি, দোয়াতটি, কলমটি, শ্লেটখানি ও পুস্তকগুলি তিনি যথাস্থানে সজ্জিত করিয়া রাখিতেন। কেহ কোন কারণে তাঁহার কোন একটি দ্রব্য স্থানান্তরিত করিলে, তাহার অনুসন্ধান করিয়া যথাস্থানে রাখিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। তাঁহার নিজের কোনরূপ কর্ত্তব্য কার্য্যে কোন দিন ত্রুটি হইত না। প্রাচীন লোকদিগের মুখে শুনিয়াছি, ঐরূপ কর্ত্তব্যবুদ্ধিসম্পন্ন বালক সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

শৈশবে তাঁহার তিনটি মাত্র বিষয়ে আসক্তি ছিল। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিবার দুই এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি কড়ি খেলিতে ভালবাসিতেন। কাগজে অথবা মাটীতে কালি বা খড়ি দিয়া ঘর অঙ্কিত করিয়া বাঘবন্দী, ছক্কাপঞ্জা, মোগলপাঠান প্রভৃতি নানাপ্রকার খেলা করিতেন। খেলিবার সময় তিনি মনে বড় আনন্দ পাইতেন। তিনি নূতন পুস্তক পাঠ করিতে যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিতেন, খেলিবার সময় তাঁহার মনে তদপেক্ষা অল্প আনন্দ প্রকাশ পাইত না। তাঁহার ছোট মাতুল কুলদাপ্রসাদ ত্রিবেদী এবং সমবয়স্ক দুই চারিজন বালক-বালিকা তাঁহার খেলিবার সাথী ছিলেন। খেলায় জয়লাভ করিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। তিনি তাস খেলার আজীবন পক্ষপাতী ছিলেন, অবসর পাইলে পরিণত বয়সেও সময়ে সময়ে তাস খেলিয়া চিত্ত বিনোদন করিতেন। দৈহিক দুর্ব্বলতার জন্য তিনি কোন প্রকার শ্রমসাধ্য ক্রীড়ায় যোগদান করিতে পারিতেন না।

উপেন্দ্রস্থন্দর বাড়ীর উঠানে এবং বহিরাঙ্গনে দুইটি পুষ্পোদ্যান রচনা করিয়াছিলেন, সেই উদ্যানদ্বয়ের পারিপাট্যসাধনে রামেন্দ্রস্থন্দর যত্ন করিতেন। গাছে জলসেক করা, গাছ ছাঁটিয়া দেওয়া, এবং ঘাস ও

আগাছার আক্রমণ হইতে ফুল গাছগুলি রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। যখন নিজের সামর্থ্যে কুলাইত না, তখন তিনি পরের সাহায্য লইয়াও মনোভিলাষ পূর্ণ করিতেন। গাছে নূতন ফুল ফুটিলে সকলকে তাহা দেখাইয়া তিনি আনন্দ অনুভব করিতেন। কলিকাতাপ্রবাসী হইলে তাঁহার ঐ স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে।

রামেন্দ্রসুন্দর একটি কুকুর পুষিয়াছিলেন। কুকুরটি তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। তাহার নাম ছিল "কাল্টা"। দেশীয় কুকুরের মধ্যে ঐরূপ বৃহৎ আকারের কুকুর আমরা দেখি নাই। দীনতা স্বীকার করিলে কোন স্বজাতিকে আক্রমণ করিয়া নির্য্যাতন করা কাল্টা মর্য্যাদার হানিকর বলিয়া মনে করিত। তাহার দেহ এবং মুখের ভাব নিরীক্ষণ করিলে অনেকের মনে ভয়ের সঞ্চার হইত। বালকেরা খেলার ছলে তাহার লাঙ্গুল মর্দ্দন করিয়া, পৃষ্ঠে চাপিয়া এবং মুখের ভিতর হাত প্রবেশ করিয়া দিয়া অনেক সময় তাহার প্রতি অনেক অত্যাচার করিত। তাহাদের খেলা দেখিয়া অনেকের মনে ভয় হইত; কিন্তু সে কখনও বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিত না, গম্ভীর প্রকৃতির সুবোধ মুরব্বীর মত অকাতরে সকল অত্যাচার সহ্য করিত। সেই প্রভুপরায়ণ জন্তুটি তাহার প্রভুপরিবারের বড়ই বিশ্বাসের পাত্র ছিল, কচি ছেলেমেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণে সদাসর্ব্বদা নিযুক্ত রহিত। অপরিচিত কোন ব্যক্তি শিশুদের নিকট গেলে সে বিষম গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিত। রন্ধনশালার বিনা বেতনের প্রহরী সেরূপ আর মিলিবে না। স্তূপীকৃত লোভনীয় খাদ্য সামগ্রী সম্মুখে রাখিয়া রন্ধনশালার দ্বারে বসিয়া রহিবার সময় যে তাহার রসনায় জলসঞ্চার হইত না, এ কথা নিশ্চয়তার সহিত বলিতে পারি না। কিন্তু লোভের প্রশ্রয় দিয়া কোন দিন সে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দেয় নাই। কুকুরজাতির মনোবিজ্ঞানে ইহা একটি অসাধারণ প্রকৃতি। সে প্রতিদিন রামেন্দ্রসুন্দরকে

স্কুলে রাখিয়া আসিত, এবং প্রভু ছুটির পর বাড়ী ফিরিলে বড় আনন্দের সহিত তাহার অভ্যর্থনা করিত। নিজগুণে সে প্রভুপরিবারে একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মৃত্যু হইলে প্রভুপরিবার স্বজন-বিয়োগ-দুঃখ অনুভব করিয়াছিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাড়ীতে বসিয়া দুই মাস কাল পিতার নিকট ইংরাজী শিক্ষা করেন। দুই মাসে দুই বৎসরের পাঠ শেষ করিয়া তিনি ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে জানুয়ারী কান্দি ইংরাজী বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। প্রথম ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করায় অথবা অন্য কোন কারণে সেবার বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থানের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় স্থান পাইলেন; পিতা সেই জন্য বড় দুঃখ প্রকাশ করিলেন। পুত্র পিতার দুঃখ দেখিয়া সাবধান হইল। ভবিষ্যতে আর ঐরূপ ঘটনার জন্য পিতাকে দুঃখ পাইতে হয় নাই, পুত্র প্রতিবৎসরই বার্ষিক পরীক্ষায় শীর্ষস্থান লাভ করিয়া পিতার মনে সন্তোষ উৎপাদন করিত।

জেমোর নূতন বাড়ীতে থাকিয়া রামেন্দ্রসুন্দরের দুই জন আত্মীয় কান্দি স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহাদের সহিত রামেন্দ্রসুন্দরের বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। টেয়াগ্রামে তাঁহাদিগের বাড়ী। এক জনের নাম শ্রীযুক্ত মুকুন্দকুমার ত্রিবেদী, সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দরের খুল্লপিতামহ। অপরের নাম নৃসিংহপ্রসাদ ত্রিবেদী, তিনি খুল্লতাত ছিলেন। উভয়কেই আমরা রামেন্দ্র-সুন্দরের বাল্য সহচররূপে গণ্য করিতে পারি। মুকুন্দকুমার পঠদ্দশায় অভিভাবকহীন হওয়ায় সংসার পরিচালনা করিবার জন্য স্কুল ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কান্দি স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া নৃসিংহপ্রসাদ ফার্ষ্ট আর্টস্ পড়িবার জন্য কৃষ্ণনগর গমন করেন, তথা হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিকাল কলেজে পড়িবার জন্য কলিকাতায় যান।

কান্দি স্কুলের দুই জন প্রধান শিক্ষক ব্যতিরেকে অপর শিক্ষকগণ রামেন্দ্রসুন্দরের গুণের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। হেড মাষ্টার হরিমোহন সিংহ মহাশয় প্রথম অবস্থায় ছাত্র রামেন্দ্রসুন্দরের প্রশংসা করিতে পারিতেন না। কিন্তু ঐ ছাত্রের গুণে কান্দির স্কুল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় যখন শীর্ষ-স্থান অধিকার করিল, শুনিতে পাই, স্কুলের কর্তৃপক্ষ হরিমোহনের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। উত্তর কালে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিভা যখন দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, যখন তিনি সুধীসমাজে সম্মান ও শ্রদ্ধার আসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তখনও হরিমোহন বাবু তাঁহাকে অর্থকর কার্য্যে লিপ্ত না হইয়া শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করার জন্য সময়ে সময়ে তিরস্কার করিতেন। রামেন্দ্রসুন্দর নীরবে মাথা পাতিয়া সেই স্নেহের তিরস্কার গ্রহণ করিতেন; হরিমোহন বাবুর আচরণের বিরুদ্ধে তাঁহাকে কোন দিন কোন কথা বলিতে শুনি নাই। হরিমোহন বাবু রামেন্দ্রসুন্দরকে অনেক সময় তিরস্কার করিতেন বটে, কিন্তু উভয়ের অন্তর শেষ দিন পর্য্যন্ত স্নেহের একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনে অতি দৃঢ় ভাবে সংবদ্ধ ছিল। পরবর্ত্তী কালে হরিমোহন তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সভ্যসমাজে সমাদৃত জ্ঞানবৃদ্ধ ঐ ছাত্রটির গুণপণার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বন্ধুসমাজে তাঁহার কৃতী ছাত্রের গুণের কথা উল্লেখ করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতেন, এবং ঐ ছাত্রের শিক্ষাগুরু বলিয়া নিজের গৌরব প্রকাশ করিতেন।

সংস্কৃতের প্রধান শিক্ষক দেশবিখ্যাত রামতারণ শিরোমণি মহাশয় ছাত্র রামেন্দ্রসুন্দরের কখনও নিন্দাবাদ করেন নাই সত্য কথা, কিন্তু তাঁহার অপেক্ষা হীনতর প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্রের অধিকতর প্রশংসা করিতেন। কিন্তু সেই ছাত্রটি এক দিন প্রাচ্য দর্শন, বিজ্ঞান, বেদান্ত ও বেদোক্ত যজ্ঞবিধির বিষয় আলোচনা করিয়া দেশবাসী পণ্ডিতসমাজে বরণীয়

হইয়াছিলেন। শিরোমণি মহাশয় তাঁহার ছাত্রের বিশেষ গুণপণার পরিচয় পাইবার পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন।

এন্ট্রান্স স্কুলে পড়িবার সময় রামেন্দ্রসুন্দরের পাঠাভ্যাসপ্রবৃত্তি অতিমাত্র প্রবল হইয়া উঠে। নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক ব্যতিরেকে তিনি নানাবিষয়ের নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিয়া প্রভূত জ্ঞানসঞ্চয় করিয়াছিলেন। তখন তিনি এলফিনষ্টোন্, গ্রীন, হিউম, গিবন প্রভৃতি রচিত বড় বড় গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঐ সময়ে গোবিন্দসুন্দর ও উপেন্দ্রসুন্দর জেমোর ভদ্রলোকদিগকে লইয়া একটি অভিনেতৃসম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন, সেই অভিনয়ের বৈঠক জেমোর নূতন বাড়ীতে বসিত। সন্ধ্যার পর অভিনেতৃগণের গীতবাদ্য এবং বক্তৃতার শব্দে বাড়ী মুখরিত হইত। সেই গোলযোগে পাঠার্থী রামেন্দ্রসুন্দরের পাঠের কোন বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিত না। তিনি নির্জ্জনে গৃহান্তরে বসিয়া অভিনিবেশ-সহকারে নিজ কর্ত্তব্য সাধনে ব্যাপৃত রহিতেন। তিনি পিতার আদেশ পাইয়া এক রাত্রিমাত্র দর্শকরূপে অভিনয়ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন অন্য কোন দিন অভিনয় দর্শন করেন নাই। প্রতি বৎসর শীতকালে পশ্চিম প্রদেশ হইতে দুই চারি দল বাজীকর বাজী দেখাইয়া পুরস্কার পাইবার আশায় নূতন বাড়ীতে উপস্থিত হইত। বাড়ীর উঠানে ঢোলক বাজাইয়া বক্তৃতা করিয়া বাজীকরগণ দর্শকদিগের চিত্তাকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিত, রামেন্দ্রসুন্দর গৃহের মধ্যে বসিয়া একান্তমনে পাঠাভ্যাস করিতেন। বাজীকরগণের শব্দ বা বাজী দেখিবার প্রলোভন তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইত না। তিনি পাঠ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া বাজী দেখিতেন না; খুল্লতাত তাঁহাকে আদেশ করিলে বাহিরে আসিয়া বাজী দেখিতেন।

কান্দি ইংরাজী স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়িবার সময় রামেন্দ্রসুন্দরের

পিতৃবিয়োগ ঘটে। সেই আকস্মিক শোচনীয় ঘটনায় তিনি বড়ই আকুল হইয়া পড়েন, লেখাপড়া ত্যাগ করিয়া কিছু দিন উদাসীন ভাবে কাটাইয়া দেন। তাঁহার পিতৃব্য উপেন্দ্রসুন্দর ভ্রাতুষ্পুত্রের সেই ভাবান্তর উপলব্ধি করিয়া, তাঁহাকে যত্নসহকারে নানারূপ উপদেশ দিয়া তাঁহার মনোভাব পরিবর্ত্তনের জন্য চেষ্টা করেন। তিনি উপদেশ ছলে বলিয়াছিলেন,—"যে পুত্র পিতার মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে না পারে, সে পুত্রনামের যোগ্য নহে। তোমার স্বর্গগত পিতার অভিপ্রায় অনুসারে তোমাকে পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতে হইবে, এ কথা ভুলিও না।" পিতৃব্যের উপদেশে রামেন্দ্রসুন্দরের মন হইতে উদাসীনতার কুয়াসা কাটিয়া গেল। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত জাগিয়া নিজের কর্ত্তব্য সাধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতামহের আমলের একটি প্রাচীন ভৃত্য ছিল, তাহার নাম গঙ্গা-নারায়ণ। সেই বিশ্বস্ত ভৃত্যটি সমস্ত দিন নিজের কাজ সম্পন্ন করিয়া, পাঠ নিরত বালকের নিকট জাগিয়া বসিয়া থাকিত এবং তালপাথার বাতাস দিয়া মশকের অত্যাচার হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিত। পাঠ শেষ করিতে কোন কোন দিন রাত্রি দুইটা বাজিয়া যাইত। তখন বালককে তাহার নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শয়ন করাইয়া, পরে সে বিশ্রাম করিত। রামেন্দ্রসুন্দর গঙ্গা-নারায়ণকে ভৃত্য মনে করিতেন না, তাহাকে "জ্যেঠা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন, এবং কখন তাহার নিন্দা করিতেন না।

ইংরাজী স্কুলে পড়িবার সময় রামেন্দ্রসুন্দর চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে ১২৮৫ বঙ্গাব্দে ২৪শে বৈশাখ নরেন্দ্রনারায়ণের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীযুক্তা ইন্দুপ্রভা দেবীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

কান্দি ইংরাজী স্কুলে পড়িবার সময় কান্দির স্কুলের, পাঁচ জন ছাত্রের সহিত রামেন্দ্রসুন্দরের বিশেষ বন্ধুতা ছিল। আমরা এ স্থলে তাঁহাদের নাম

উল্লেখ করিতে পারি। উক্ত পাঁচ জন বন্ধুর মধ্যে আরা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার শিবনাথ গুপ্ত, ভোলানাথ ছুবে ও কুলদানন্দ চট্টোপাধ্যায় পরলোক গমন করিয়াছেন, এবং রিপণকলেজ-স্কুলের বর্ত্তমান হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সিংহ ও কান্দি স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত মধুসূদন সিংহ অদ্যাপি জীবিত আছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

উত্তর ছাত্রজীবন

রামেন্দ্রসুন্দর ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে কান্দি স্কুল হইতে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান পাইয়া, গবর্ণমেণ্টদত্ত মাসিক পঁচিশ টাকা বৃত্তি লাভ করিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের ঐ প্রকার আশানুরূপ সফলতা লাভে পরম প্রীত হইয়া পিতৃব্য উপেন্দ্রসুন্দর তাঁহাকে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিবার ইচ্ছা করিলেন। স্নেহের পুত্র এতদিন নিকটে রহিয়া বিদ্যাভ্যাস করিত, তাঁহাকে দূর দেশে পাঠাইতে পিতৃতুল্য পিতৃব্যের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, গৃহস্থলীর যথারীতি ব্যবস্থা করিয়া, প্রয়োজনমত দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া সপরিবারে কলিকাতায় গিয়া বাস করিবেন। তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া নরেন্দ্রনারায়ণ তাঁহাকে কলিকাতায় বাস করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি বলিলেন—"রীতিমত পর্য্যবেক্ষণের অভাবে তোমার বিষয় সম্পত্তি সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইবে না, ইহা বুঝিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিও।" নরেন্দ্রনারায়ণের কথা অলঙ্ঘ্য ছিল, অবশেষে উপেন্দ্রসুন্দর তাঁহার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কঠোর কর্ত্তব্যের আবরণে হৃদয়ের কোমল বৃত্তিকে চাপিয়া রাখিয়া তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ১২৮৮ সালের ২১এ মাঘ কলিকাতা চলিয়া গেলেন। ছাত্রাবাসে সাধারণ ছাত্রদিগের সহিত একত্র বাস করা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের পক্ষে কষ্টকর হইবে বিবেচনা করিয়া তিনি তথায় একটি বাড়ী ভাড়া লইলেন। শুভাকাঙ্ক্ষী সহচর ব্রাহ্মণ মতিলাল মুখোপাধ্যায় ও বিশ্বস্ত ভৃত্য গঙ্গানারায়ণকে অভিভাবক স্বরূপ

এবং পরিচর্য্যা করিবার জন্য তথায় রাখিয়া দিলেন। দুই এক বৎসর পরে সংসারের তাড়নায় মতিলালকে কলিকাতা ত্যাগ করিতে হয়; ইহার কিছুকাল পরে গঙ্গানারায়ণের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে; সুতরাং তাহাকেও বাধ্য হইয়া কলিকাতা ছাড়িতে হয়। কলিকাতায় অবস্থান-কালে তাহারা উভয়ে কোন দিন নিজকর্ত্তব্য পালন করিতে ত্রুটী করে নাই। তাহাদের পরিচর্য্যাগুণে রামেন্দ্রসুন্দরকে কোন দিন বিদেশে কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। তাহারা চলিয়া আসিলে নিত্য নূতন লোকের হাতে পড়িয়া তাঁহাকে অনেক প্রকার অসুবিধায় পড়িতে হয়।

কলিকাতায় গিয়া রামেন্দ্রসুন্দর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দেখা করিবার জন্য পিতৃব্যের নিকট অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। উপেন্দ্রসুন্দর ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ২৩শে মাঘ সেই নরদেবতাকে দর্শন করিবার জন্য বিদ্যাসাগর-ভবন-তীর্থে গমন করেন। সেকালে মফঃস্বলের লোকে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মনুষ্যরূপী দেবতা বলিয়া মনে করিত। পূর্ব্ব হইতে উপেন্দ্রসুন্দরের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিচয় ছিল। তিনি উপেন্দ্রসুন্দরের মুখে তাঁহার কিশোর বয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্রের গুণপণার পরিচয় পাইলেন; কান্দি স্কুল হইতে ঐ ছাত্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম স্থান পাইয়াছে জানিয়া বড়ই সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। কান্দি স্কুলের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনিই কান্দির (পাইক-পাড়ার) রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুরকে কান্দিতে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাঁহারই উৎসাহ এবং পরামর্শক্রমে রাজগণ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কান্দিতে একটি আংলো-সংস্কৃত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত করিবার ভার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপরেই ন্যস্ত ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সময়ে সময়ে কান্দিতে গিয়া ছাত্রদের পরীক্ষা করিতেন, এবং

বিদ্যালয় পরিচালনার সম্বন্ধে শিক্ষকদিগকে সদুপদেশ দান করিতেন। সেই কান্দির স্কুল প্রথম স্থান পাইয়াছে জানিলে তাঁহার মনে আনন্দের উদয় হইবারই কথা। গোবিন্দসুন্দর ও উপেন্দ্রসুন্দর যৎকালে কান্দি স্কুলের ছাত্র ছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন কান্দিতে আসিয়া তাঁহাদের পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন এবং সময়ে সময়ে ভ্রমণের ছলে জেমোর নূতন বাড়ীতে গিয়া কৃষ্ণসুন্দর ও ব্রজসুন্দরের সহিত সদালাপ করিয়া আসিতেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় রামেন্দ্রসুন্দরের কৃতিত্বে আহ্লাদিত হইয়া প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেই মহাপুরুষের পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া রামেন্দ্রসুন্দর কলেজে বিদ্যাভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সেকালের মফঃস্বলের কোন স্কুল প্রথম স্থান অধিকার করিলে, উহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইত, এবং শিক্ষিত ব্যক্তিগণের চিত্ত সেই দিকে আকৃষ্ট হইত। রামেন্দ্রসুন্দরকে দেখিবার জন্য তদানীন্তন হিন্দু-স্কুলের হেড মাষ্টার ভোলানাথ পাল মহাশয়ের মনে কৌতুহলের উদ্রেক হয়, তিনি রামেন্দ্রসুন্দরকে হিন্দু-স্কুলে আহ্বান করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করেন এবং নানাপ্রকার সদুপদেশপূর্ণ উৎসাহ দান করিয়া তাঁহার বিদ্যানুরাগ বর্দ্ধন করেন। পরবর্ত্তীকালে কোন সময়ে ভোলানাথ পাল মহাশয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে রামেন্দ্রসুন্দর গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সেই উপদেশের কথা প্রকাশ করিয়া বলিতেন।

ভ্রাতুষ্পুত্রকে কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া উপেন্দ্রসুন্দর বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন; কিন্তু তাঁহাকে ছাড়িয়া বাড়ীতে বাস করা পিতৃব্যের পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল। তিনি সময়ে সময়ে কলিকাতা গিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট কিছুদিন কাটাইয়া আসিতে লাগিলেন। তৎকালে জেমোকান্দি হইতে কলিকাতা যাইতে হইলে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলের লুপ লাইনের সাঁইথিয়া ষ্টেসনে

গাড়ী ধরিতে হইত। সাঁইথিয়া জেমোকান্দি হইতে ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত; পাকা পথ ছিল না; সুতরাং যাতায়াত কিরূপ কষ্টকর ছিল, ভুক্তভোগী মাত্রেই তাহা অনুভব করিতে পারেন। স্নেহের অনুরোধে ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া উপেন্দ্রসুন্দর সেই পথ-কষ্ট ভোগ করিতে ক্ষান্ত ছিলেন না।

নৃসিংহপ্রসাদ ত্রিবেদী ঐ সময়ে কলিকাতায় অবস্থান করিয়া মেডিকাল কলেজে পড়িতেন। উপেন্দ্রসুন্দর তাঁহাকে আনিয়া রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গীরূপে এক বাড়ীতে রাখিয়া দিলেন। একই বাড়ীতে বাস করিয়া রামেন্দ্রসুন্দর ও নৃসিংহপ্রসাদ উভয়ে কলেজে বিদ্যাভাস করিতে লাগিলেন। নৃসিংহপ্রসাদ যথাসময়ে মেডিকাল কলেজ হইতে এল্, এম্, এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি দেশে বসিয়া কিছু দিন স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় করেন, পরে রাজপরিবারের গৃহচিকিৎসকরূপে লালগোলায় দীর্ঘকাল অতিবাহন করেন, পরিশেষে ঐ পদ ত্যাগ করিয়া আবার কিছু দিন বাড়ীতে বসিয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসা করেন। গত ১৩২৮ সালের বৈশাখের প্রারম্ভে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি জ্ঞানবৃদ্ধির আশায় শিক্ষার্থীর ন্যায় নূতন নূতন পুস্তক পাঠ করিতেন। তিনি সুচিকিৎসক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করিয়া রামেন্দ্রসুন্দরের অধ্যয়নস্পৃহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে; তিনি ঐ সময় ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি অতিমাত্র আকৃষ্ট হইয়া পড়েন, এবং সাহিত্য ও ইতিহাস সংক্রান্ত বহুবিধ গ্রন্থ পাঠে অধিক সময় যাপন করিতেন; সেই জন্য তিনি পাঠ্য পুস্তক অধ্যয়ন করিতে অধিক সময় দিতে পারিতেন না বলিয়া ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই; তাঁহাকে দ্বিতীয় স্থানে নামিতে হয়। ঐ পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয়

স্থান পাইয়া মাসিক ২৫৲ বৃত্তি ও আনুষঙ্গিক গোয়ালিয়ার সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হন।

বি, এ পড়িবার সময় বিজ্ঞান শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবৃত্তি জন্মে। তিনি ঐ সময়ে ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাস পড়া একরূপ ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে রত হন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার কালে তিনি পিতৃতুল্য স্নেহপরায়ণ পিতৃব্যকে হারাইয়া বড় কাতর ও অবসন্ন হইয়া পড়েন ; সেই কারণে বি, এ পরীক্ষাতে-ও তেমন যত্ন করিয়া পড়িতে পারেন নাই। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাস্ত্রে অনারে প্রথম স্থান লাভ করিয়া তিনি মাসিক ৪০৲ ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন।

বি, এ পড়িবার সময় রামেন্দ্রসুন্দরের বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্য চর্চ্চা করিবার প্রবৃত্তির উন্মেষ হয়। তিনি 'নবজীবন' মাসিক পত্রিকায় নাম গোপন করিয়া দুই একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১২৯১ সালের পৌষমাসে প্রকাশিত 'নবজীবনের' ৬ষ্ঠ সংখ্যায় তাঁহার লিখিত 'মহাশক্তি' নামক প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয়।

পর বৎসর পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রে এম্, এ, পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হন। রসায়নের অধ্যাপক পেড্লার সাহেব তাঁহার লিখিত একটি class exerciseএ সন্তুষ্ট হন, এবং তখন হইতেই প্রেমচাঁদ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে উৎসাহিত করেন। বি, এ পরীক্ষায় পেড্লার সাহেব রসায়নের পরীক্ষক ছিলেন ; তিনি ঐ পরীক্ষায় রামেন্দ্র-সুন্দরের answer paper (উত্তর পত্র) দর্শন করিয়া সেই দিন আপনার অভিমত ক্লাসের সম্মুখে ব্যক্ত করেন,—"আমি এ পর্য্যন্ত যত রসায়নের কাগজ দেখিয়াছি তন্মধ্যে এইখানি "out of the way the best"—কিঞ্চিৎ থামিয়া একটু দৃঢ়তার সহিত আবার তিনি বলিয়াছিলেন "out of the way

the best.” তাঁহার ঐ বাক্যে রামেন্দ্রসুন্দরের মনে প্রবল উৎসাহের সঞ্চার হয়; তিনি মনে মনে প্রেমচাঁদ পরীক্ষা দিবার সঙ্কল্প স্থির করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এম্, এ, পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিষয়ে (Natural & Physical Science) তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আনুষঙ্গিক সুবর্ণ পদক ও এক শত টাকা মূল্যের পুস্তক পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ঐ পরীক্ষায় প্যারীলাল হালদার, সুরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং কালিদাস মল্লিক প্রভৃতি প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ তাঁহার সহপাঠী ছিলেন।

প্রেমচাঁদ পড়িবার প্রাক্কালে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু প্রভৃতি কয়েক জন অসাধারণ প্রতিভাশালী পরীক্ষার্থী রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে পরীক্ষা ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন জানিয়া রামেন্দ্রসুন্দর প্রথমতঃ অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হন। তাহার ফলে তাঁহার শিরোরোগের প্রথম সূত্রপাত হয়; রোগ অল্প দিনের মধ্যেই অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়; তিনি রোগের যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পড়েন। চিকিৎসকদিগের পরামর্শে তাঁহাকে ঐ সময়ে সকল প্রকার অধ্যয়ন, চিন্তা এবং পরিশ্রম এক কালে ত্যাগ করিতে হয়; পরীক্ষার বিষয়ে তিনি হতাশ হইয়া পড়েন; তিন চারিমাস কাল বিশ্রাম ভোগের পর আরোগ্য লাভ করেন। কিন্তু ইচ্ছামত পরিশ্রম করিতে তিনি কোন দিনই সাহস করেন নাই; পরীক্ষার সময় সকল প্রশ্নের উত্তরও লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার মত সামর্থ্য তাঁহার ছিল না, সেই কারণে কৃতকার্য্য হইবার আশা একবারেই পরিত্যাগ করেন। তিনি পরীক্ষকদিগের সহিত দেখা করিলে তাঁহারা বলিয়াছিলেন—“সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিলেও হতাশ হইবার আশঙ্কা করিও না।” তিনি উহা প্রবোধ বাক্য বলিয়া মনে করেন। ঐ বৎসর তিনি পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন বলিয়া তাঁহার পরিজনবর্গ কেহই আশা করিতে পারেন নাই।

এম, এ, পরীক্ষা দিবার পরবৎসর ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রামেন্দ্রসুন্দর পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া প্রেমচাঁদ ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বৃত্তির পরিমাণ ৮০০০ আট হাজার টাকা। ঐ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দুইজন ছাত্র প্রেমচাঁদ বৃত্তি পাইয়াছিলেন, একজন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অপর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু, অধুনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-নিয়ামক (Controller of Examination)। দুই জন ছাত্র পরীক্ষায় সমান হইয়াছেন দেখিয়া পরীক্ষদিগের মধ্যে একটা বিতণ্ডা উপস্থিত হয়; তৎসম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের মীমাংসার বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত ১৮৮৮—৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মিনিট পুস্তকের ১৮২-৮৩ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

"208. Read the following report of the examiners for the Premchand Roychand Studentship Examination.

The examiners for the Premchand Roychand Studentship Examinations read the papers of four candidates, two of whom appear to be equally deserving. The first Abinas Chandra Bose took up Pure and Mixed Mathematics and the second Ramendra Sunder Trivedi Chemistry & Physics. They obtained practically the same number of marks, and the examiners find it impossible to decide between the two candidates more especially as they took up different subjects and had no papers in common. The papers submitted by two candidates were of a very high order of merit. The candidate who took up Mathematics showed much

skill and originality in the solution of his problems both in Pure and Mixed Mathematics. The candidate who took up Chemistry and Physics appears to be about the best student who has yet taken up these subjects for the examination and on this account deserves recognition. As there was no studentship awarded in 1883, and there is in consequence a large balance in this fund, we would strongly recommend to the Syndicate that two scholarships should be awarded this year, viz, to Abinas Chandra Bose and Ramendra Sunder Trivedi. If the Syndicate should be unable to accept this suggestion, we would then recommend that the Studentship should be divided equally between the two candidates.

The 27th November, 1888. (Sd.) John Eliot,
Examiner in Physics.

(Sd.) Alexander Pedler,
Examiner in Chemistry.

(Sd.) W. Booth,
Examiner in Applied Mathematics.

(Sd.) C. Little.
Examiner in Pure Mathematics.

Resolved—

That two studentships be awarded as recommended by the examiners.

অর্থাৎ সিণ্ডিকেটে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পরীক্ষকগণের নিম্নোদ্ধৃত অভিমত পঠিত হইল,—

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পরীক্ষকগণ চারিজন পরীক্ষার্থীর প্রশ্নোত্তর পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুইজন সমগুণসম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়। প্রথম অবিনাশচন্দ্র বসু বিশুদ্ধ ও মিশ্র গণিত লইয়াছেন, এবং দ্বিতীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন লইয়াছেন। কার্য্যতঃ তাঁহারা সমপরিমাণ সংখ্যা লাভের অধিকারী হইয়াছেন। দুইজনের মধ্যে কেহই একটি সাধারণ বিষয় না লইয়া স্বতন্ত্র বিষয় লইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে কোন একজন পরীক্ষার্থীর প্রকৃষ্টতা নির্ণয় পরীক্ষকগণ অসম্ভব বোধ করিয়াছেন। উভয় পরীক্ষার্থীর প্রশ্নোত্তর অতি উচ্চ অঙ্গের গুণপণার পরিচয় দিয়াছে। গণিতশাস্ত্রের পরীক্ষার্থী শুদ্ধ এবং মিশ্র গণিতের সমস্যাগুলির সমাধান করিতে বিশেষ কৌশল ও মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। যে পরীক্ষার্থী পদার্থবিদ্যা এবং রসায়ন লইয়াছেন, তিনি ঐ পরীক্ষায় এ কাল পর্য্যন্ত যতগুলি ছাত্র ঐ বিষয়ে পরীক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া বোধ হইয়াছে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কোন ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হয় নাই, সেই হেতু এই কোষে অনেক অর্থ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। পরীক্ষকগণ সিণ্ডিকেটকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতে পারেন, যে প্রত্যেককে একটি করিয়া বৃত্তি দেওয়া হউক। যদি সিণ্ডিকেট এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সমর্থ না হয়েন, তাঁহারা তাহা হইলে একটি বৃত্তি সমান অংশে বিভাগ করিয়া উভয়কে দিবার জন্য অনুরোধ করেন।

(স্বাক্ষর) জন ইলিয়ট,

পদার্থবিদ্যার পরীক্ষক।

" আলেকজান্দার পেড্‌লার,

রসায়নের পরীক্ষক।

২৭এ নবেম্বর ১৮৮৮

" ডব্লিউ বুথ,

মিশ্র গণিতের পরীক্ষক।

" সি লিটল,

বিশুদ্ধ গণিতের পরীক্ষক।

পরীক্ষকদিগের অনুরোধ অনুসারে দুইটি বৃত্তি দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইল।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ১লা ডিসেম্বর দিবসে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের উক্ত অধিবেশনে মাননীয় স্যার এ, ক্রফ্‌ট সাহেব সভাপতি ছিলেন এবং সভ্যরূপে মাননীয় বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আলেকজান্দার পেড্‌লার, রেভারেণ্ড কে, এম, ম্যাকডোলাণ্ড, মাননীয় বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষ, কে, ম্যাকলাউড্‌ এবং বাবু সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়গণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগের নির্দ্দেশক্রমে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের এবং ঐ বৎসরের দুইটি বৃত্তি দুইজনকে দেওয়া হইয়াছিল।

রামেন্দ্রসুন্দর যথাসময়ে প্রেমচাঁদ বৃত্তি লাভের সংবাদ পাইয়া কলিকাতা হইতে তারযোগে তাঁহার শ্বশুর নরেন্দ্রনারায়ণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন। তৎকালে জেমোকান্দিতে টেলিগ্রাফ আফিস ছিল না, সাঁইথিয়া হইতে ডাকযোগে টেলিগ্রাম প্রেরিত হইত। অপরাহ্ণ তিনটার সময় সংবাদ নরেন্দ্রনারায়ণের নিকট পৌঁছিল। তখন পল্লীর মধ্যে ইংরাজী জানা লোক কেহ উপস্থিত ছিলেন না। নরেন্দ্রনারায়ণের কর্ম্মচারিগণের মধ্যে একজন ইংরাজী জানিতেন বলিয়া অনেক বিশ্বাস করিত। নরেন্দ্রনারায়ণ তাঁহাকে টেলিগ্রামখানি পড়িতে বলিলেন। তিনি পড়িয়া বলিলেন— "দুইটি বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে, একটি অবিনাশকে ও অন্যটি অপরকে।" উহা শ্রবণ করিয়া নরেন্দ্রনারায়ণ বুঝিলেন, রামেন্দ্রসুন্দর বৃত্তি পান নাই। তিনি বিমর্ষ চিত্তে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়াছিলেন—"এবার

রোগ ভোগ করিতেই গেল, আগামী বারের জন্য আশা করিতে পারি।” ঐ অশুভ সমাচার তাঁহার পরিজনবর্গের মধ্যে অচিরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, এবং নূতনবাড়ীতে রামেন্দ্রসুন্দরের পিতামহী ও মাতাদিগের নিকট পৌঁছিল। বলা বাহুল্য ঐ সংবাদ পাইয়া সকলে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। স্কুলের ছুটি হইলে আমার পিতৃদেব বসন্তলাল বাজপেয়ী বাড়ী ফিরিয়া অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় বাজবাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, নরেন্দ্রনারায়ণ দুঃখের সহিত জামাতার সংবাদ তাঁহাকে বলিলেন। তিনি ঐ কথা শুনিয়া রামেন্দ্রসুন্দরের চিঠিখানি দেখিতে চাহিলেন; নরেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন—“চিঠি নহে টেলিগ্রাম আসিয়াছে।” টেলিগ্রামের কথা শুনিয়া আমার পিতৃদেবের মনে আশার সঞ্চার হইল, তিনি বলিলেন—“অকৃতকার্য্য হইলে রামেন্দ্র কখন টেলিগ্রাম করিত না, অশুভ সংবাদ পত্রযোগে একদিন বিলম্বে পৌঁছিলেও ক্ষতি ছিল না।” টেলিগ্রামখানি পাঠ করিয়া তিনি প্রফুল্লবদনে বলিয়া উঠিলেন—“রামেন্দ্রের মত ছেলে কখনও অকৃতকার্য্য হয় না।” টেলিগ্রামখানির অর্থ কে বুঝাইয়া দিয়াছিল তাহা তিনি জানিতে চাহিলে, নরেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার নাম উল্লেখ করিলেন না; পরে সেই ভদ্রলোকটির নাম তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। বসন্তলাল টেলিগ্রামখানি পাঠ করিলেন, তাহাতে লেখা ছিল,—“Two scholarships awarded, myself one, Abinas the other”. তিনি উহার অনুবাদ করিয়া বলিলেন—“দুইটি বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে, একটি আমাকে, অন্যটি অবিনাশকে।” বলা বাহুল্য পূর্ব্ব পাঠক myself কথাটির অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। পরক্ষণে আমার পিতৃদেব নূতনবাড়ীতে গিয়া সেই আনন্দের সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। আমরা সকল বালক বালিকাগণ তথায় উপস্থিত ছিলাম। সেই দিনেই পরম আনন্দ ও উৎসাহের সহিত কর্ত্তৃপক্ষগণ গৃহদেবতাগণের বিশেষ ভোগের আয়োজন করেন;

রামেন্দ্রসুন্দর (যৌবনে)

৫৪ পৃষ্ঠা
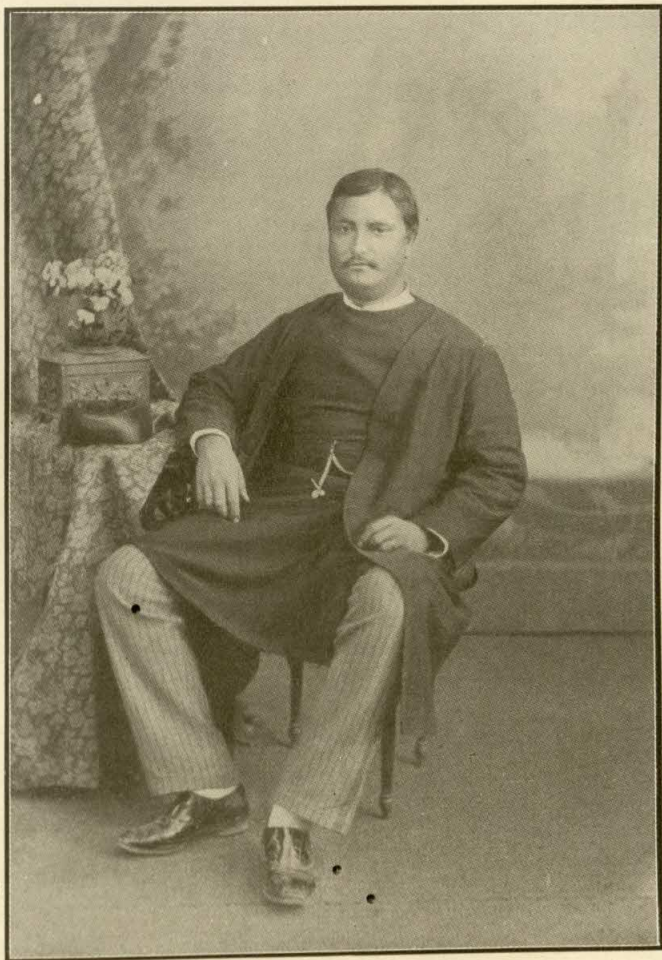
বলা বাহুল্য আমরা প্রসাদ পাইয়া পরিতুষ্ট হইয়াছিলাম। সেই দিনের সেই সুখ-স্মৃতির কথা অদ্যাপি আমাদের বেশ মনে পড়ে। যতদিন জীবিত রহিব ভুলিব না। হায় রে সেই দিন! আর আজ এই দিন! তখন হৃদয়ে কত উৎসাহ, আনন্দ ও আশা লইয়া পরিজনবর্গ উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। আর আজ! আজ আমরা সেই আনন্দের বস্তুকে হারাইয়া আশাহীন, উৎসাহহীন হৃদয়ে মর্ম্মন্তুদ শোকভার বহন করিতেছি। সুখের বিষয় এই দুঃখের দিনে সাক্ষী হইতে তিনকড়ি দেবী, চন্দ্রকামিনী দেবী, বগলা দেবী, নরেন্দ্রনারায়ণ বা বসন্তলাল কেহই জীবিত নাই।

প্রেমচাঁদ বৃত্তি লাভ করিবার পর রামেন্দ্রসুন্দর দুই বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজের যন্ত্রাগারে বিনা বেতনে বিজ্ঞান চর্চ্চা করিবার জন্য পেড্‌লার সাহেবের অনুমতি পাইয়াছিলেন। ঐ সময় জীববিদ্যার অনুশীলনে তাঁহার প্রবল আগ্রহ দেখিতে পাইতাম। জীবদেহের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিবার জন্য তিনি নানাপ্রকার প্রজাপতি, শুয়াপোকা ও গুটিপোকা প্রভৃতি সংগ্রহ করিতেন, এবং উপযুক্ত আহার্য্য দিয়া তাহাদিগকে সচ্ছিদ্র বিভিন্ন কৌটায় আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। প্রতিদিন কৌটা খুলিয়া তিনি তাহাদের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেন। গুটিপোকা, শুয়াপোকা প্রভৃতি জীবগণ কিরূপে তাহাদের দেহকে আবরণীর মধ্যে বেষ্টন করিয়া পরিশেষে নির্ম্মোক-মুক্ত হইয়া সুন্দর প্রজাপতিতে পরিণত হয়, এবং ঐ প্রজাপতিসকল তাহাদের বংশধারা রক্ষা করিবার জন্য কিরূপে অণ্ড প্রসব করিয়া জীবলীলা সংবরণ করে, সেই বিষয়গুলি বিশেষ মনোযোগের সহিত তিনি লক্ষ্য করিতেন, এবং সঙ্গীদিগকে উহা দেখাইয়া আনন্দ অনুভব করিতেন।

সাধারণ পাঠ শেষ করিয়া রামেন্দ্রসুন্দর আইনের লেকচর সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। আত্মীয়স্বজনের পরামর্শক্রমে তিনি প্রথমতঃ অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ঐ বিদ্যার প্রতি আসক্তি

তাঁহার একবারেই ছিল না। তিনি পরের অনুরোধে ঘরে বসিয়া কিছুদিন আইনের পুস্তক পড়িয়াছিলেন বটে, শেষে কিন্তু উহা একবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; সুতরাং আইনে পরীক্ষা দেওয়া আর ঘটিয়া উঠে নাই। তাঁহার শ্বশুর নরেন্দ্রনারায়ণ বড় জমিদার ছিলেন; তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল, জামাতা আইন শিক্ষা করিয়া হাইকোর্টে প্রবেশ করেন। সেকালে সকলেই মনে করিত, হাইকোর্টের জজ হইতে পারিলেই বাঙ্গালী জীবনের চরম সার্থকতা সম্পন্ন হয়। সেকালে একালের মত চাকরীজীবী বাঙ্গালী, অণ্ডার সেক্রেটরী অব ষ্টেট্, গবর্ণর, অথবা মন্ত্রীর পদ লাভ করিবার কল্পনাও মনে আনিতে পারিত না। আইনের কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে রামেন্দ্র-সুন্দর বলিতেন—"উহা আমার ভাল লাগে না।" আইনের পুস্তকগুলি শেষে তাঁহার পুস্তকাগারে আলমারির শোভা বর্দ্ধন করিত মাত্র। আমরা বলিতে পারি, আইন শিক্ষা করিয়া ব্যবহারজীবীর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অন্যান্য বিদ্যা চর্চ্চার অবসর কম হইবে, তাহাতে জ্ঞানবৃদ্ধির পথে অন্তরায় ঘটিতে পারে, এই ভাবিয়া ঐ বিষয়ে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই।

কলেজে পড়িবার সময় রামেন্দ্রসুন্দর যতগুলি বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে পাঁচজনের সহিত বন্ধুতা আজীবন সমভাবে বিদ্যমান ছিল। রিপন কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হাইকোর্টের এটর্নি প্যারীচরণ হালদার মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত কালিদাস মল্লিক বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ও শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু রায় বাহাদুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ট্রোলার অব একজামিনেশন পদে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

বি, এ, পরীক্ষা দিয়া রামেন্দ্রসুন্দর প্রথমে সন্তানের মুখ নিরীক্ষণ করেন। ১২৯২ সালে ফাল্গুন মাসে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা চঞ্চলা দেবী

ভূমিষ্ঠা হয়েন। তাঁহার জননী ইন্দুপ্রভা দেবী পর পর চারিটি সন্তান প্রসব করেন—দুই পুত্র ও দুই কন্যা। রামেন্দ্রসুন্দর অন্তিম কালে মাত্র জ্যেষ্ঠা কন্যাটিকে রাখিয়া গিয়াছেন। প্রেমচাঁদ পরীক্ষা দিবার পরবৎসর অর্থাৎ ১২৯৬ সালে কার্ত্তিক মাসে তাঁহার একটি পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল; এক বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে সন্তানটি মাতাপিতার স্নেহময় অঙ্ক শূন্য করিয়া চলিয়া যায়। পরবৎসর আশ্বিন মাসে দ্বিতীয়া কন্যা গিরিজা দেবী জন্মগ্রহণ করেন, তাহার পর দীর্ঘকাল কোন সন্তানাদি হয় নাই, তাহার কথা পরে বলিতেছি।

যৌবনের প্রারম্ভে রামেন্দ্রসুন্দরের চরিত্রে দৃঢ়তা দেখিয়া সকলেই তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিত। মফঃস্বলের যুবক, কলিকাতা সহরে গিয়া তথাকার হাবভাব বা বিলাসিতার স্রোতে পড়িয়া কখনও আত্মহারা হন নাই। কোন প্রকার প্রলোভনের বস্তু তাঁহার চিত্তবৃত্তিকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। অধুনা অভিভাবকহীন ছাত্রের দল কলিকাতার থিয়েটার ও বায়স্কোপ কোম্পানীর অর্থাগমের পথ সুগম করিয়া রাখিয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দরের কোন প্রকার আমোদপ্রমোদে যোগ দিয়া অর্থ ও সময় নষ্ট করিবার অবসর বা প্রবৃত্তি একেবারেই ছিল না। পিতৃব্যের মৃত্যুর পর তাঁহাকে দেখিবার কেহ ছিল না; তিনি অভিভাবকহীন হইয়া ও স্বাধীনভাবে একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় বাণীর মন্দিরে আরাধনায় রত ছিলেন, এবং সরস্বতীর বরপুত্ররূপে তাঁহার দুর্ল্ভ প্রসাদ লাভের অধিকারী হইয়াছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

গার্হস্থ্য জীবন

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দুই বৎসর কাল রামেন্দ্র সুন্দর বাড়ীতে বসিয়া কাটাইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনারায়ণ যে আশঙ্কা করিয়া উপেন্দ্রসুন্দরকে সপরিবারে কলিকাতায় বাস করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, দুই বৎসর পাঁচ মাস পরেই বিধাতার অলঙ্ঘনীয় কঠোর বিধানে তাহাই ঘটিল। উপেন্দ্রসুন্দর দেহত্যাগ করিলে বিষয়কর্ম্ম পরিচালনার ভার কর্ম্মচারিগণের হস্তে পড়িল। আদায়কারী গোমস্তাগণের কার্য্যের হিসাবনিকাশ বা সেরেস্তার কাগজ-পত্র ইত্যাদির ভালরূপ ব্যবস্থা ছিল না, অথচ ঐ সকল কাগজ-পত্রের উপর জমিদার দিগের সকল কার্য্য নির্ভর করে। আদায়কারী কর্ম্মচারিগণের কর্ম্মে শৈথিল্যবশতঃ আয়ের পরিমাণ অনেক কমিয়া যায়। মোটের উপর চতুর্দ্দিকে বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটে। লেখাপড়া শেষ করিয়া রামেন্দ্র-সুন্দর বিষয়কর্ম্মের শৃঙ্খলা বিধানে মনোযোগ প্রদান করেন, তাহাতে অনেকটা সুবিধাও ঘটে। এতদিন ধরিয়া ব্রজসুন্দর ত্রিবেদীর নামে যে উইল ছিল, তাহার প্রোবেট লইবার আবশ্যক হয় নাই বলিয়া প্রোবেট লওয়া হয় নাই। রামেন্দ্রসুন্দর ঐ সময়ে (১২৯৪ সালে) উইল সৃষ্টির বিশ বৎসর পরে প্রোবেট লইয়া উইলের নির্দ্দেশমত কিঞ্চিৎ ভূ সম্পত্তি খুল্লপিতামহী তিনকড়ি দেবীকে প্রদান করেন।

রামেন্দ্রসুন্দর কর্ম্ম-জীবনে সপরিবারে কলিকাতায় বাস করিতে আরম্ভ করিলে বিষয়ের অবস্থা পুনরায় পূর্ব্বের মত শোচনীয় হইয়া পড়ে। কর্ম্ম-

জীবনে প্রবেশ করিবার পর তিনি আর কখন বৈষয়িক বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার অবসর পান নাই, সেদিকে তাঁহার দৃষ্টিও ছিল না।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য রামেন্দ্রসুন্দরকে ভূগোলের পরীক্ষক নির্ব্বাচিত করেন ; কারণ বিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক ভূগোল তৎকালে ভূগোল বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐ বৎসর পরীক্ষার সময় রামেন্দ্রসুন্দর কলিকাতায় গিয়া একমাস কাল অবস্থান-পূর্ব্বক পরীক্ষাকার্য্য শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসেন। পর বৎসর তিনি পুনরায় পরীক্ষক নিযুক্ত হন, সেবারেও ঐরূপ কলিকাতায় গিয়া পরীক্ষাকার্য্য করিয়া আসেন।

ঐ সময়ে দক্ষিণাপথের মহীশূর প্রদেশে বাঙ্গালোর কলেজের অধ্যক্ষ ও তথাকার মান-মন্দিরের তত্ত্বাবধায়কের পদ খালি হয়। একজন ইংরাজ ঐ পদে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি দীর্ঘকালের জন্য ছুটি লইয়া একরূপ কার্য্য ত্যাগ করিয়াই স্বদেশে চলিয়া যান। কর্তৃপক্ষগণ তদানীন্তন কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অধ্যাপকদিগকে ঐ কার্য্যের জন্য একজন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত নির্ব্বাচন করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। পেড্‌লার সাহেব তাঁহার প্রিয় ছাত্র রামেন্দ্রসুন্দরকে ঐ পদের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে উহা গ্রহণ করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। রামেন্দ্র-সুন্দর প্রথম দিন তাঁহার কথার উত্তর দিতে পারেন নাই ; পরদিন তিনি বলিলেন—"সাহেব অত দূর দেশে গিয়া আমি চাকরী করিতে পারিব না, আমার আত্মীয়স্বজন কেহই ঐরূপ প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না।" সাহেব ঐ কথা শুনিয়াও শুনিলেন না, তিনি আগ্রহের সহিত তৎক্ষণাৎ রেলওয়ে টাইম টেবল, ভারতীয় রেলওয়ের মানচিত্র প্রভৃতি আনিয়া টেবিলের উপর বিস্তৃত করিয়া, তাঁহাকে সময়, ভাড়া ও পথের বিষয় বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন—"বাঙ্গালোর সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে তিন হাজার পদ উচ্চে অবস্থিত,—নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশ, জল-

বায়ু কলিকাতা অপেক্ষা অনেক ভাল। রেলওয়ের দ্বারা যুক্ত স্থানের দূরতার কথা ভাবিয়া ভয় পাইতেছ কেন? মহীশূর তোমারই দেশ ত?” রামেন্দ্রসুন্দর সাহেবের ঐ কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—“সাহেব, আপনারা সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আমাদের দেশে আসিয়াছেন, বঙ্গদেশ ও মহীশূরের দূরতা কি আপনাদের চোখে পড়ে? আমার আত্মীয়স্বজন আমাকে দূর দেশে পাঠাইতে সম্মত হইবেন না, তাঁহাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোন কার্য্যই করিতে পারিব না।” বলা বাহুল্য সহেব ঐরূপ উত্তর পাইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।

রামেন্দ্রসুন্দর কলিকাতাকেই কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়া তথায় জীবন যাপন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কলিকাতা ছাড়িয়া অন্যত্র বাস করিবার বাসনা তাঁহার একবারেই ছিল না। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকের পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ঘটিলে, তিনি কর্ত্তৃপক্ষগণকে বলিয়াছিলেন, যদি তাঁহাকে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে স্থায়িভাবে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে তিনি ঐ পদ গ্রহণ করিতে পারিবেন; কিন্তু স্থানান্তরিত করিতে গেলে তাঁহার ঐ পদ গ্রহণ করিবার সুবিধা হইবে না। কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হন নাই, সুতরাং প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকের পদ তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ ভগ্ন দেহে দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিয়া ১২৯৮ সালের ভাদ্রমাসে তাঁহার পরিজনবর্গকে শোকসাগরে ভাসাইয়া চির-শান্তি লাভ করেন। তাঁহার পুত্রগণ সকলে এক মাতার সন্তান ছিলেন না; সেই কারণে তাঁহার পুত্রগণকে সম্পত্তির ব্যাপার বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। রামেন্দ্রসুন্দর প্রতিবেশী কয়েকজন ভদ্রলোকের সাহায্যে ঐ কার্য্য সম্পাদন করেন। নরেন্দ্রনারায়ণের পরলোক গমনের পর তাঁহার দুই মাতা বিমলাসুন্দরী ও

নরেন্দ্রনারায়ণ

৬০পৃষ্ঠা
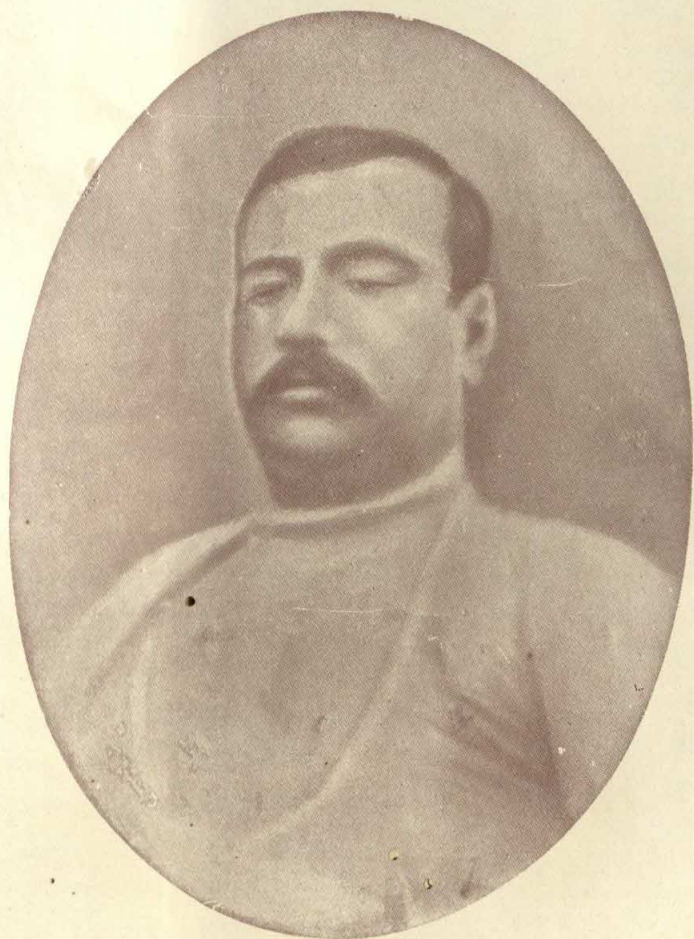
বামাসুন্দরী দেবী তাঁহাদের পৌত্রগণ ও রামেন্দ্রসুন্দরের ব্যবস্থাক্রমে কাশীবাসিনী হন। বিষয়কর্ম্ম বুঝিয়া লইয়া ছয়মাস কাল রাজবাড়ীর কর্ম্ম পরিচালনা করার পর রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার শ্বশুরের দুই পত্নীর দুই পুত্র শরদিন্দু নারায়ণ ও দ্বিজেন্দ্র নারায়ণকে তাঁহাদের বিষয়কর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাদের কর্ম্মভার তাঁহাদের উপর অর্পণ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া যান। সেবারেও তিনি যথারীতি পরীক্ষা কার্য্যের জন্য প্রায় দুইমাস কলিকাতায় অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে রিপন কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অমৃতচন্দ্র ঘোষ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে রিপন কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সেইবার রিপন কলেজে বি, এ, পরীক্ষার বি, কোর্স খুলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। রামেন্দ্রসুন্দর অমৃতচন্দ্রের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। যে রামেন্দ্রসুন্দর ইতো-পূর্ব্বে পেড্‌লার সাহেবের প্রস্তাবক্রমে মহীশূরে মোটা বেতনে কর্ম্ম গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে বিনা বাক্যব্যয়ে স্বল্প বেতনে রিপন কলেজে প্রবেশ করিতে সম্মত হইলেন কেন, স্বভাবতঃই অনেকের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে। তাহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি, প্রথমতঃ কলিকাতা ছাড়িয়া অন্যত্র বাস করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না, দ্বিতীয়তঃ অর্থোপার্জ্জনের দিকেও তাঁহার তাদৃশ মনোযোগ ছিল না; নতুবা তাঁহার ন্যায় কৃতী পুরুষ জীবনে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইতেন। রামেন্দ্রসুন্দর মহীশূরে বাস করিয়া তথাকার রাজ-সংসারে প্রবেশ লাভ করিলে স্বীয় প্রতিভাবলে একটি উচ্চ রাজপদ অধিকার করিয়া প্রভূত ধনসঞ্চয় করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি ভবিষ্যতের প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মনের উদ্দেশ্য ছিল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া তদ্দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের ও স্বজাতির যথাসাধ্য সেবা

করিয়া জীবন শেষ করেন। বাঙ্গালী-সম্পর্ক-বিরহিত সুদূর মহীশূর প্রদেশে বাস করিলে তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইত না। যে ব্যক্তি স্বদেশের এবং স্বজাতির সেবা করিবার জন্য স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন, "সেই ধন্য নরকুলে"। রামেন্দ্রসুন্দর নরকুলে ধন্য হইলেন।

রিপন কলেজের কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ৪ঠা আষাঢ় রামেন্দ্রসুন্দর জেমো হইতে কলিকাতায় গিয়া অখিল মিস্ত্রীর গলিতে বাড়ী ভাড়া লইয়া তথায় বাস করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর দুর্গাদাস ত্রিবেদী তৎকালে কান্দির ইংরাজী স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন; তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রামেন্দ্রসুন্দর কলিকাতায় যান, এবং তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক ভোলানাথ পাল মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ভ্রাতাকে হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। ঐ বৎসর দুর্গাদাস ত্রিবেদী হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ, জেনারল এসেম্ব্লিস্ ইন্‌ষ্টিটিউসন এবং রিপন কলেজে কিয়ৎকাল অধ্যয়ন করেন। পরে বিষয়কর্ম্মের দিকে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া বাড়ীতে গিয়া নিজের বিষয়কর্ম্ম পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হন। বিষয়কর্ম্মের শৃঙ্খলাবিধান করিতে তাঁহাকে অনেক ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে হয়। তিনি প্রতিযোগী জমিদারদিগের সহিত বহুবার বহুবিধ মামলা মোকদ্দমা করিয়া অনেক লুপ্ত সম্পত্তির উদ্ধার সাধন করেন। প্রজাগণের নিকট হইতে প্রাপ্য খাজানা যথারীতি আদায় করিবার জন্য তিনি কর্ম্মচারিগণের প্রতি একটু কঠোর ভাব প্রকাশ করিয়া অর্থের অস্বচ্ছলতা অনেকটা দূর করেন। যথারীতি কঠোর ভাবে খাজানা আদায় করায় মহলে প্রজাগণের মনে তীব্র অসন্তোষের ভাব জাগিয়া উঠিলে, তিনি গবর্ণমেণ্টের

সাহায্যে সেটেলমেণ্ট করিয়া তথায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। বিষয়কর্ম্মের সকল গোলযোগ মিটাইয়া সম্পূর্ণ শান্তি স্থাপন করিতে সে সময় তাঁহাকে প্রায় আঠার বৎসর কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল।

রামেন্দ্রসুন্দর অখিল মিস্ত্রীর গলিতে বাস করিবার সময় দুইটি বন্ধু লাভ করেন। বঙ্গের প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী পরলোকগত পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় পাশের বাড়ীতে বাস করিতেন; তাঁহার সহিত রামেন্দ্রসুন্দরের পরিচয় হয়, সেই পরিচয় বন্ধুতায় এবং সেই বন্ধুতা অচির কালমধ্যে আত্মীয়তায় পরিণত হয়। কোন নূতন লোক আসিয়া তাঁহাদিগকে ভিন্ন পরিবারস্থ লোক বলিয়া সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। উভয়ে পরস্পরের সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী হইয়া পড়েন, তেমনটি আর দেখিব না। রামেন্দ্রসুন্দর রজনীকান্তের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"আমি যখন কলেজে পড়িতাম, তখন চাঁপাতলা সেকেণ্ড লেনে আমার বাসা ছিল। ঐ সময়ে চাঁপাতলা ফার্ষ্ট লেনের উপর বঙ্গবাসীর কার্য্যালয় ছিল। রজনীবাবু তাঁহার চাঁপাতলার বাসা হইতে সেকেণ্ড লেন দিয়া বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ে যাইতেন। ঐ লেনে আমার বাসা হইতে আমি মাঝে মাঝে রজনীবাবুকে দেখিতে পাইতাম। * * * প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার পঠদ্দশার শেষ সময়ে রজনীবাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় ঘটে। অখিল মিস্ত্রীর লেনে পরলোকগত গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর বাসায় তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া বাল্যাবধি আমি তাঁহার নামে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। পরিচয়ের পর তাঁহার চরিত্র-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আমি ততোধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেই চরিত্রের সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে ও ঔদার্য্যে অনেকেই মুগ্ধ ছিলেন।"

"রিপন কলেজে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অবধি আমি রজনীবাবুর প্রতিবেশী

ছিলাম। পরিচয় ক্রমশঃ বন্ধুতায় এবং বন্ধুতা ক্রমশঃ আত্মীয়তায় ঘনীভূত হইয়াছিল। তাঁহার মধুর প্রকৃতির কোন অংশ আমার অজ্ঞাত ছিল না, তাঁহার সহিত অবস্থান আমার বিদেশ প্রবাসের সর্ব্বপ্রধান আনন্দ ছিল। তাঁহার অন্তিম রোগের সঞ্চার হইলে, তাঁহার মনের ভিতর ঐরূপ আশঙ্কা জন্মিয়াছিল। কিন্তু ঐ রোগের বাহ্য লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পায় নাই; স্বাস্থ্য-ভঙ্গের কোন চিহ্নই লক্ষিত হয় নাই। তাঁহার আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিতাম। তিনিও দুইএকজন নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত অন্যের নিকট তাহা প্রকাশ করেন নাই। এমন কি তাঁহার নিজপরিবারস্থ কোন ব্যক্তিই এই আশঙ্কার কথা জানিতেন না। কিন্তু তদবধি তিনি স্বাস্থ্যের জন্য কিছু চিন্তিত হইয়াছিলেন। * * * তিনি পরিষদের গৃহ নির্ম্মাণার্থ ভূমিপ্রার্থনায় কাশিমবাজারের মহারাজ মনীন্দ্র চন্দ্র বাহাদুরের সমীপে যাত্রা করেন। তৎপূর্ব্বে তাঁহার হাতে সামান্য ব্রণ হয়; তৎপরে পৃষ্ঠে একটা ব্রণ দেখা দেয়। ২১ শে বৈশাখ ও ৩১ শে বৈশাখ (১৩০৭) তিনি সেই পৃষ্ঠ ব্রণের সংবাদ দিয়া আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে পত্র লেখেন। ৩১ শে বৈশাখের পর আর তাঁহার কোন পত্র পাই নাই। ঐ পত্রের দুই চারি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি—'উহা সাধারণ ফোড়া বলিয়া বোধ হয় না; ডাক্তার বলেন carbuncular boil; কার্বঙ্কলের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়াতে আমার বড় চিন্তার কারণ হইয়াছে। ঘা ভাল হইলে একবার বাড়ী যাইব, কারণ সর্ব্বাগ্রজ মহাশয় বাড়ীতে পীড়িত অবস্থায় আছেন। ১০।১২ দিন পরে বাড়ী ফিরিব। তখন তোমাকে চিঠি লিখিব। শরীর ভাল থাকিলে তোমাদের ওখানে যাইবার বন্দোবস্ত করিব।'

"রজনীবাবু ফিরিয়া আসিয়া আমাদের বাড়ী আসিবেন, আমি ও আমার বন্ধুগণ যে সময়ে ব্যগ্রভাবে এই প্রতীক্ষায় ছিলাম, সেই সময়ে সংবাদ আসিল, আমাদের সেই আশা আর পূর্ণ হইবার নহে। ৩০শে জ্যৈষ্ঠ
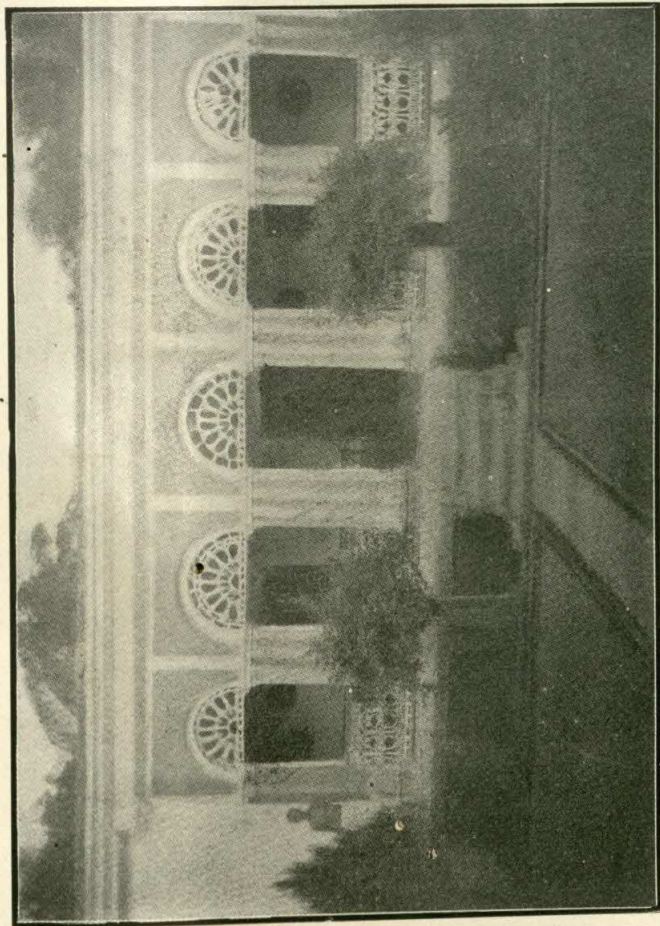
রামেন্দ্রসুন্দরের বসিবার ঘর

৬৪ পৃষ্ঠা

মঙ্গলবার রাত্রি দেড়টার সময় রজনী বাবু ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু আমাদের আশা অপূর্ণ রহিয়া গেল।”

রামেন্দ্রসুন্দর যখন অখিল মিস্ত্রীর লেনে বাস করিতেন, বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তখন তাঁহার প্রতিবেশী ছিলেন; ঐ সময় তিনি রিপন কলেজেও কার্য্য করিতেন; সেই সূত্রে তাঁহার সহিত রামেন্দ্রসুন্দরের পরিচয় ঘটে। ললিতকুমারকে রামেন্দ্রসুন্দর বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। ললিতকুমার রামেন্দ্রসুন্দরের বাড়ীতে আসিয়া অনেক সময় সাহিত্যালোচনা করিতেন; নূতন বিষয় কিছু লিখিলে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তিনি রামেন্দ্রসুন্দরকে উহা পাঠ করিয়া শুনাইতেন।

১৩০০ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভে গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী ফিরিয়া রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের বিবাহ দেন। ঐ বৎসর শ্রাবণ মাসে কাশীবাসিনী রাণী বিমলাসুন্দরী অত্যন্ত পীড়িতা হন, তাঁহাকে দেখিবার উদ্দেশ্যে রামেন্দ্রসুন্দর কলিকাতা হইতে কাশী যাত্রা করেন; সেই তাঁহার প্রথম বঙ্গের বাহিরে গমন। তথায় দশ বার দিন অবস্থান করিয়া পীড়িতা রাণীকে কথঞ্চিৎ সুস্থ দেখিয়া তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৩০১ সালে পূজার পূর্ব্ব হইতে রামেন্দ্রসুন্দরের পত্নী ইন্দুপ্রভা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামকমল উভয়ে নানাবিধ পীড়ায় আক্রান্ত হন; অনেক দিন চিকিৎসার পরও তাঁহারা রোগমুক্ত হইতে পারেন নাই। পরিশেষে বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাঁহাদিগকে স্থানপরিবর্ত্তন করিবার পরামর্শ দেন। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহাদিগের উপদেশক্রমে জননী চন্দ্রকামিনী, পত্নী ইন্দুপ্রভা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামকমলকে সঙ্গে লইয়া মাঘমাসের প্রারম্ভে স্থানপরিবর্ত্তনের মানসে মুঙ্গের যাত্রা করেন; তথায় প্রায় তিন মাস কাল অতিবাহন করার পর একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা বশতঃ মুঙ্গের পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

১৩০১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের প্রারম্ভে একদিন রাত্রি আটটার সময় আমরা কলিকাতার বাসায় মুঙ্গের হইতে তারযোগে সংবাদ পাইলাম, 'রামকমল উৎকট কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, শীঘ্র ডাক্তার পাঠাও।' আমরা ঐ সংবাদ পাইবামাত্র ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের উদ্দেশে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম, তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইবামাত্র দেখিলাম, ডাক্তার বাবু বাহির হইতে তন্মুহূর্ত্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন; আমাদিগকে দেখিয়া তিনি বলিলেন—"এই মাত্র আমি মুঙ্গের হইতে সংবাদ পাইলাম, আপনারা একখানি গাড়ী ঠিক করুন আমি শীঘ্র আহার করিয়া আসি।" আমরা হাবড়া ষ্টেশনে গিয়া তাঁহাকে কর্ডমেলে চড়াইয়া দিলাম। কর্ডমেলের সহিত লক্ষীসরাই ষ্টেশনে লুপ লাইনের গাড়ীর সংযোগ ছিল। আমরা রাত্রি দশটার সময় ষ্টেশন হইতে বাসায় ফিরিলাম।

অতি প্রিয়জনের অন্তরে পরস্পরের প্রতি কিরূপ একটা প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ বৈদ্যুতিক প্রবাহের ন্যায় প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হইতেছে, আমরা সকল সময় সহজে উহার উপলব্ধি করিতে পারি না। আমরা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলে রামকমলের জননী বগলা দেবী ভৃত্যদিগকে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের নিকট সদুত্তর পান নাই। বলা বাহুল্য আমরা তাহাদিগের নিকট কোন কথাই প্রকাশ করি নাই। আমরা বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বগলা দেবী শয়ন করেন নাই। আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তিনি ব্যাকুল অন্তঃকরণে আমাদিগকে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সে দিন একাদশী তিথি। একাদশীর রাত্রে তাঁহাকে কষ্ট না দিবার অভিপ্রায়ে আমরা তাঁহার নিকট কতকগুলি মিথ্যা প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম; কিন্তু তিনি সংশয়াকুলচিত্তে অনাহারে বিনিদ্র রজনী ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইয়াছিলেন। পরদিন প্রভাতে একাদশীর পারণ সমাপন হইলে আমরা

রামকমল

৬৬পৃষ্ঠা

তাঁহাকে বলিলাম, 'কাল মুঙ্গের হইতে সংবাদ পাইয়াছি, তথায় সকলে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন ; শুশ্রূষা করিবার লোকাভাব, সুতরাং আপনাকে তথায় যাইতে হইবে।' বেলা দুইটার সময় দুর্গাদাস ত্রিবেদী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া লুপমেলে মুঙ্গের যাত্রা করিলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া দুইদিন মাত্র রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। ৭ই বৈশাখ প্রভাতে আমরা কলিকাতার বাড়ীতে শেষ সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম, সেই সঙ্গে রামকমলের কনিষ্ঠ সহোদর নীলকমলকে সাঁইথিয়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দিবার কথা ছিল। রাত্রির গাড়ীতে আমরা নীলকমলকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলাম। প্রভাতে সাঁইথিয়া পৌঁছিয়া আমরা ষ্টেশন, বাজার ও গ্রাম অনুসন্ধান করিয়া মুঙ্গেরপ্রত্যাগত কোন ব্যক্তির সন্ধান পাইলাম না, দ্বিতীয় বার অনুসন্ধানের পর আমরা গ্রামের বাহিরে দূরে নদীর প্রশস্ত সৈকতে ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় সেই শোকার্ত্ত পরিবারবর্গকে ভূমি-লুণ্ঠিত অবস্থায় নিরীক্ষণ করিলাম। আমরা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলে সকলের অন্তরনিহিত শোকোচ্ছ্বাসজনিত করুণ আর্ত্তনাদ গগন পবন মুখরিত করিয়া তুলিল। সে দৃশ্য জীবনে কখনও ভুলিবার নহে। যানাদির ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া আমরা কলিকাতায় ফিরিলাম। জেমোর বাড়ীতে আত্মীয় স্বজন পরিবারবর্গের মধ্যে কেহই ঐ সংবাদ অবগত ছিল না। মুঙ্গেরপ্রত্যাগত ব্যক্তিগণ বাড়ী পৌঁছিবামাত্র ঐ দুঃসংবাদ সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। রামকমলের দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা পত্নী অপর্ণা দেবী বিবাহের পর এক বৎসর পূর্ণ না হইতেই বিধবার বেশ ধারণ করিলেন, এবং তদবধি তিনি সেই বেশে শেষ দিনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

১৩০২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা চঞ্চলা দেবীর সহিত বাঘডাঙ্গা গ্রামের সৌরীন্দ্র গোপালের বিবাহ দিয়াছিলেন।

১৩০৪ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গদেশে যে প্রবল ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতে দৈবানুগ্রহে রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনরক্ষা হইয়াছিল। সে দিন তিনি জেমোর রাজবাড়ীতে আহার করিয়া মধ্যাহ্নকালে তথায় বিশ্রাম করিতেছিলেন। মহরম পর্ব্ব উপলক্ষে মুসলমানগণ অপরাহ্লকালে "গোঁয়ারা" লইয়া লাঠিখেলা দেখাইবার জন্য রাজবাড়ী গিয়াছিল। খেলা দেখিবার জন্য প্রতিবেশী বহু লোক রাজবাড়ীর প্রাঙ্গনে সমবেত হইলে ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। রামেন্দ্রসুন্দর ও পূর্ণেন্দুনারায়ণ কম্পনের প্রথম বেগ অনুভব করিয়াই সমবেত লোকদিগকে পলায়ন করিবার জন্য উচ্চকণ্ঠে উপদেশ দিয়া স্থান ত্যাগ করিলেন। তাঁহারা যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন, দেখিতে দেখিতে সেই স্থানেই বৈঠকখানা গৃহের উপর তলার ছাদ কার্ণিশ ও ভিত্তি সকল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া স্তূপাকার হইল, মুহূর্ত্ত বিলম্বে তাঁহাদিগকে সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে সমাধিলাভ করিতে হইত। সুখের বিষয় একটি প্রাণীরও জীবনহানি ঘটে নাই, দৈব সকলকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

ঐ বৎসর ১০ই মাঘ ইংরাজী ২২শে জানুয়ারী তারিখে সর্ব্বগ্রাস সূর্য্য-গ্রহণ হইয়াছিল। বঙ্গদেশ হইতে পূর্ণগ্রাস দৃষ্ট হয় নাই। রামেন্দ্রসুন্দর পূর্ণগ্রাস গ্রহণ দেখিবার জন্য স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তৎপুত্র হারাণ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অপর কয়েকজন ভদ্রব্যক্তি সমভিব্যাহারে বক্সারে গিয়াছিলেন, কারণ ঐ স্থান হইতে পূর্ণগ্রাস গ্রহণ দৃষ্ট হইয়াছিল। তথায় তাঁহারা সকলে ডুমরাঁওর মহারাজের অতিথি-স্বরূপ মহারাজ-ভবনে অবস্থান করিয়াছিলেন।

১৩০৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে রামেন্দ্রসুন্দর যশোহর জেলার সামটা গ্রামের শীতলচন্দ্র রায়ের সহিত তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা গিরিজা দেবীর বিবাহ দিয়াছিলেন। উক্ত বিবাহ উপলক্ষে কলিকাতা হইতে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও ব্যোমকেশ মুস্তফী এবং কাশিমবাজারের মহারাজকুমার মহিমচন্দ্র নন্দী
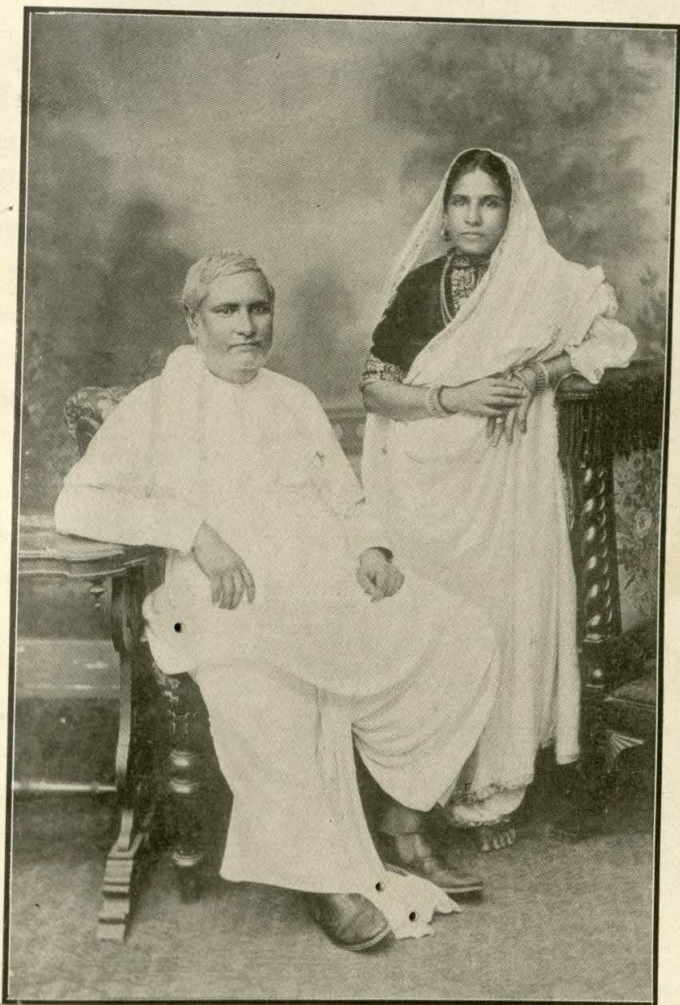
রামেন্দ্রসুন্দর ও ইন্দুপ্রভা

৬৮ পৃষ্ঠা

মহাশয়গণ জেমো নূতনবাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অতীব দুঃখের কথা সেই বিবাহের পর আঠার বৎসর কাল পূর্ণ না হইতেই, কন্যা, কন্যাকর্ত্তা এবং সমাগত উক্ত ভদ্র মহোদয়গণ সকলে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পরিবারবর্গ অধুনা বিয়োগব্যথিত চিত্তে নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন।

১৩১০ সালের শ্রাবণ মাসে রামেন্দ্রসুন্দরের পত্নী ইন্দুপ্রভা দেবী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছিলেন; দুঃখের বিষয় সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হইয়াই জীবলীলা সংবরণ করে, ইহার পর তাঁহার আর কোন সন্তানাদি জন্মে নাই।

লর্ড কর্জ্জন বঙ্গভঙ্গের আদেশ প্রচার করিলে ১৩১২ সালে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়। কলিকাতা নগরী উক্ত আন্দোলনসৃষ্টির আদি স্থান। আন্দোলনের প্রথম সময়ে লোকমুখে এবং সংবাদপত্রদ্বারা কলিকাতার সমাচার রামেন্দ্রসুন্দরের জন্মভূমি অঞ্চলে আনীত হইতেছিল মাত্র। সেই সময় পূজার অবকাশে রামেন্দ্রসুন্দর দেশে আসিয়া স্বদেশী আন্দোলনে দেশ মাতাইয়া তুলিলেন। পূজার পর চতুর্দ্দশী তিথিতে বিপুল সমারোহে একটা বিরাট জনতা শোভাযাত্রা করিয়া ৺কালীমন্দির অভিমুখে গমন করিল; সে দিন আমাদের জেমোকান্দির আপামর সাধারণ নরনারীর মনে একটা অতি প্রবল ভাবের বন্যা প্রবাহিত হইল। ১লা নবেম্বর ঘোষণা প্রচারের দিবসে আর একটা ঐরূপ বিরাট জনতা শোভাযাত্রা করিয়া নদীতীরে "হোমতলায়" সমবেত হইল। সেই স্বদেশী আন্দোলনের দিনে দেশবাসীর মনে যে আশা, উদ্দীপনা ও উৎসাহের ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহার মূলে ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। বলা বাহুল্য তাঁহার জন্মভূমি অঞ্চলে তাঁহারই চেষ্টায় আন্দোলন পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। আন্দোলন প্রচারের উদ্দেশ্যে ঐ অঞ্চলে সকল প্রকার বিরাট ও ক্ষুদ্র শোভাযাত্রা

সঙ্গীত ও সভাসমিতির অনুষ্ঠান তাঁহার কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার স্বদেশবাসিনী মহিলাদিগের জন্য তিনি "বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা" নামক একখানি সরল অথচ মধুর ভাবপূর্ণ পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। ৩০এ অশ্বিন বঙ্গভঙ্গের দিন তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা গিরিজা দেবী স্বদেশব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার দেবালয়ের প্রাঙ্গনে আমন্ত্রিতা ইতরভদ্র সকল শ্রেণীর পল্লীবাসিনীদিগের সম্মুখে সেই বঙ্গলক্ষ্মীর মধুর ব্রতকথা পাঠ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে কলিকাতার তৎকালীন পুলিশ কমিসনার গ্রন্থখানির প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। বঙ্গভঙ্গের স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য ৩০এ অশ্বিন দিবসে অরন্ধনের নিয়ম রামেন্দ্রসুন্দরই প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

১৩১৩ বঙ্গাব্দে পূজার ছুটিতে রামেন্দ্রসুন্দর সপরিবারে পিতৃকর্ম্ম সাধনোদ্দেশে গয়াধাম গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি স্বহস্তপক্ক পায়সান্নদ্বারা ভক্তিসহকারে গদাধরের চরণপ্রান্তে পিতৃপিণ্ড প্রদান করিয়া অন্তরে বিমল আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিলেন, সে কথা তাঁহার সহযাত্রিগণ নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়া থাকেন। গয়াকৃত্য শেষ করিয়া রামেন্দ্রসুন্দর বুদ্ধগয়া দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ভগবান্ সিদ্ধার্থ যেখানে নৈরঞ্জনা নদীতীরে বোধি-দ্রুম-তলে বসিয়া কঠোর তপস্যা অন্তে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এবং সেই পুরুষপ্রধান যখন সিদ্ধমনস্কাম হইয়া, ধরণীর বক্ষোপরি সপ্তবার পাদপ্রসারণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পাদনিম্নে যেখানে বসুন্ধরার ভক্তি-নির্ম্মাল্যস্বরূপ সাতটি কমল বিকশিত হইয়াছিল, সেই পবিত্র স্থান নিরীক্ষণ করিয়া রামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিবিগলিত চিত্তে কণ্টকিত দেহে অশ্রুপাত করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গিগণের সমক্ষে বহুক্ষণ ধরিয়া সেই প্রাচীন ইতিহাস ও ভক্তির গাথা সরল প্রাঞ্জল এবং মধুর ভাষায় বিবৃত করিয়াছিলেন। লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহা একখানি সুন্দর গ্রন্থে

পরিণত হইত। দুঃখের বিষয় তৎকালে তথায় উপস্থিত থাকিবার সময় ও সুযোগ আমার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই।

১৩১৪ সালের মাঘ মাসে লালগোলার রাজা বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নারায়ণ রায় মহাশয় তাঁহার পৌত্র শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনারায়ণকে রামেন্দ্রসুন্দরের কর্তৃত্বাধীনে শিক্ষা দানের জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। শ্রীমান্ ধীরেন্দ্র নারায়ণ রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত এক বাড়ীতে ১৩২০ সালের আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। রামেন্দ্রসুন্দর শিরঃপীড়ায় কাতর হইয়া পড়িলে তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া লালগোলায় চলিয়া যান।

১৩১৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ়শেষে রামেন্দ্রসুন্দরের খুল্ল পিতামহী তিনকড়ি দেবী এবং ১৩১৭ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে খুল্লতাতপত্নী বগলা দেবী স্বর্গারোহণ করেন; রামেন্দ্রসুন্দর উভয়ের শ্রাদ্ধক্রিয়া সমারোহের সহিত সম্পন্ন করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পীড়িত অবস্থা

রামেন্দ্রসুন্দর যখন ছুটির সময় জেমোর বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতেন, তখন কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে সঙ্গে লইয়া তিনি একত্র বসিয়া রাত্রি-কালে আহার করিতেন। আহারের সময় নানা প্রসঙ্গের আলোচনা হইত। ১৩১৮ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন আমরা সকলে ঐরূপ একত্র বসিয়া আহার করিতেছিলাম, আহারের সময় নানারূপ গল্প চলিতেছিল। আহার শেষ হইলে রামেন্দ্রসুন্দর দুধের বাটি তুলিয়া ধরিয়া চুমুক দিতে যাইবেন এমন সময় হঠাৎ তাঁহার চক্ষু দুইটি স্থির হইল, মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল, এবং দুধের বাটি হস্তচ্যুত হইয়া নীচে পড়িয়া গেল; পরক্ষণে তিনি হতচৈতন্য হইয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িলেন। আমরা সকলে অতি ব্যস্তভাবে আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে ধরিলাম এবং তাঁহার মুখে চোখে শীতল জল প্রদান করিয়া পাখার বাতাস দিতে আরম্ভ করিলাম। প্রায় পনর মিনিট পরে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "হঠাৎ মাথাটা ঘুরিয়া উঠিয়াছিল, পরে কি হইল বলিতে পারি না।" আমরা বুঝিলাম মস্তিষ্কের পীড়ার জন্য তিনি ঐরূপ সংজ্ঞাহীন হইয়াছিলেন। এক ঘণ্টা পরে রোগীকে সে স্থান হইতে উঠাইয়া ধীরে ধীরে শয়নকক্ষে লইয়া যাওয়া হইল। সেই দিনের একটা ধাক্কায় তিনি বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। দুই দিন পরে সুস্থ হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "পনর মিনিটে আমাকে পনর দিনের রোগীর ন্যায় দুর্ব্বল করিয়াছে, ২৩ বৎসর পরে আবার শিরোরোগ দেখা

দিল, কে জানে ইহার পরিণতি কিরূপ ? প্রেমচাঁদ পড়িবার সময় আমার শিরোরোগের সূত্রপাত হয়, কিন্তু সেবারে ব্যাধি এমন প্রবলভাবে আক্রমণ করে নাই।” ঐ ঘটনার পর ছয়মাস কাল বেশ ভাল ভাবেই কাটিয়াছিল। পূজার পর শীতের প্রারম্ভে যকৃতের পীড়া দেখা দিলে, খাদ্য দ্রব্য ভালরূপে পরিপাক হইত না, সমগ্র শীতকালটা অজীর্ণ রোগে তিনি বড়ই কষ্ট পাইয়াছিলেন। শীতান্তে বৈশাখ মাসে বায়ুপরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে রামেন্দ্রসুন্দর পুরীধামে গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু তথায় সমুদ্রবারিসিক্ত নির্ম্মল বায়ু সেবন করিয়াও কোনরূপ উপকার বোধ করিলেন না; পাঁচ সাত দিন পরে তথায় দারুণ আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইলেন, মলত্যাগ করিবার সময় একদিন আবার তাঁহার মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল এবং সেই রোগ এত প্রবল ভাব ধারণ করিল যে, প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার জীবনহানির আশঙ্কা উপস্থিত হইল। পাঁচ দিন নীরবে স্থিরভাবে শয্যায় পড়িয়া রহিয়া তিনি প্রথম ধাক্কাটা একটু সামলাইয়া লইলেন, পরে তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। পুরীধামে তিনি মাত্র চৌদ্দ দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া পাঁচমাস কাল শয্যাগত রহিয়া অনেক শুশ্রূষার পর তাঁহার পীড়ার প্রবলতা অনেকটা মন্দীভূত হইল, কিন্তু শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইয়া গেল। সে সময় সর্ব্বদা রোগীর অন্তরমধ্যে একটা বিষম আতঙ্কের ভাব বিরাজ করিত। ঐ বৎসর শীতকালে রামেন্দ্রসুন্দর নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিবার কামনায় চিকিৎসকদিগের পরামর্শক্রমে জল পথে ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইলেন। গঙ্গার উপর কিছুদিন বোটে বাস করিয়া গঙ্গাবারিসিক্ত স্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিয়া তিনি শরীরে স্ফূর্ত্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। গ্রীষ্মকালে বাড়ী আসিয়া সেবার বেশ ভালই ছিলেন। আষাঢ় মাসে কলেজ খুলিলে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। ভাদ্রমাসে তাঁহার উদরের ব্যথা (colic pain) আরম্ভ হয়, সেই বেদনায় তিনি বড় কাতর

হইয়া পড়েন ; এমন কি কিছুদিন উত্থানশক্তিরহিত হইয়া শয্যাগত ছিলেন! চিকিৎসকগণ তাঁহার যকৃতের উপর বিস্ফোটকের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে এইরূপ অনুমান করেন ; এবং অস্ত্রচিকিৎসার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর হোমিওপ্যাথির ভক্ত ছিলেন ; সেই জন্য তিনি ডাক্তার ডি, এন, রায়কে আহ্বান করিলেন ; তাঁহার চিকিৎসায় সেবারের মত ব্যাধির উপশম হইল, আর অস্ত্রচিকিৎসার প্রয়োজন হইল না। শীতের প্রারম্ভে একটু সারিয়া উঠিয়া তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ষ্টীমারে জলপথে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, ষ্টীমারে শান্তি না পাইয়া আবার বোটে ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলেন ; পূর্ব্ব বারের ন্যায় সেবারেও জলপথ ভ্রমণে তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিয়াছিল।

১৩২১ সালের ৫ই ভাদ্র রামেন্দ্রসুন্দরের পঞ্চাশৎবর্ষ বয়স পূর্ণ হইলে বাঙ্গালার সুধীসমাজ সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া যথারীতি তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন। ঐ ঘটনার পরদিন পূর্ব্ব বারের ন্যায় আবার তিনি উদরের বেদনায় আক্রান্ত হন ; কিছুদিন কষ্টভোগ করিয়া অনেক শুশ্রূষার পর যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। শীতকালে তিনি আবার জলপথে বাহির হন। কলিকাতা হইতে উত্তর দিকে নবদ্বীপ পর্য্যন্ত তাঁহার যাইবার ইচ্ছা ছিল। শিরোরোগে আক্রান্ত হইবার সমকালে রামেন্দ্রসুন্দরের দেহে বহুমূত্র রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। সুনিয়মে এবং সুব্যবস্থায় চলিবার হেতু ঐ ব্যাধি প্রবল ভাব ধারণ করিতে পারে নাই ; কিন্তু তিনি জীবনের অবশিষ্ট সময় ঐ ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন নাই।

যখন শরীরে রোগের প্রাবল্য কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইত তখনই রামেন্দ্র-সুন্দর শাস্ত্রানুশীলনে ব্যাপৃত হইতেন, এবং তাঁহার গভীরচিন্তাপ্রসূত অমূল্য

রত্নগুলি তাঁহার স্বদেশবাসীদিগের নিকট উপহার দিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। বৃথা সময় নষ্ট করিবার স্বভাব তাঁহার কোন কালেই ছিল না।

১৩২৫ সালে গ্রীষ্মকালে রামেন্দ্রসুন্দরের ম্যালেরিয়া জ্বর হয়। দুই তিন মাস কাল জ্বরে কষ্ট ভোগ করিয়া শেষে উহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করেন। ঐ সময় তাঁহার জননীরও স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, তিনি কনিষ্ঠ পুত্রের নিকট তীর্থভ্রমণের বাসনা প্রকাশ করেন। জননীর স্বাস্থ্য লক্ষ্য করিয়া রামেন্দ্রসুন্দর একটু চিন্তিত হওয়ায় জননী বলিয়াছিলেন,—"আমার জীবনের আর অধিক দিন অবশিষ্ট নাই, আমার তীর্থভ্রমণের বাসনা অপূর্ণ রাখিও না, আমার বাসনা পূর্ণ না করিলে পরিণামে তোমাদিগকে পরিতাপ করিতে হইবে।" মাতার নির্ব্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর আর কোন আপত্তি না করিয়া তীর্থ ভ্রমণের ব্যয়স্বরূপ কয়েক সহস্র টাকা তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাদাস ত্রিবেদীর হস্তে প্রদান করিলেন। দুর্গদাস ত্রিবেদী তাঁহার জননী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা নীলকমল ও অন্যান্য কয়েকজন আত্মীয়স্বজনকে সঙ্গে লইয়া শ্রাবণ মাসে তীর্থযাত্রা করিলেন।

আষাঢ় মাসে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রিয়তমা কন্যা গিরিজা দেবী শ্বশুরালয় হইতে পীড়িতা হইয়া কলিকাতায় আসেন, তথায় তাঁহার পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পিতামহীর তীর্থযাত্রার সময় তিনি অত্যন্ত পীড়িতা ছিলেন। তীর্থযাত্রিগণ দেড় মাস পরে কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, অগ্রবন, পুষ্কর, সাবিত্রী প্রভৃতি তীর্থসকল ভ্রমণ করিয়া যখন হরিদ্বারে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন কলিকাতা হইতে তাঁহারা সংবাদ পাইলেন, গিরিজা দেবী সংশয়াপন্ন পীড়িতা, তাঁহার জীবনের আশা নাই। ঐ সংবাদ পাইবামাত্র তাঁহারা সদলে হরিদ্বার হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মাতা চন্দ্রকামিনী দেবী কলিকাতায় আসিয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন। তাঁহার পীড়া ক্রমশঃ উৎকট অবস্থায়

উপনীত হইল। পিতামহী এবং নাতিনী উভয়ের জ্বর রোগ পরিশেষে ক্ষয় রোগে পরিণত হইল; বহু অর্থ ব্যয়ে নানারূপ চিকিৎসা করিয়াও রোগের কিছুমাত্র উপশম হইল না, দিন দিন জীবনীশক্তি ক্ষীণতর হইতে লাগিল। দুর্ব্বলদেহে রামেন্দ্রসুন্দরের দিনগুলি আশঙ্কা ও উদ্বেগের সহিত কোন রকমে কাটিতে লাগিল। আশ্বিন মাসে তাঁহার মূত্ররোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইল, সেই পীড়া হইতে তাঁহার জীবনান্ত হইবে বলিয়া কেহই মনে করিতে পারেন নাই, মস্তিষ্কের পীড়ায় কখন কি হয় এই আশঙ্কাই সকলের মনে প্রবল ছিল। পীড়িতা জননী এবং কন্যার কাতর মুখমণ্ডল ও শীর্ণ দেহ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার স্নেহদুর্ব্বল অন্তঃকরণে একটা দারুণ অশান্তির উদ্ভব হইয়াছিল। সংযতচরিত্র পুরুষ সে সব কথা বাহিরের লোককে কিছুমাত্র জানিতে দেন নাই।

১৭ই পৌষ পুত্রহীন জনকজননীর স্নেহময় অঙ্ক শূন্য করিয়া প্রিয়তমা কন্যা রুগ্ন পিতা ও পিতামহী এবং জননী ও স্বামী প্রভৃতি পরিজনবর্গের অন্তরে দারুণ শোকবহ্নি জ্বালাইয়া দিয়া তাঁহাদের চক্ষের সমক্ষে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। পিতামহী আর কলিকাতায় অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিলেন না, তিনি পুত্রগণকে বলিলেন,—"আমি গৃহদেবতাগণকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের চরণতলে জীবনবিসর্জ্জন করিতে বাসনা করিয়াছি, তোমরা আমার অন্তিম বাসনা পূর্ণ কর, আমাকে বাড়ী পাঠাইয়া দাও।" তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র দুর্গাদাস ত্রিবেদী রুগ্ন মাতাকে সঙ্গে লইয়া সপরিবারে মাঘ মাসের প্রথমে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

ঐরূপ শারীরিক এবং মানসিক উভয়বিধ দারুণ অশান্তি ভোগ করিবার সময়েও রামেন্দ্রসুন্দর বৃথা সময়াতিবাহন করেন নাই, দেশহিতকল্পে চিন্তা করিতে তখনও ক্লান্ত হন নাই। গত ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারী দিবসে অপরাহ্ণকালে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বাড়ীতে

গিরিজা

৭৬ পৃষ্ঠা

আগমন করিয়া প্রায় তিন ঘণ্টা কাল তাঁহার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বঙ্গভাষায় এম্, এ, পরীক্ষা গ্রহণ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। উহার কিরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে তৎসম্বন্ধে আলোচনাই স্যর আশুতোষের আগমনের উদ্দেশ্য ছিল। আলোচনা করিবার সময় আমরা তথায় থাকিবার অনুমতি পাই নাই; আলোচনা বিরলেই চলিয়াছিল; সুতরাং উহার বিশেষ বিবরণ আমরা পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতে পারিলাম না। আলোচনান্তে স্যর আশুতোষ মিষ্ট মুখ করিয়া চলিয়া গেলে, রামেন্দ্রসুন্দর ফিটনে সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন; গ্রন্থলেখক তাঁহার সঙ্গে গমন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। ভ্রমণের সময় স্যর আশুতোষের আগমনের উদ্দেশ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন—"বাঙ্গালা ভাষায় এম, এ, পরীক্ষার অধ্যাপনা কিরূপে হইতে পারে, সেই বিষয় আলোচনা করিবার জন্য স্যর আশুতোষ আসিয়াছিলেন।" সেই বিষয়ে আরও কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "ও সব private."

সপ্তম অধ্যায়

স্বর্গারোহণ

১৩২৫ সালের ফাল্গুন মাসে রামেন্দ্রসুন্দরের ভগ্নদেহে জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পাইল ; তাহার দশ বার দিন পরে মূত্ররোগ প্রবলভাব ধারণ করায় সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া উঠিল। চৈত্র মাসে তিনি উত্থানশক্তিহীন এবং শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন তাঁহার জননী চন্দ্রকামিনী দেবী গৃহদেবতাগণের সম্মুখে দেহত্যাগ করিয়া অনন্ত-ধামে চলিয়া গেলেন। মাতার ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার আশায় রামেন্দ্রসুন্দর সেই রোগজীর্ণ দেহে কলিকাতা হইতে তাঁহার জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তৎকালে তাঁহার শরীর এতই অপটু হইয়াছিল যে, আগু শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান ব্যতীত তিনি আনুষঙ্গিক শ্রাদ্ধক্রিয়াগুলির অনুষ্ঠান নির্ব্বাহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। পিণ্ডদানকালে ভ্রাতাদিগের সাহায্য ব্যতিরেকে তাঁহার বসিয়া থাকিবারও সামর্থ্য ছিল না। বলা বাহুল্য শ্রাদ্ধ ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক সকল অনুষ্ঠান তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মাতৃপিণ্ড দান করিয়া আসিয়া রামেন্দ্রসুন্দর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"এই গুরুতর কর্ত্তব্যটি জীবনে সাধন করিতে পারিব বলিয়া আমি আশা করিতে পারি নাই, আজ ভগবৎ কৃপায় আমার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল।" মাতৃশ্রাদ্ধ শেষ করিয়া তিনি একবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। জ্বর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। স্থানীয় হাসপাতালের ডাক্তারকে আহ্বান করা হয়, কিন্তু রোগী এলোপ্যাথি মতে চিকিৎসা পছন্দ করিলেন না, এলোপ্যাথি চিকিৎসাপদ্ধতির

প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না, বাল্যকাল হইতে তিনি হোমিওপ্যাথির ভক্ত ছিলেন। ভাল হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার কান্দিতে কেহ উপস্থিত ছিলেন না, সুতরাং আয়ুর্ব্বেদীয় মতে তাঁহার চিকিৎসা আরম্ভ হয়। দশ বার দিন চিকিৎসার পরও রোগের কিছু উপশম বোধ হইল না। ৫ই জ্যৈষ্ঠ তিনি সপরিবারে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। ভবানীপুরের একজন প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার তাঁহার চিকিৎসা করিতে ব্রতী হইলেন, কিন্তু সেই চিকিৎসায় কোনরূপ সুফল দেখা দিল না, বরং রোগ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। সাত দিন পরে দুর্গাদাস ত্রিবেদী তাঁহার মনোগত বিরুদ্ধ ভাব ডাক্তারের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলে, ডাক্তার তাঁহাকে দ্বিতীয় চিকিৎসক নিযুক্ত করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ও প্রাণধন বসুকে আহ্বান করা হইল, তাঁহারা রোগীকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—Brights পীড়া অতি সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়াছে, রোগীর জীবনের আশা আর নাই। নির্ব্বন্ধে বাধ্য হইয়া তাঁহারা চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; অধিক পরিমাণে মলমূত্র নিঃসারিত করিবার প্রয়োজন বুঝিয়া তাঁহারা সেইরূপ ব্যবস্থা করিলেন, উক্ত ব্যবস্থায় মলমূত্র নিঃসরণ হেতু রোগী কিছু সুস্থ হইলেন; কিন্তু তিন দিন পরে রোগীর হিক্কা আরম্ভ হয়। উগ্র ঔষধ সেবনে হিক্কার আবির্ভাব হইয়াছে মনে করিয়া এলোপ্যাথির পরিবর্ত্তে আবার হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করা হয়। ঐরূপ আশাহীন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াও রোগী কিন্তু একদিনের জন্যও জীবনে হতাশ হন নাই, তাঁহার অন্তরেও নিরুৎসাহের ভাব দেখা দেয় নাই। হিক্কা আরম্ভ হইবার পর একটি দিন মাত্র তিনি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া রোদন করিয়াছিলেন, দ্বিতীয়বার হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা আরম্ভ হইবার পর প্রথম দিনটা বেশ ভাল ছিলেন, কিন্তু পরদিন হইতে হিক্কা আবার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাকে কাতর করিয়া ফেলিল।

হিক্কা রোগে অত্যন্ত কাতর হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"একদিন পার্শী বাগানের বাসায় রোগযন্ত্রণায় বড় কষ্ট পাইয়াছিলাম, মা আমাকে কোলে লইয়া, গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়া কত আরাম দিয়াছিলেন, তাঁহার সেই সর্ব্ব-দুঃখহারী স্নেহাশীর্ব্বাদের ফলে আমি যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলাম, আজ আমার মা নাই, কে আমায় সে স্বস্তি দান করিবে?" এই কথা বলিয়া তিনি স্বর্গগতা জননীর উদ্দেশে রোদন করিয়াছিলেন। যে সময়ে হিক্কাটা কম বোধ হইত, সেই সময়ে তাঁহার নির্দ্দেশমত তাঁহার কথিত "বিচিত্র প্রসঙ্গ" পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনান হইত, এবং তাঁহার দৌহিত্র শয্যাপার্শ্বে বসিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের "পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে" গানটি গাহিত, তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একমনে শ্রবণ করিতেন।

হিক্কা আরম্ভ হইবার চারি দিন পরে আবার বমি দেখা দিল। বমির যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া রোগী সময়ে সময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িয়া রহিতেন। তখন তাঁহার দেহে একটা মোহময় তন্দ্রার ভাব দেখা দিত। হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত যদুনাথ কাঞ্জিলাল মহাশয় আসিয়া তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়া মানসিক শক্তিসঞ্চালন দ্বারা ঘুম পাড়াইতেন। রোগী উক্ত প্রক্রিয়াতে বড়ই আরাম বোধ করিতেন। দুঃখের বিষয় সে নিদ্রা কিন্তু অধিকক্ষণ স্থায়ী হইত না। প্রতিদিন সকাল বেলাটা রোগী একটু ভাল থাকিতেন, বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোগ বৃদ্ধি পাইত ও অপরাহ্ণ কালে তন্দ্রার ভাব দেখা দিত। সকালবেলা তাঁহাকে সংবাদপত্র পাঠ করিয়া শুনান হইত। কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি বর্জ্জন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সংবাদপত্র হইতে পাঠ করিয়া সেই সমাচার তাঁহাকে শুনান হইলে তিনি বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরের সেই প্রফুল্ল ভাব উপলব্ধি করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাদাস ত্রিবেদী, তিনি রবীন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিতে ইচ্ছুক কিনা, এই কথা

জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আগ্রহের সহিত দেখা করিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। পরদিন প্রত্যূষে দুর্গাদাস ত্রিবেদী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের নিকট গিয়া দাদার শেষ দর্শনপ্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। ১৯শে জ্যৈষ্ঠ সকাল বেলা রবীন্দ্রনাথ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট ভবনে রামেন্দ্রসুন্দরের রোগশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। রবীন্দ্রনাথকে দর্শন করিয়া রোগীর মুখে একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দের ভাব প্রকাশ পাইল। সে অবস্থায় তিনি রবীন্দ্রনাথের সহিত দুই চারিটি কথাবার্ত্তাও কহিয়াছিলেন। কবির স্বহস্তলিখিত রচনা কবির নিজমুখে শ্রবণ করিয়া রোগীর অন্তরে উল্লাসের ভাব দেখা দিয়াছিল। সেই অন্তিম কালেও দেশের প্রতি মমত্ব তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল, তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া ভাবাবেশে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, রোগযন্ত্রণার বিষয় তখন তাঁহার মনে ছিল না। রবীন্দ্রনাথ উঠিয়া যাইবার সময় তিনি ভক্তির সহিত তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাতার ভক্ত সন্তানের প্রতি রামেন্দ্রসুন্দরের মনে কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহার ঐ শেষ আচরণে তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। রবীন্দ্রনাথ চলিয়া গেলে ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, 'আজ ভালই দেখিতেছি।' ডাক্তার চলিয়া যাওয়ার পরক্ষণেই রোগীর শ্রবণশক্তি লোপ পাইল, তিনি যেন ঘুমাইয়া পড়িলেন—সে ঘুম আর ভাঙ্গিল না। ২৩শে জ্যৈষ্ঠ রাত্রি দশটার সময় তিনি তাঁহার প্রিয়জনদিগের সকল আশা ও ভরসা অপূর্ণ রাখিয়া তাহাদিগের হৃদয়ে দারুণ শেলাঘাত করিয়া অকালে সাধনোচিত ধামে চলিয়া গেলেন। মার মন্দিরের একটি জ্বলন্ত ঘৃতের প্রদীপ নিবিয়া গেল। বঙ্গভূমি রামহীন হইল। রাঢ়ের রাম, সমগ্র বঙ্গের রাম, বঙ্গ সাহিত্যের রাম, সাহিত্য-পরিষদের রাম, রিপন কলেজের রাম, সখাসহচরবর্গের রাম, বর্ষার প্রথমে শুক্লা নবমী তিথিতে মহানিশার সূচনা কালে মহাপ্রস্থান করিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত' চলিয়া গেলেন, তিনি তাঁহার পরিত্যক্ত শোকাহত প্রিয়জনের জন্য কি রাখিয়া গেলেন? তাঁহার অমূল্য চিন্তারাশি! আমরা তাহার কথা বলিব না, বাঙ্গালার সুধীসমাজ তাহার আলোচনা করিবেন। সর্ব্বোপরি তিনি যে তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি ও ভালবাসা প্রাণের সহিত ঢালিয়া দিয়া এই অধম প্রিয়জনদিগকে মহত্ত্বের পথে, মনুষ্যত্বের পথে নিয়ন্ত্রিত করিতেছিলেন, সেই শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি ও ভালবাসার কথা স্মরণ রাখিয়া যেন আমরা যাবজ্জীবন অশ্রুজলে তাঁহার পবিত্র স্মৃতির তর্পণ করিতে পারি।

রামেন্দ্রসুন্দরের অন্তিম কালে পণ্ডিতবর মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন, তিনি বড় আক্ষেপের সহিত বলিয়াছিলেন,—"আমাদের চক্ষের সম্মুখে বিদ্যার একটা বড় জাহাজ ডুবিয়া গেল।" বঙ্গজননীর পবিত্র অঙ্কের যে স্থান শূন্য করিয়া রামেন্দ্রসুন্দর চলিয়া গিয়াছেন, ভবিষ্যতে আর কোন ভাগ্যধর সন্তান মাতৃঅঙ্কের সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে পারিবেন কিনা, বলিতে পারি না। যে মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া স্বীয় প্রতিভার ভাস্বর জ্যোতিতে আমাদের বংশের নাম সমুজ্জ্বল করিয়াছেন, অধুনা তিনি তাঁহার সেই সুবিমল কিরণ সংহৃত করিয়া পরপারের দিব্যালোকের পূর্ণ জ্যোতির সহিত মিশিয়া গেলেন, আমরা গভীর তমসাচ্ছন্ন কালের গর্ভে পড়িয়া রহিলাম।

২৩শে জৈষ্ঠ, গ্রীষ্মের ছুটি, কলেজ বন্ধ ছিল; কলেজের ছাত্রবৃন্দ কলিকাতায় উপস্থিত ছিল না। কলিকাতাবাসী ভক্তগণ আসিয়া কনিষ্ঠ দুর্গাদাসের নিকট তাঁহার অগ্রজের শবদেহ আড়ম্বরপূর্ণ শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহার সাধের সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরদ্বারের সম্মুখ দিয়া শ্মশানঘাটে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। শোকাহত ভ্রাতা দুর্গাদাস তদুত্তরে বলিলেন—"আমার দাদা চিরকাল আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করিয়া

গিয়াছেন, জীবনে তিনি এরূপ ভাবের কোন কার্য্যের সমর্থন করিতেন না, আজ তাঁহার জীবনান্তে তাঁহার অনভিপ্রেত কার্য্য করিতে আমরা ইচ্ছুক নহি।" তাহা শুনিয়া ভক্তগণ বিরত হইলেন। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুজনে দেহ বহন করিয়া শ্মশানঘাটে লইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে সর্ব্বগ্রাসী চিতার অনলে জ্ঞান, কর্ম্ম, সাধনা, বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিভার আধার স্বরূপ সেই বরবপু ভস্মীভূত হইয়া গেল। শোকাহত পরিবার শূন্যপ্রাণে হাহাকার করিতে করিতে বাড়ী ফিরিল। দুইমাস হইতে না হইতেই আবার একটা বড় শ্রাদ্ধক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হইল।

যে দিন রামেন্দ্রসুন্দর ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, সেই দিন খুল্লপিতামহ শিশুর মুখ দর্শন করিয়া যে ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন, ৫৫ বৎসর পরে সেই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক করিয়া, সকল খেলা সাঙ্গ না হইতেই যেখানকার লোক সেইখানে চলিয়া গেলেন। ভক্তগণ তাঁহার পবিত্র গুণাবলী স্মরণ করিয়া অশ্রু বর্ষণ করুন।

অষ্টম অধ্যায়

বিশ্ববিদ্যালয়ে

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রামেন্দ্রসুন্দর একাদশ বৎসর বয়সে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান ও রাজবৃত্তি লাভ করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, জানুয়ারী মাসে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবার নিমিত্ত কান্দির ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। তথায় তিনি পাঁচ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান ও রাজদত্ত মাসিক ২৫৲ বৃত্তি লাভ করেন। অনন্তর তথা হইতে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিবার বাসনায় কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। তথায় সাত বৎসর বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তিনি গৌরবের সহিত ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্য সাধন করে।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়া মাসিক ২৫৲ বৃত্তি ও আনুষঙ্গিক স্থবর্ণ পদক পুরস্কার পান। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বি, এ পরীক্ষায় রসায়ন বিদ্যার বিশিষ্ট বিভাগে (Chemistry Honours) সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইয়া মাসিক ৪০৲ টাকা ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন। পর বৎসর ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞান বিভাগে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন উভয় বিষয়ে এম্, এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আনুষঙ্গিক স্থবর্ণ পদক ও একশত টাকা মূল্যের বিজ্ঞানবিষয়ক কতকগুলি গ্রন্থ পুরস্কার পান। এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর বৎসর ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রামেন্দ্রসুন্দর পদার্থবিদ্যা ও

রসায়নে পরীক্ষা দিয়া একটি সুবর্ণ পদক ও প্রেমচাঁদ ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন ; বৃত্তির পরিমাণ আট হাজার টাকা।

আমরা রামেন্দ্রসুন্দরের ছাত্রজীবনের একটা মোটামুটি ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিলাম। তিনি দ্বাদশ বৎসর কাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তিত বিদ্যা শিক্ষায় এবং পাঁচ বৎসর কাল নিম্ন শিক্ষায় অতিবাহন করেন, এইরূপে তাঁহার জীবনের সতর বৎসর পরীক্ষার্থী ছাত্ররূপে অতিবাহিত হয়।

ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্য শেষ করিবার দুই বৎসর পরে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে রমেন্দ্রসুন্দর পরীক্ষকরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনঃ প্রবেশ করেন। তিনি ১৮৯০ হইতে ১৮৯৩ অব্দ পর্য্যন্ত চারিবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভূগোলের পরীক্ষক ছিলেন ; এফ, এ পরীক্ষায় ১৮৯৪ অব্দ হইতে ১৮৯৮ অব্দ পর্য্যন্ত পাঁচবার রসায়নের পরীক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন ; ১৮৯৯ হইতে ১৯০৫ অব্দ পর্য্যন্ত সাতবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভূগোলের প্রধান পরীক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন ; ১৯০৬ হইতে ১৯০৮ অব্দ পর্য্যন্ত তিনবার মধ্য পরীক্ষায় (Intermediate) রসায়নের প্রধান পরীক্ষক ছিলেন, এবং ১৯০৮ অব্দে উক্ত পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যার প্রধান পরীক্ষকের কার্য্যও করিয়াছিলেন। ১৯০৯ অব্দে মধ্য পরীক্ষায় বাঙ্গালাভাষার প্রধান পরীক্ষক হইয়াছিলেন ; ১৯১০ হইতে ১৯১২ অব্দ পর্য্যন্ত তিনবার উক্ত পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যার প্রধান পরীক্ষক ছিলেন ; ১৯১৩ অব্দে বি, এ এবং বি, এস্‌সি পরীক্ষায় পদার্থ বিদ্যার বিশিষ্ট (Honours) পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হন ; ১৯১৪ অব্দে তিনি উক্ত পরীক্ষায় রসায়নের পরীক্ষা করেন ; ১৯১৫ অব্দে বি, এ এবং বি, এস্‌সি পরীক্ষার Board of Examiners সভার সভাপতি-রূপে নির্ব্বাচিত হন, এবং ১৯১৬ অব্দেও ঐ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন ;

১৯১৭ অব্দে রসায়নের এম, এ ও এম্, এস্‌সি পরীক্ষায় এবং বি, এ ও বি, এস্‌সি পরীক্ষায় পদার্থ বিদ্যার বিশিষ্ট পরীক্ষায় পরীক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন; ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাধির আক্রমণে স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু পরীক্ষকের কার্য্য পরিত্যাগ করেন। ১৯১৯ 'ব্দে বি, এ পরীক্ষায় বাঙ্গালাভাষার প্রধান পরীক্ষকের কার্য্য করিবার পর তাঁহার জীবনলীলার অবসান হয়। তিনি ১৮৯০ হইতে ১৯১৯ অব্দ পর্য্যন্ত ত্রিশ বৎসর কাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন।

ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্য শেষ করিবার ছয় বৎসর পরে রমেন্দ্রসুন্দর ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটগণ কর্ত্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য (Fellow of the University) নির্ব্বাচিত হইয়া সেনেটে প্রবেশ করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১৭ অব্দ পর্য্যন্ত ২৩ বৎসর কাল তিনি নির্ব্বাচিত সদস্যরূপে সেনেটে কার্য্য করেন। উক্ত ২৩ বৎসরের মধ্যে যতবার নির্ব্বাচনের ব্যাপার চলিয়াছিল, গ্রাজুয়েটগণ প্রতিবারেই তাঁহাকে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। ১৯১৮ অব্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সদস্য মনোনীত করেন; জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদে আসীন ছিলেন।

১৮৯৪ অব্দ হইতে ১৯০৬ অব্দ পর্য্যন্ত বার বৎসর রামেন্দ্রসুন্দর Faculty of Arts, এবং ১৯০৭ অব্দ হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৯১৯ অব্দ পর্য্যন্ত ২২ বৎসর কাল Faculty of Arts and Science-এর মেম্বর ছিলেন। তিনি ১৯১৭ অব্দের এপ্রিল মাস হইতে ১৯১৮ অব্দের মে মাস পর্য্যন্ত এক বৎসর রোগের যন্ত্রণায় কার্য্য করিতে পারেন নাই।

১৮৯৪ অব্দ হইতে ১৯০৫ অব্দ পর্য্যন্ত এগার বৎসর রামেন্দ্রসুন্দর

Mathematics, Physics ও Chemistyর Mathematical & Experimental Board of Study-র, এবং ১৯০৭ অব্দ হইতে ১৯১৯ অব্দ পর্য্যন্ত ২২ বৎসর কাল সংস্কৃত ভাষার এবং ভূগোলের Board of Study-র মেম্বর ছিলেন। তিনি ১৯১২ হইতে ১৯১৮ অব্দ পর্য্যন্ত ছয় বৎসর Mathematical এবং Experimental Physics বিষয়ের Board of Study-র President ছিলেন। তিনি Board of Geography-র President রূপে ১৯১২ অব্দ হইতে ১৯১৬ অব্দ পর্য্যন্ত চারি বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন।

আমরা রামেন্দ্রসুন্দরের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবন হইতে কর্ম্মজীবন পর্য্যন্ত সমুদয় ঘটনার একটা মোটামুটি নির্ঘণ্ট দিলাম। ঐ তালিকাটি পাঠ করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, তিনি সাহিত্যচর্চ্চায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে আত্মসমর্পণ করিয়া এবং তৎসংক্রান্ত কার্য্যে লিপ্ত রহিয়া তাঁহার অমূল্য জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ সাহিত্য সাধনার অঙ্গীভূত, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কিত। সাহিত্য এবং বিশ্ববিদ্যালয় এই দুইটি মূর্ত্তি এক সঙ্গে তাঁহার অন্তরে সদাসর্ব্বদা বিরাজ করিত। তিনি ভাবিয়াছিলেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত আমাদের মাতৃভাষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া উচিত; তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতপ্রবর অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের উক্তির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম,—

"রামেন্দ্রসুন্দরের সম্বন্ধে একটা বিশিষ্ট কথার উল্লেখ আমি করিতেছি। বহুকাল হইতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য ছিলেন, আমিও তদ্রূপ সভ্য ছিলাম এবং এখনও আছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক গুরুভার তিনি বহন করিতেন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কার্য্যই করিয়া গিয়াছেন। তবে সেনেট সভায় তিনি প্রায়ই মুখ খুলিতেন না। তিনি কর্ম্মবীর ছিলেন—নীরবে কর্ম্মই করিতেন। বক্তৃতার পক্ষপাতী ছিলেন না। তবে একবার

১৯০৪—১৯০৫ অব্দে যখন নূতন Regulation বা নিয়মাবলী প্রস্তুত হইতে থাকে, তখন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন ও পরীক্ষার স্থান যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়, তাহার জন্য কোন সভ্য প্রস্তাব করেন। বাঙ্গালী সভ্যগণের মধ্যে এক রামেন্দ্রসুন্দর সেই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া এক বক্তৃতা দেন। সেই হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা আমি চিত্রার্পিতের ন্যায় শুনিয়াছি। অনেক রথী মহারথী, যাঁহারা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই প্রায় ঐ প্রস্তাবে বিপক্ষবাদী ছিলেন। কাজেই ইহা গ্রাহ্য হয় নাই। কিন্তু সুখের বিষয়, যখন ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়া দিলেন, তখন দেখা গেল যে, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য সেনেটের অনভিমতেও উহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। যেদিন এই সংবাদ গেজেটে প্রকাশিত হয়, সেদিন রামেন্দ্রসুন্দরের উল্লাস দেখে কে? সেই বিপক্ষবাদী মহারথিগণের মধ্যে কেহ কেহ আজকাল সপক্ষবাদীর কাণ্ডারী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এটা বড় সুখের বিষয় ও সুলক্ষণ। রামেন্দ্রসুন্দরের এই কীর্ত্তি বোধ হয়, অনেকেই জানেন না। তাই নিবেদন করিলাম।"

বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এ হেন রত্নকে চিনিয়াও চিনিতে পারেন নাই, তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া আদর করিতেও পারেন নাই। রামেন্দ্রসুন্দর আদর লইবার জন্য ভিক্ষার্থিরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে কখন অঞ্চল পাতিয়া দাঁড়ান নাই; বিশ্ববিদ্যালয়ও সেই কারণে তাঁহার প্রতি ফিরিয়া চাহিবার কারণ দেখিতে পান নাই। বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের দেশের যে সকল ব্যক্তিকে সর্ব্বোচ্চ Doctor (বিশারদ) উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, রামেন্দ্রসুন্দর বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা, জ্ঞান ও কর্ম্মে তাহাদের তুলনায় কাহারও অপেক্ষা হীনতর ছিলেন না, এ কথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। রামেন্দ্রসুন্দর মানের কাঙ্গাল ছিলেন না, বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার গুণের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে বিশিষ্ট উপাধি দিয়া

সম্মানিত করেন নাই ; সেই কারণে তাঁহার মত লোকের দুঃখ করিবার কিছুই নাই।

রামেন্দ্রসুন্দর য়ুরোপে জন্মগ্রহণ করিলে, য়ুরোপের পণ্ডিতগণ তাঁহার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিতেন, এই কথা কেহ একবার মনে ভাবিয়াও দেখেন নাই। রামেন্দ্রসুন্দর কখনও উপাধিলালসায় তাঁহার সুদৃঢ় মেরুদণ্ডকে কাহার নিকট অবনত করেন নাই, মানের দিকে দৃষ্টি না ফিরাইয়া কর্ত্তব্যের হিসাবে তিনি কার্য্য সম্পাদন করিতেন। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" তিনি কর্ম্মকে বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাই কর্ম্ম-সাধনা তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন,—"রামেন্দ্রসুন্দর মানের কাঙ্গাল ছিলেন না—না রাজদরবারে না জনগোষ্ঠীতে। শাস্ত্র বলিয়াছেন— "সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।" সম্মানকে দূরে পরিহার করিবার এই যে স্পৃহা—ব্রাহ্মণ্যের এই যে সনাতন লক্ষণ, ইহা তাঁহার চরিত্রে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সঙ্গত ছিল। বর্ত্তমান— এই জোগারের যুগে—ঐহিক সর্ব্বস্বতার এই মাহেন্দ্র ক্ষণে সম্মান-বিরাগ এদেশে ক্রমশঃ অলীক কল্পনায় দাঁড়াইতেছে। যাচিয়া এখন মান লইতে লোকে লালায়িত। দান করিয়া সংবাদপত্রে প্রচার করিয়া, উমেদারী দ্বারা খেতাব অর্জ্জন করিয়া, জীবদ্দশায় স্মৃতিরক্ষার আয়োজন করিয়া— ঔর্দ্ধদৈহিক তর্পণ কৃত্যও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ আপন আপন চক্ষের সম্মুখেই সারিয়া লইতেছেন। পাছে অধস্তন পুরুষেরা অবহেলা করে, বিস্মৃত হয়, পাছে নিজের প্রাপ্য যশোরাশির কোন ভগ্নাংশ হইতে ভবিষ্যতে বঞ্চিত হইতে হয়। পুরাকালে এদেশে লোকে দান-দুর্গোৎসব, অতিথি-সৎকার, পূর্ত্তকার্য্য করিত—তাহাদের আস্থা ছিল যে, পরবর্ত্তী পুরুষেরা কৃতজ্ঞভাবে তাহাদের নামকীর্ত্তন করিবে। রামেন্দ্রসুন্দর এদেশের প্রাচীন আদর্শ

অনুসরণ করিতেন—অশনে ও বসনে—চিন্তায় ও ব্যবহারে। তিনি দেশবাসীকে চিনিতেন এবং নিজে দেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাই সম্মান প্রাপ্তির জন্য জীবিতাবস্থায় তিনি উৎকণ্ঠিত হন নাই—শেষ পর্য্যন্ত উপাধি ও কর্ত্তৃত্বে লাঞ্ছিত না হইয়া তিনি শুধু শ্রীরামেন্দ্রসুন্দরই ছিলেন।"

কেবল মাত্র একটি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় রামেন্দ্রসুন্দরকে যোগ্য পাত্র স্থির করিয়া তাঁহার প্রতি একটা সম্মানের কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন। বিষয়টি এই, গত ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে যখন ভারতসম্রাট্ বঙ্গদেশে আগমন করেন, রামেন্দ্রসুন্দর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে আরও কতিপয় সভ্যের সহিত বড়লাট মহাশয়ের উপদেশক্রমে সম্রাট্‌কে অভিনন্দিত করিবার জন্য প্রিন্সেপ ঘাটে গমন করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিবার জন্য তিনি রাজপ্রাসাদে আহূত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

নবম অধ্যায়

অধ্যাপকরূপে

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে রিপন কলেজে বি, এ, বি কোর্স খোলা হয়। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ৺গোবিন্দচন্দ্র দাস তৎপূর্ব্বে রিপন কলেজে পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়ন বিদ্যার অধ্যাপনা করিতেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে রামেন্দ্রসুন্দর রিপন কলেজে অধ্যাপকরূপে প্রবেশ করেন, তৎপূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত করিবার জন্য তাঁহার নিকট দুইবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তিনি তৎপূর্ব্ব হইতেই কলিকাতাকে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রের কেন্দ্ররূপে নির্ণয় করিয়াছিলেন। কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মোপলক্ষে মফস্বলে কোথাও বাস করিতে তিনি সম্মত ছিলেন না। প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁহাকে স্থায়িভাবে রাখা হইলে তিনি বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিতে সম্মত হইতেন। গবর্ণমেণ্টের নিকট ঐরূপ প্রস্তাব করিলে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে স্থায়িভাবে প্রেসিডেন্সি কলেজে রাখিবার ভরসা দিতে পারেন নাই। রিপন কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে ভবিষ্যতে কলেজের Principal বা অধ্যক্ষ করিতে পারিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া অনেক অনুরোধ করিলে তিনি রিপন কলেজে প্রবেশ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি তাহার ভার বহন করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই।

রামেন্দ্রসুন্দর যৎকালে রিপন কলেজে প্রবেশ করেন, তখন কলেজের

অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না; ছাত্রসংখ্যা ৪৫০ হইতে ৫০০ পর্য্যন্ত ছিল; তাহার সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ৭০০ হইতে ৮০০ হয়।

রিপন কলেজে তৎকালে অধ্যাপকের সংখ্যা দশ বার জনের অধিক ছিল না। তখন রিপন কলেজ প্রবীণ বিচক্ষণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে অধ্যক্ষরূপে পাইয়া নিজের নাম গৌরবমণ্ডিত করিয়াছিল। রামেন্দ্রসুন্দর পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়ন এই দুইটি বিষয়েরই অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করেন। ঐ সময় উপযুক্ত অধ্যাপক লাভ করিয়া কলেজের অবস্থা দিন দিন উন্নত হইতে আরম্ভ হয়।

দশম অধ্যায়

অধ্যক্ষরূপে

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে অধ্যক্ষ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় ছয় মাসের অবকাশ গ্রহণ করেন, তৎপদে রামেন্দ্রসুন্দর অস্থায়ী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

অবকাশকাল পূর্ণ হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর কার্য্যে যোগ দান করিতে পারেন নাই; রামেন্দ্রসুন্দর অতঃপর স্থায়ী অধ্যক্ষ হইলেন। তৎকালে কলেজের অবস্থা সেকালের হিসাবে ভালই ছিল। ছাত্রসংখ্যা নয় শতেরও অধিক ছিল, অধ্যাপকও পনর ষোল জন ছিলেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় অবসর গ্রহণ করিলে, রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার ন্যায় কলেজের Law এবং Art উভয় বিভাগেরই অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে রামেন্দ্রসুন্দর প্রাচীন বিধি অনুসারে (Old Regulations) কলেজে বি, এস্‌সি শ্রেণী খুলিবার চেষ্টা করেন। তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌ চ্যান্সলার স্যর আলেকজেন্দর পেড্‌লার কলেজ পরিদর্শন করিতে আসেন, তিনি কলেজের অধ্যাপকগণ সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা করেন; কিন্তু তিনি কলেজের যন্ত্রাগার ও পুস্তকাগারের (Laboratory & Library) দৈন্য দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সুরেন্দ্রনাথ তদুত্তরে বলেন—"রামেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে বিজ্ঞানের বহু পুস্তক আছে, কলেজ তাহা হইতে সাহায্য পাইয়া থাকে।" এই কথা শুনিয়া পেড্‌লার সাহেব বলেন—"তিনি রিপন কলেজ নহেন,

এইরূপ অবস্থায় আমি বি, এস্‌সি শ্রেণী খুলিবার অনুমতি দিতে পারি না।” পেড্‌লার সাহেবের প্রতিবাদে সেবারে বি, এস্‌সি শ্রেণী খুলিবার সুযোগ হয় নাই।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস্ চ্যান্সলার স্যর আশু-তোষ মুখোপাধ্যায় ও কলেজসমূহের পরিদর্শক শ্রীযুক্ত পি, কে, রায় একবার রিপন কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন।

সেই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে একটিমাত্র Central Law College স্থাপন করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সলার স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় রিপন, সিটি, মেট্রোপলিটান, বঙ্গবাসী প্রভৃতি কলিকাতার প্রধান প্রধান কলেজের অধ্যক্ষদিগকে আহ্বান করিয়া একটি পরামর্শ-সমিতির অনুষ্ঠান করেন। তিনি ঐ বৈঠকে প্রস্তাব করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে একটি আদর্শ আইন কলেজের প্রতিষ্ঠা করা হইবে, অন্যান্য কলেজের আইনের শ্রেণীগুলি উঠা-ইয়া দেওয়া হউক। এক রিপন কলেজ ভিন্ন অন্যান্য সকল কলেজের অধ্যক্ষগণ ভাইস্ চ্যান্সলার মহাশয়ের প্রস্তাবে স্বীকৃত হন। কিন্তু রিপন কলেজের অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর তাহাতে সম্মতি দিতে পারেন নাই; তিনি বলেন—“আমাদের এত দিনের কলেজ, প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক ছাত্র এই কলেজ হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে, এবং বহুবার সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে, এরূপ অবস্থায় আপনি বলিলেন, তোমাদের কলেজ উঠাইয়াও দাও, আর আমি নির্ব্বিবাদে কলেজ উঠাইয়া দিব, ইহা হইতে পারে না। স্যর আশুতোষ এই কথা শুনিয়া রামেন্দ্রসুন্দরকে বলেন—বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইন কলেজ খুলিলে তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় আপনি কি পারিয়া উঠিবেন? একবার ভাবিয়া দেখুন।” তদুত্তরে রামেন্দ্রসুন্দর বলেন—“জীবনের জন্য সংগ্রাম

(struggle for existence) করিয়া দেখা যাউক, আত্মহত্যানীতি (suicidal policy) আমি মোটেই পছন্দ করি না। যদি সাধারণের সমবেদনা না পাই, কলেজ উঠিয়া যাইবে।"

১৯০৫ অব্দে কলেজের মালিক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর কয়েকজন অধ্যাপক এবং কতিপয় ভদ্রলোক লইয়া একটি পরিচালক সঙ্ঘের (Governing body) প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে রিপন কলেজে আই, এস্‌সি শ্রেণী খোলা হয়। উহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন (affiliation) লাভ করিবার জন্য যন্ত্রাগার ও অন্যান্য বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দর যেরূপ বর্ণনাতীত অক্লান্ত পরিশ্রম ও মস্তিষ্ক পরি-পরিচালনা করিয়াছিলেন, প্রত্যক্ষদর্শী ভিন্ন অপরে তাহা সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবে না।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটি trust-deed বা ন্যাসপত্র সম্পাদন করিয়া, ন্যাসরক্ষিস্বরূপ স্যর রাসবিহারী ঘোষ, স্যর সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ (লর্ড), ভূপেন্দ্রনাথ বসু, স্যর আশুতোষ চৌধুরী, লেপ্টনাণ্ট কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জে, চৌধুরী, এবং অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে নিযুক্ত করেন। অধ্যক্ষ ত্রিবেদী মহাশয় ঐ সমিতির (Board of Trustees) সেক্রেটরী বা সম্পাদক নিযুক্ত হন।

১৯০৮-১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাস হইতে মে মাস পর্য্যন্ত রিপন কলেজের পক্ষে একটি বিশেষ স্মরণীয় বৎসর। প্রবল ঝটিকাবর্ত্তসংক্ষুব্ধ স্রোতস্বতী জলে দারুণ তুফানের মধ্যে নৌকা পড়িলে তাহার অবস্থা যেরূপ সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে, এবং সুনিপুণ কর্ণধার কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া কৌশলে যেরূপ ভাবে নৌকাটি রক্ষা পায়, রিপন কলেজের অবস্থা ঐ সময়ে সেইরূপ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তৎকালে রামেন্দ্রসুন্দরের ন্যায় সুদক্ষ ব্যক্তি কর্ণধার

না থাকিলে, কলেজের পরিণাম কি হইত, তাহা সকলেই সহজে কল্পনা করিতে পারেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সলার স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক পি, কে, রায় মহাশয়ের সহিত রিপন কলেজের আইন বিভাগ পরিদর্শন করিতে আসিয়া বলিয়াছিলেন, Principal Trivedi is not a lawyer and does not attend the college during the morning hours. The teaching staff is underpaid. No library worth mentioning is in existence and there are evidences of a lamentable lack of order and discipline. অর্থাৎ অধ্যক্ষ ত্রিবেদী আইনের লোক নহেন, তিনি প্রাতঃকালে কলেজে উপস্থিত হন না, শিক্ষকবর্গ অল্প বেতন পান, উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব নাই, এবং শৃঙ্খলা ও সংযমের শোচনীয় অভাবের প্রমাণ আছে।

সেই কারণে জি, ডব্লিউ, কুকলার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভায় রিপণ কলেজের আইন বিভাগ উঠাইয়া দিবার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

একটা অনুকূল ঘটনাস্রোতে পড়িয়া রিপন কলেজের ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তন ঘটিল। সেই সময়ে স্যর এডওয়ার্ড বেকার বাঙ্গালা দেশের লেপ্টনাণ্ট-গবর্ণর হইয়া আসিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ও সুরেন্দ্রনাথের প্রার্থনা অনুসারে তিনি স্বয়ং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিলেন। লেপ্টনাণ্ট-গবর্ণর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ছিলেন। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কলেজ পরিদর্শন করিয়া সিণ্ডিকেট সভার মেম্বর ও তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর জি, ডব্লিউ, কুকলারকে বলিলেন—"কলেজ উঠাইয়া দেওয়া হউক বলিয়া আপনি সিণ্ডিকেটে প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু আমি কলেজ পরিদর্শন করিয়া সুখী হইলাম;

কলেজের সবই ভাল, কেবল লাইব্রেরীর অবস্থা অতি হীন; লাইব্রেরীতে Law Reports গ্রহণ করা হয় না।" দয়ালু লাট তারপর রিপন কলেজ লাইব্রেরীতে বোম্বাই, মান্দ্রাজ, এলাহাবাদ এবং কলিকাতার Law Reports ৬ প্রস্থ করিয়া প্রতি বার দিতে হইবে এই অনুরোধ করিলেন। লাট সাহেবের অনুরোধের ফলে রিপন কলেজ ৬ প্রস্থ করিয়া Law Reports পাইয়াছে, এবং এখন পর্য্যন্ত সেই ফল ভোগ করিয়া আসিতেছে। লাট সাহেবের পরিদর্শনের ফলে সেবার রিপন আইন কলেজ রক্ষা পাইল। রামেন্দ্রসুন্দরের অমানুষিক পরিশ্রম ও বুদ্ধিমত্তা গুণে ঐ শুভ সংযোগ ঘটিয়াছিল। ইহার পরেই ১৯০৯ খ্রীঃ হইতে জানকীনাথ আইন কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন, Art কলেজে তিনি পূর্ব্ববৎ অধ্যাপক রহিলেন।

অনেক মহারথী রিপন কলেজের অনিষ্ট সাধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। রিপন কলেজের আই, এ এবং আই, এস্‌সি শ্রেণীতে ইংরাজী, মাতৃভাষা, সংস্কৃত, পার্শী, ইতিহাস, তর্কশাস্ত্র, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, এবং বি, এ শ্রেণীতে ইংরাজী, সংস্কৃত, গণিত Pass এবং Honours (সাধারণ এবং বিশিষ্ট) পড়ান হইত; এতদ্ভিন্ন পার্শী, দর্শন, ইতিহাস, রসায়ন, অর্থনীতি ও রাজনীতি এই কয়টি বিষয়েরও অধ্যাপনা হইত। ব্রূন সাহেব সিণ্ডিকেট সভায় প্রস্তাব করিলেন যে, রিপন কলেজ আই, এ ও আই, এস্‌সি শ্রেণীতে মাত্র ইংরাজী, গণিত, সংস্কৃত, তর্কবিদ্যা এবং পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন, এবং বি, এ শ্রেণীতে ইংরাজী, সংস্কৃত, গণিত ও দর্শন সাধারণ (Pass) বিষয়ের অধ্যাপনা করিতে পারিবেন, এবং সমগ্র কলেজ মাত্র ৪৫০ জনের ঊর্দ্ধ সংখ্যক ছাত্র রাখিতে পারিবেন না। অবশ্য ঐরূপ ব্যবস্থায় রিপন কলেজ যে কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল তাহা সকলেই সহজে অনুমান করিবেন।

সিণ্ডিকেট সভা সুরেন্দ্রনাথের সহিত কলেজের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন, "That it seemed to imply the nullification of authorities, by no means calculated to guarantee a smooth and harmonious working of the mechanism of administration." অর্থাৎ ইহাদ্বারা কর্তৃপক্ষগণের ক্ষমতালোপের সম্ভাবনা আছে, এবং সুশৃঙ্খলরূপে কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য কোনরূপ নিশ্চয়তা নাই।

রামেন্দ্রসুন্দর তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "The body of trustees intended to appoint for the present Babu Surendranath Banerjee whose unique experience of the affairs of the institution rendered him indispensable at the present critical period of the histroy of the institution to guide and supervise the work of the college."

অর্থাৎ ন্যাসরক্ষকগণ কলেজের বর্ত্তমান সঙ্কট অবস্থায় কলেজের কার্য্য পরিদর্শন ও পরিচালনা করিবার জন্য তৎসম্বন্ধে একমাত্র অভিজ্ঞ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিয়োগ বর্ত্তমান সময়ে একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করেন।

সেই উত্তর পাইয়া সিণ্ডিকেট আর কোন আপত্তি করেন নাই। সে যাত্রা রামেন্দ্রসুন্দর সুরেন্দ্রনাথকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

ঐরূপ নানা প্রকার গোলযোগের সময় বোর্ড অব্ ট্রাষ্টীর সেক্রেটরীরূপে সিণ্ডিকেটের সহিত তাঁহাকে অনেক বাদানুবাদ করিতে হইয়াছিল।

সিণ্ডিকেটের সহিত নানারূপ গোলযোগ চলিতেছিল বলিয়া একটা মীমাংসা করিবার জন্য রামেন্দ্রসুন্দর জোগাড় করিয়া একটি সিণ্ডিকেট সভার অধিবেশন করেন ; সেই সভায় তিনি শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সুরেন্দ্রনাথ ও জানকীনাথ উপস্থিত

হইয়াছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের পূর্ব্ব চেষ্টার ফলে সিণ্ডিকেট রিপন কলেজকে কতকগুলি সুবিধা প্রদান করিলেন; কিন্তু কলেজগৃহে স্থানাভাব বশতঃ ৫৬০ জনের অধিক ছাত্র রাখিবার অনুমতি দিলেন না। ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইলে স্থান বাড়াইতে হইবে, সুতরাং একটা বড় বাড়ী প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন ছিল; রামেন্দ্রসুন্দর ও সুরেন্দ্রনাথ কলেজের জন্য একটা নূতন বাড়ী প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় অচিরেই অর্থ সংগৃহীত হইল।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে আগষ্ট বঙ্গের লাট স্যর এডওয়ার্ড বেকার রিপন কলেজের নূতন বাড়ীর ভিত্তি স্থাপন করেন। সংগৃহীত অর্থে মার্টিন কোম্পানী রিপন কলেজ এবং স্কুলের জন্য দুইটি বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে কলেজ নূতন বাড়ীতে উঠিয়া আসিল। এতদিন ধরিয়া কলেজের নিজের বাড়ী ছিল না, ভাড়াটিয়া বাড়ীতে কলেজ ছিল। নূতন বাড়ীতে স্থানাভাব হইল না। সেই বৃহৎ বাড়ীতে দুইটি প্রকাণ্ড যন্ত্রাগার স্থাপন করা হইল। সিণ্ডিকেট সভার আর কোন আপত্তি করিবার কারণ রহিল না। সুতরাং ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া ৫৬০ স্থলে ১২০০ হইল। প্রতি বৎসরই সংখ্যা বাড়িতে লাগিল; শেষে রামেন্দ্রসুন্দরের জীবৎকালে কিঞ্চিন্ন্যূন দুই সহস্রে উঠিয়াছিল। নূতন বাড়ীতে আসিয়াই বি, এ অনার্স শ্রেণীতে গণিত এবং সংস্কৃতের অধ্যাপনা করিবার ব্যবস্থা হইল। তাহার পর বিশেষ উদ্যোগ আয়োজনের ফলে বি, এস্‌সি শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা করা হয়। যতদিন উহা ছিলনা, ততদিন বি, এ শ্রেণীতে কেবল রসায়ন পড়ান হইত, পদার্থ বিদ্যা পড়াইবার অনুমতি ছিল না।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে রামেন্দ্রসুন্দর কলেজে বি, এস্‌সি শ্রেণী খুলিবার সম্মতি পান নাই; তদবধি তিনি মনের মধ্যে একটা দারুণ ব্যথা

অনুভব করিতেন। তিনি একটা দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যে উপায়ে হউক উহা করিতেই হইবে; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত বিধি অনুসারে সেই বিপুল ব্যয়সাধ্য ব্যাপার সাধন করিতে পারেন নাই। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে বহু সাধনার পর বি, এস্‌সি শ্রেণী খুলিবার অনুমতি পাইলেন। দশ বৎসর পরে তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল। তৎপূর্ব্বে সর্ব্বদাই তাঁহার মনে হইত কলেজের একটা অঙ্গহানি হইয়া রহিয়াছে।

যতদিন কলেজে বি, এস্‌সি শ্রেণী ছিল না, ততদিন প্রিন্সিপাল রামেন্দ্রসুন্দর বি, এ শ্রেণীতে রসায়ন পড়াইতেন। কিন্তু যখন বি, এস্‌সি শ্রেণী খোলা হইল, তখন হইতে তিনি রসায়ন অধ্যাপনার ভার অপর অধ্যাপকের হস্তে অর্পণ করিয়া স্বয়ং পদার্থবিদ্যা পড়াইতে আরম্ভ করেন, এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত উহাই তাঁহার অধ্যাপনার বিষয় ছিল।

কলেজের উন্নতি সাধনের জন্য রামেন্দ্রসুন্দর প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন; রিপন কলেজের প্রতি তাঁহার কিরূপ প্রগাঢ় মমতা জন্মিয়াছিল, নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি হইতে পাঠকবর্গ তাহা অবগত হইতে পারিবেন।

এক সময় কাশিমবাজারের মহারাজ তাঁহাকে বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। রিপন কলেজের স্বল্পতর বেতনের পরিবর্ত্তে উচ্চতর বেতন লাভের আশায় তাঁহার জন্মভূমির সন্নিকট বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষপদ তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি মহারাজকে বলিয়াছিলেন, "এই রিপন কলেজের জন্য আমি অনেক পরিশ্রম ও বুদ্ধিব্যয় করিয়াছি, বহু সংগ্রাম করিয়া বহু চেষ্টার পর এক্ষণে কলেজটিকে কোন রকমে দাঁড় করাইয়াছি, এখন এই কলেজের প্রতি আমার এতই মমতা জন্মিয়াছে যে, ইহাকে কোন প্রকারে পরিত্যাগ করিতে পারি না।"

রামেন্দ্রসুন্দর যখন পার্শীবাগান লেনের ১২নং বাড়ীতে বাস করিতেন,

তখন সম্মুখের বাড়ীতেই National College ছিল, তাহার কর্ত্তৃপক্ষগণ রামেন্দ্রসুন্দরকে উচ্চতর বেতন দিয়া ঐ কলেজে লইয়া যাইবার ইচ্ছায় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"আপনার কোন কষ্ট হইবে না, সম্মুখেই কলেজ, ঘরে বসিয়াই সকল কাজ করিতে পারিবেন।" রামেন্দ্রসুন্দর ঠিক পূর্ব্বোক্তরূপ আপত্তি করিয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার কালে শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য মহাশয় তাঁহাকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে লইয়া যাইবার বাসনা প্রকাশ করেন। রামেন্দ্রসুন্দর ঐ একরূপ উত্তর দিয়া তাঁহাকেও নিরস্ত করিয়াছিলেন।

অধ্যাপনার সময় তিনি কোন দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক অনুসরণ করিতেন না। তাঁহার চিরদিনের অভ্যাস মত তিনি স্বমতে পড়াইবার একটা নির্দ্দিষ্ট প্রণালী স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। পড়াইতে আরম্ভ করিলে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান রহিত হইত; ৫০ মিনিটে ঘণ্টা, সময় পরিবর্ত্তনসূচক ঘণ্টাধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত না, কোন কোন দিন এক ঘণ্টার স্থলে তিন ঘণ্টাও পড়াইতেন। তিনি বলিতেন, "এ সব বিষয়ে কেবল চেয়ারে বসিয়া ঘণ্টা ধরিয়া পড়ান চলে না, কারণ একটা দুরূহ বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে, তাহা ঠিক মাপ করিয়া বুঝান যায় না, বক্তব্য বিষয়গুলি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশদভাবে প্রকাশ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।"

যে সকল ছাত্র, তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়া বি, এ এবং বি, এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম, এ এবং এম, এস্‌সি পড়িতে যাইত, তাহাদিগকে অধিক মাত্রায় পরিশ্রম করিতে হইত না। প্রিন্সিপাল ত্রিবেদী মহাশয়ের নিকট শিক্ষালাভ করিলে ছাত্রগণ ঐ সুবিধাটি প্রাপ্ত হইত।

প্রেসিডেন্সি কলেজে এম্, এ পড়াইবার সময় অধ্যাপকগণের মনে

সমস্যা উপস্থিত হইলে, রিপন কলেজ হইতে সমাগত ছাত্রগণ সময়ে সময়ে তাঁহাদের সেই সমস্যাগুলি মীমাংসা করিয়া দিতেন। অধ্যাপকগণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন—"তোমরা কোন্ কলেজ হইতে গ্র্যাজুয়েট হইয়াছ?" ছাত্রগণ উত্তরে রিপণ কলেজের নাম করিলে অধ্যাপকগণ ভক্তিভাবে বলিতেন, Principal Trivedi's pupil. রামেন্দ্রসুন্দরের পড়াইবার প্রণালী এক অদ্ভুত রকমের ছিল। যে কোন জটিল সমস্যা উপস্থিত হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার মীমাংসা করিয়া ঠিক জলের ন্যায় তরল ও সরল করিয়া গল্পের ছলে তাহা ছাত্রদিগের গলাধঃকরণ করিয়া দিতেন; কোন ছাত্রকে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইত না; অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণ তাহা অভ্যাস করিয়া লইত। তাঁহার অধ্যাপনা শুনিবার জন্য অন্য কলেজের অনেক ছাত্র গোপনভাবে আসিয়া ক্লাসে বসিত।

অধ্যাপকরূপে রামেন্দ্রসুন্দর ছাত্রদের সহিত খুব মিশিতেন। বিচার বিষয়ে তিনি ন্যায়ের অবতার স্বরূপ ছিলেন। অন্যায়কারীকে প্রশ্রয় দেওয়া তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তিনি তুলাদণ্ডে বিচার করিতেন, অন্যায়কারী ছাত্রকে তিনি দণ্ডিত করিতেন, সে বিষয়ে কাহারও অনুরোধ রক্ষা করা তিনি ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিতেন না।

কলেজের কর্ত্তা সুরেন্দ্রনাথের পুত্র শ্রীভবশঙ্কর যখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেন, তখন এক দিন তিনি ছাত্রসমাজের মধ্যে কোন অধ্যাপককে অমান্য করিয়াছিলেন; সেই সমাচার প্রিন্সিপালের কর্ণগোচর হইলে তিনি আদেশ করিলেন,—"He must submit an unqualified apology to the professor in the class, unless he will be marked absent, and promotion to the next higher class will be stopped". অর্থাৎ তিনি বিনা ওজরে দোষ স্বীকার করিয়া ছাত্রসমাজের সমক্ষে অধ্যাপকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করুন,

নতুবা তিনি অনুপস্থিত বলিয়া গণ্য হইবেন, এবং পরবর্ত্তী উচ্চতর শ্রেণীতে তাঁহার উন্নয়ন স্থগিত হইবে।

ভবশঙ্কর কয়েকদিন অনুপস্থিত থাকার পর বার্ষিক পরীক্ষা দিতে আসিলেন; কিন্তু পরীক্ষা দিতে অনুমতি না পাইয়া, তিনি পিতার নিকট চলিয়া গেলেন। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের কর্ম্মচারী রাজেন্দ্রনাথের হাত দিয়া সেই রাত্রিতে রামেন্দ্রসুন্দরের নিকট একখানি চিঠি পাঠাইলেন। রামেন্দ্রসুন্দর সেই চিঠির উত্তরে সুরেন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন, 'কলেজের নীতিরক্ষা বিষয়ের উপায় বিধান করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আমার, আপনি ছাত্রের অভিভাবক, এ স্থলে অভিভাবকরূপে আমাকে চিঠি লেখা উচিত ছিল, অন্যভাবে লেখা আপনার উচিত হয় নাই, আমি সেই কারণে পদত্যাগ করিলাম, এবং Governing Bodyর সেক্রেটারীকে সেই মর্ম্মে পত্র দিলাম, তাহাতে একটা অতিরিক্ত সভার আহ্বান করিয়া আমার স্থলে নূতন প্রিন্সিপাল নিযুক্ত করিবার কথাও উল্লেখ করিয়াছি।' সুরেন্দ্রনাথ সেই পত্রখানি পাইয়াই জানকীনাথ, ক্ষেত্রনাথ প্রভৃতি প্রধান অধ্যাপকগণকে সঙ্গে লইয়া ৮নং মধুসূদন গুপ্ত লেনে রামেন্দ্রসুন্দরের বাড়ীতে উপস্থিত হন, এবং পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করিবার জন্য অতি বিনীতভাবে অনুরোধ করেন। রামেন্দ্রসুন্দর সকলের সম্মিলিত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। অতঃপর ভবশঙ্কর পরীক্ষাগৃহে ছাত্র-সমাজের সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে সেই অধ্যাপকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। এই একটি ঘটনা নহে, দৃষ্টান্তস্বরূপ মাত্র একটি ঘটনার উল্লেখ করিলাম। ঐরূপ ভূয়োভূয়ঃ অনেক ঘটনা তাঁহার সময়ে ঘটিয়াছিল। তিনি সকল ক্ষেত্রেই নিজের দৃঢ়তার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

ঐ সম্বন্ধে যে সকল পত্র লিখিত হইয়াছিল, তাহাদের অনুরূপ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

70, Colootola Street,
Calcutta. 6-4-10.

My Dear Ramendra Babu,

I hear Sankar has been excluded from the examination for not having read the apology in the class. He was absent on Monday, and if I had any suspicion that he was deliberately defying orders, I should have insisted on his going to college and reading out the apology in the class. I believe this is the view you take, and you may be right. But as he has already been excluded from the examination, may I request you allowing him to appear at the other examinations, it being clearly understood that he will read out the apology in the class. Kindly send a line per bearer.

Yours sincerely,
(Sd.) Surendranath Banerjee.

8, Madhusudan Gupta Lane,
6-4-10.

Dear Sir,

It is I believe more than a fortnight that Sankar committed the offence, and was asked by me to apologise. I have no doubt that he had been deliberately trifling with my orders. I have waited long enough to

afford him an opportunity for expressing regret for his conduct, but his attitude and entire demeanour have been improper all the while. He cannot be allowed to sit for the other examinations, but I shall give him opportunity of promotion to the Second Year class by subjecting him to a fresh examination after the summer vacation, provided he expresses suitable contrition for his mis-behaviour and is sincere in his repentance.

Yours sincerely,
(Sd.) Ramendrasunder Trivedi.

70, Colootola Street,
Calcutta. 9-4-10.

My Dear Ramendra Babu,

Of course your orders will be carried out and Sankar will not appear at the examination. But I must be permitted to express my regret that you did not mention to me this persistent disregard of order and your decision not to allow Sankar to appear at the examination in case he did not read out the apology. Being his guardian and in daily contact with you I think I had some claim to this information. You know perfectly well that I have always been on the side of discipline, and in your presence and at home had reprimanded Sankar severely for his conduct. He had promised to me to

read out the apology. If you had fixed a date for this purpose and mentioned it to me as a matter of courtesy that could have avoided all difficulties.

Yours sincerely,
(Sd.) Surendranath Banerjee.

8, Madhusudan Gupta Lane,
7th April 10.

Dear Sir,

The letter that I have just received, has come to me as a painful surprise. I had not the remotest idea that my conduct in the capacity in which you were kind enough to place me would have anything but your hearty support. Nothing would give me greater pain than to forfeit in any way the trust and confidence that you have always placed in me, and it will be the greatest happiness of my life to cherish the memory of the long years of my official association with yourself with feelings of gratitude and unalloyed pleasure. I have devoted the best, and in more sense than one, the happiest portion of my life in helping you to the best of my ability in the great educational work which is certainly not the least of your many claims upon the gratitude of your countrymen among whom I am proud to count myself as one, and I shall remain thankful to the end of

my days for the uniformly kind treatment which it has been my good fortune to recieve from you. Permit me to hope that the same kindness will be extended to me in whatsoever sphere of life it may be my lot to be thrown.

I have placed my resignation in the hands of Haran Babu, the secretary of the College Council and asked him to convene an emergency meeting of the Council at which, I hope, my presence will be excused.

Yours sincerely,

(Sd.) Ramendrasunder Trivedi

70, Colootola Street,
Calcutta. 8-4-1910

My Dear Ramendra Babu,

I must be permitted to express my surprise at your having tendered your resignation, and my deep sorrow that I should apparently have been the occasion for it. I trust that I have not offended your feelings in any way and I can assure you that I did not in the smallest degree intend to do so. I have in no way forfeited the trust and confidence I have always put in you, and you will remember with what strenuousness I opposed your proposal to resign a few months ago. There may be and sometimes are differences of opinion between

colleagues for which there must be mutual charity and forbearance. I earnestly beg that you will withdraw your resignation, for it would be to me a matter of painful reflection that I should have been the means of terminating a connection which has been to both of us, I trust a source of unalloyed pleasure. Your letter is so full of personal kindness to me that I am encouraged to hope that you will accede to my request ; for it would be to me a matter of unspeakable personal regret to part with a friend and colleague so true, so trusted and so devoted to the interests of the college, and that owing to anything I may have written.

I propose to see you today at your house between 12 and 1 P. M. and have a talk about this matter,

I hope you will be in.

Yours sincerely,

(Sd.) Surendranath Banerjee

কলেজের ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার বাড়ীতে কোন অভিযোগ করিতে গেলে, তিনি বলিতেন—"তোমাদের অভিযোগের সুবিচার করিব বটে, কিন্তু তোমাদের যথারীতি আবেদন করিতে হইবে ; বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া এরূপ ভাবে সোজাসুজি আবেদন করিলে, আমি তোমাদের অভিযোগে কর্ণপাত করিব না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হাত দিয়া অভিযোগ পত্র পাঠাইতে হইবে, তাঁহার স্বাক্ষরিত অভিযোগ পত্র আমার হস্তগত হইলেই আমি তদ্দণ্ডে তাহার প্রতিকার বা মীমাংসা করিয়া দিব।"

একদা রিপন কলেজ ছাত্রাবাসে ছাত্রদের মধ্যে একটা জাতিগত বিরোধের সৃষ্টি হয়। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার মীমাংসা করিতে পারেন নাই। সেই বিদ্বেষ ক্রমশঃ প্রবল ভাব ধারণ করিয়া শেষে শত্রুতায় পরিণত হইল; ব্যাপার গুরুতর হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় সকল বিবরণ প্রিন্সিপাল মহাশয়ের গোচরে আনিলেন।

প্রিন্সিপাল মহাশয় উভয় দলের ছাত্রদের আহ্বান করিয়া তাহাদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়া শুনিলেন, পরে তাহাদিগকে মৃদু ভৎ‍র্সনা করিলেন, এবং বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্য একটা দিন স্থির করিয়া দিয়া বলিলেন—"ইতিমধ্যে সকল ছাত্রকেই শান্তভাবে দিনপাত করিতে হইবে, যদি কেহ কোনরূপ গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়া শান্তিভঙ্গের আয়োজন করে, তাহা হইলে তাহাকে গুরুতর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।" বলা বাহুল্য সে কয়টা দিন তাঁহার আদেশমত ছাত্রগণ শান্ত ভাবেই কাটাইয়া দিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রিন্সিপাল মহাশয় দলের অগ্রণীদিগকে আহ্বান করিলেন, এবং আগামী রবিবারে তাহাদের সহিত মেসে মধ্যাহ্নকালে একত্র বসিয়া আহার করিবেন, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন; ছাত্রগণ প্রিন্সিপাল মহাশয়ের প্রস্তাবে পরম আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিল, এবং নানাবিধ আহার্য্যের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইল। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার বালক দৌহিত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া যথাসময়ে উপস্থিত হইলেন; তিনি সকলের মধ্যস্থলে আসন গ্রহণ করিলেন, তাঁহার দুই পার্শ্বে দুই দল ছাত্র উপবেশন করিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া যে সকল ছাত্র একত্র আহার করিতে আপত্তি করিত, এক্ষণে তাহারা বিনা বাক্যব্যয়ে প্রিন্সিপাল মহাশয়ের পার্শ্বে বসিয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। আহার করিতে করিতে প্রিন্সিপাল মহাশয় তাহাদিগকে মিষ্ট বাক্যে

কয়েকটি উপদেশ প্রদান করিলেন, "আমরা হিন্দু যাহাদের সহিত একত্র বসিয়া আহার করিব, তাহাদের সহিত কোনরূপ মনোমালিন্য রাখিতে পারি না, পূর্ব্বাচরণ বিস্মৃত হইয়া প্রাণ খুলিয়া বন্ধুভাবে তাহাদের বক্ষে ধরিয়া আলিঙ্গন করিব। সাম্প্রদায়িক বিরোধ লইয়া হিন্দুর সন্তান কখনও রক্তপাতে প্রবৃত্ত হয় নাই, হিন্দুর গ্রামে গ্রামে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া বহু সম্প্রদায়ের লোক বিরাজ করিতেছে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিরোধের জন্য রক্তপাতের কথা ইতিহাসে কোথাও দেখিতে পাইবে না, তোমরা হিন্দুর সন্তান তিতিক্ষাপরায়ণ হইতে অভ্যাস কর, হিন্দুর পবিত্র নামে কলঙ্ক আরোপ করিও না; হিন্দু নামের গৌরব তোমরা রক্ষা করিতে পারিবে কি?" অতঃপর উভয় দলের ছাত্রগণ যুক্তকরে প্রিন্সিপালের নিকট তাহাদের লজ্জাজনক আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া সরল অন্তঃকরণে বলিল—"আমরা আমাদের পূর্ব্বকৃত আচরণের কথা স্মরণ করিয়া এক্ষণে লজ্জাবোধ করিতেছি, আমাদের মনের মধ্যে আর কোন গোলযোগ নাই।" ছাত্রদের মনের ভাব উপলব্ধি করিয়া প্রিন্সিপাল মহাশয় সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। অত বড় বিবাদটার কয়েকটা কথাতেই নিষ্পত্তি হইয়া গেল। ছাত্রদের মনে ব্যথা দিয়া কঠোর হস্তে তাহাদের শাসন করিবার ব্যবস্থা তিনি সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই। তাঁহার আচরণে ছাত্রগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি অত্যধিক ভক্তি প্রকাশ করিয়াছিল।

যদি কোন ছাত্র দণ্ডাদেশ পরিবর্ত্তন করিবার অভিপ্রায়ে তাহার অভিভাবক কিংবা রামেন্দ্রসুন্দরের কোন আত্মীয় বা বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাড়ীতে অনুরোধ করিতে যাইত, তাহাতে সেই ছাত্রের দণ্ডের লাঘব হইত না, বরং অবস্থা বিশেষে সময়ে সময়ে দণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধিই পাইত। রামেন্দ্রসুন্দর বলিতেন, "যে সকল হতভাগ্য ছাত্রের অনুরোধ করিবার কেহ

নাই, তাহাদের গতি কি হইবে ?" ছাত্রেরা নিজে তাঁহার নিকট গিয়া কান্নাকাটা করিলে তিনি দয়া করিতেন। ছাত্রদের মধ্যে বিরোধ বাধিলে তিনি নিজে তাহাদের ক্লাসে গিয়া নানাবিধ নীতিপূর্ণ সদুপদেশ দিয়া এবং মৃদু ভৎ‍‍সনা করিয়া বিবাদ সুন্দররূপে ভঞ্জন করিয়া দিতেন, তাহারা পুনরায় সৌহার্দ্দ্যসূত্রে আবদ্ধ হইত। ছাত্রেরা তাঁহাকে দেবতার ভক্তি করিত এবং যমের ন্যায় ভয় করিত।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে রামেন্দ্রসুন্দর কলেজে একটি অধ্যাপকসঙ্ঘ স্থাপিত করিয়া অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে তাহার সম্পাদক নির্ব্বাচিত করেন। সেই অধ্যাপক-সমিতিতে অধ্যাপকগণ প্রবন্ধ পাঠ ও নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন। অধ্যাপকগণের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যালোচনায় প্রবৃত্তি এবং প্রবন্ধরচনাশক্তি উন্মেষিত করিবার জন্য তিনি সকলকে বিশেষ ভাবে উৎসাহ দিতেন, এবং সেই প্রবৃত্তির পরিবর্দ্ধন সাধনোদ্দেশে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে Ripon College Magazine নামক একখানি সাময়িক পত্রের প্রচলন করেন। তাঁহারই উৎসাহে সেই পত্রিকায় ছাত্র ও অধ্যাপকগণ ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় নানাবিধ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের নিকট অধ্যাপকদিগের মধ্যে প্রাচীন এবং নবীন বলিয়া কোন প্রভেদ ছিল না, সকলকেই তিনি সমান ভাবে ভালবাসিতেন এবং স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। কখন কোন অধ্যাপকের বিরুদ্ধে তাঁহার নিকট অভিযোগ উপস্থিত হইলে তিনি সেই অধ্যাপককে তাঁহার বাড়ীতে সাক্ষাৎ করিতে বলিতেন, এবং তথায় বিশেষ ভদ্র ভাবে ভাল করিয়া তাঁহাকে তাঁহার দোষের বিষয় বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার উপদেশের প্রতিকূলে কোন অধ্যাপকই কোন আপত্তি করিতে পারিতেন না, অবনত মস্তকে উহা গ্রহণ করিতেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি রামেন্দ্রসুন্দর সকল অধ্যাপককেই প্রবন্ধাদি রচনার জন্য উৎসাহ দিতেন। তিনি তাঁহার বাড়ীতে নূতন ব্রতী অধ্যাপকদিগের লিখিত প্রবন্ধাদির আলোচনা করিতেন, এবং যাহাতে তাঁহাদের উৎসাহবর্দ্ধন হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। অধ্যাপক স্বর্গীয় ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সের মধ্যে প্রবন্ধ লেখকরূপে কোন দিন আত্মপরিচয় দেন নাই। কিন্তু শেষে রামেন্দ্রসুন্দরের উৎসাহক্রমে সেই লোকের লেখনী হইতে "অভয়ের কথা" ও "ঠাকুরাণীর কথার" ন্যায় অমূল্য বস্তু বাহির হইয়াছিল। যদি ক্ষেত্রনাথ অকালে ইহলোক ত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে তিনি বঙ্গজননীর সাহিত্য-ভাণ্ডারে অনেক নূতন দুর্লভ রত্ন উপহার দিতেন, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ইতিহাসের অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয়ও রামেন্দ্রসুন্দরের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া "বিচিত্র প্রসঙ্গ" প্রভৃতি গ্রন্থসকল প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন আরও অনেক অধ্যাপক নানা বিষয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়া অনেক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারই প্রযত্নে আজি অনেকেই সুলেখক বলিয়া বাঙ্গালার সাহিত্যসমাজে পরিচিত।

কলেজ যখন নূতন বাড়ীতে উঠিয়া আসে, তখন কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ অধ্যক্ষ মহাশয়ের জন্য একটা স্বতন্ত্র বসিবার ঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, রামেন্দ্রসুন্দর তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন—"ওরূপ ব্যবস্থা আমি সহ্য করিতে পারিব না, আন্দামান দ্বীপে নির্ব্বাসিত হইয়া একাকী বাস করিতে আমি প্রস্তুত নহি, আমার অঙ্গ হইতে প্রিন্সিপালগিরি খুলিয়া লও, আমি সকল অধ্যাপকের মধ্যে অবস্থান করিয়া তাঁহাদিগের সহিত সর্ব্বদা আলাপ করিব, জীবনে ইহাই আমার বাঞ্ছনীয়।"

রামেন্দ্রসুন্দর সকলকে স্নেহের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। কলেজে মধ্যে মধ্যে জলযোগের ব্যবস্থা হইত, তিনি সকলের সঙ্গে বসিয়া যাহা

হউক সামান্য কিছু আহার করিতেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য আহারে অক্ষম হইলে তিনি উপস্থিত থাকিয়া নানা রহস্যালাপ করিয়া সকলের উৎসাহ ও আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। অধ্যাপকসমাজ তখন প্রাণময় ছিল—তাহাতে সামাজিকতার সুখ ছিল। সেই সুখের আবরণে কঠোর দাসত্ব প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিত। এখন সেই প্রাণ চলিয়া গিয়াছে। বিগত-জীবন সমাজের অস্থিপঞ্জরগুলা এখন বিচ্ছিন্নভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

কলেজের সকলেই একবাক্যে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, ষোল বৎসরকাল অধ্যক্ষরূপে তিনি যে সহৃদয়তা, উদারতা, সাময়িকতা, কর্ম্মপটুতা এবং সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অন্যের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। তাঁহার অধ্যক্ষতাকালে কলেজের অবস্থা দিন দিন উন্নতির পথে ধাবিত হইয়াছিল। কোন একজন অধ্যাপক কলেজের পূর্ব্বতন অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত কলেজসংক্রান্ত অনেক বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। কলেজের উন্নতির কথা শুনিয়া কৃষ্ণকমল বাবু রহস্যের ছলে বলিয়াছিলেন, "এখন কলেজ ভাল হইবে না কেন? পূর্ব্বে ইহা খোলাঝাড়া ভট্টাচায্যির অধীনে ছিল, এখন জমিদার ও রাজজামাতার হাতে পড়িয়াছে, তাঁহার নামেতেই সব হয়, তিনি তিন যুগের মহাকবিদের নায়ক—বাল্মীকির রাম, বেদের ইন্দ্র ও কলির ভারতচন্দ্রের সুন্দর। তাঁহার সহিত আমার তুলনা হয় না।" জ্ঞানে বিদ্যায় ও বুদ্ধিমত্তায় কৃষ্ণকমলের সমকক্ষ যে কয়জন বঙ্গসন্তান বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত বিরল। সেই জ্ঞানবৃদ্ধ প্রবীন আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় মুক্তকণ্ঠে রামেন্দ্রসুন্দরের গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে কলেজের যন্ত্রাগারের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল; ঐ সময় হইতে উহার উন্নতি সাধনের জন্য রামেন্দ্রসুন্দরের মনোযোগ

আকৃষ্ট হয়। তিনি কর্তৃপক্ষদিগের সহিত অনেক তর্কবিতর্ক এবং সাধ্যসাধনা করিয়া বহুবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ইংলণ্ড এবং জর্ম্মনী দেশ হইতে আনয়ন করিবার উপায় করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে নূতন বাড়ীতে কলেজ উঠিয়া আসিলে, তিনি বহু পরিশ্রম এবং মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়া গ্রন্থাগার এবং যন্ত্রাগারের কলেবর বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার ঐকান্তিক অধ্যবসায় ও চেষ্টার ফলে অল্প কালের মধ্যে উহাদের যথেষ্ট উন্নতি হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, আনন্দ-কৃষ্ণ সিংহ ও দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়দিগকে গ্রন্থাগারের উন্নতি সাধনের জন্য তিনি নিযুক্ত করেন, এবং তিনি বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপকগণকে লইয়া যন্ত্রাগারের সুব্যবস্থা করিতে যত্নবান্ হন। গ্রন্থাগার ও যন্ত্রাগারের কার্য্য পরিচালনার ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি প্রত্যহ অতিরিক্ত দুই ঘণ্টাকাল পরিশ্রম করিতেন। স্বর্গারোহণের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্জ্জন এক য়ুনিভারসিটী কমিশন বসান। সেই কমিশনের পক্ষ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চেন্সলার সার টি, র‍্যালে, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেন্সলার রেভারেণ্ড ডাক্তার এম, ম্যাকিচান, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আলেকজাণ্ডার পেড্‌লার, সার জন, হিউএম, এবং আর নেথান প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি রিপন কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। যন্ত্রাগারের সেই শোচনীয় অবস্থার দিনেও রামেন্দ্রসুন্দর চেষ্টা করিয়া অতি সুন্দরভাবে তাহাকে সজ্জিত করিয়াছিলেন; তাঁহার সুব্যবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া, কমিশন সন্তোষ প্রকাশ করেন, এবং তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করেন।

ঐ ঘটনার কয়েক বৎসর পরে ভারত গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হাত দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমূহকে অর্থ দান করেন।

স্বাধীন কলেজসমূহকে স্ববশে আনিবার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট অর্থদানের অভিপ্রায় করিয়াছেন ভাবিয়া রামেন্দ্রসুন্দর ঐ সময়ে যথেষ্ট তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধে রিপন কলেজ ঐ দান লইতে সম্মত হয় নাই; সিটি এবং রিপন কলেজ ব্যতিরেকে বাঙ্গালা দেশের সমস্ত কলেজই ঐ দান গ্রহণ করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর ও বঙ্গবাসী কলেজ ঐ দান গ্রহণ করিয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিল। তিন বৎসর পরে সিটি কলেজও দান লইতে আরম্ভ করে; কিন্তু রিপন কলেজ বহুদিন নিজের সঙ্কল্প স্থির রাখিয়াছিল; পরে নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে কলেজ ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে, এবং গ্রন্থাগার ও যন্ত্রাগারের উন্নতি সাধন করিতে বিস্তর অর্থব্যয় হওয়ার জন্য ভাণ্ডার শূন্য হয়; সেই বিপন্ন অবস্থায় ৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আত্মরক্ষাকল্পে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রিপন কলেজ গবর্ণমেণ্ট দত্ত দান লইতে আরম্ভ করে।

রামেন্দ্রসুন্দর গুণগ্রাহী ছিলেন। কোন গুণী ব্যক্তির সন্ধান পাইলে তাঁহাকে যে কোন প্রকারে হউক সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তিনি রিপন কলেজের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিতেন। যখন কলেজের আইন বিভাগ স্বতন্ত্র হইল, তখন কর্ত্তৃপক্ষগণ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত পি, চৌধুরীকে আইন কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। জানকীনাথের ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তিকে সামান্য বেতনে কলেজে বাঁধিয়া রাখা কঠিন বলিয়া রামেন্দ্রসুন্দর বিশেষ চেষ্টা করিয়া পরে জানকীনাথকেই আইন কলেজের অধ্যক্ষপদে স্থায়ী করিলেন, এবং চিরজীবনের জন্য তাঁহাকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলেন। ন্যাশনাল কলেজ ভাঙ্গিয়া গেল দেখিয়া তিনি সেখান হইতে পণ্ডিত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, জগদিন্দু রায় প্রভৃতি মনীষিগণকে রিপন কলেজে লইয়া আসিলেন। স্বনামধন্য গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে তিনি এমন স্নেহডোরে আবদ্ধ করিলেন যে, তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য কোথাও

উন্নতির চেষ্টায় যাইতে পারিলেন না। রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয় এক সময়ে রিপন কলেজ ত্যাগ করিয়া গবর্ণমেন্ট কলেজে অধ্যাপনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, শেষে তিনি রামেন্দ্রসুন্দরের গুণে মুগ্ধ হইয়া রিপন কলেজে ফিরিয়া আসিলেন। ডাক্তার ডি, এন, চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া রামেন্দ্রসুন্দর কলেজের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন। ক্ষেত্রনাথ ইহলোক ত্যাগ করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ন শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষকে মায়াজালে জড়াইয়া কলেজকে শ্রীসম্পন্ন করিলেন; দেবপ্রসাদ এখন পর্য্যন্ত সেই মায়া কাটাইতে পারেন নাই।

রিপন কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয় বলিয়াছেন—"প্রথম আলাপের পর নানাস্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইত, সর্ব্বত্রই তাঁহার স্নেহসম্ভাষণ লাভ করিতাম, কিন্তু ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হইল যখন আমি রিপন কলেজে অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করিলাম। তৎপূর্ব্বে সভা সমিতিতে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছি, তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াছি, কিন্তু রিপন কলেজে আসিয়া তাঁহার যে পরিচয় পাইলাম, তাহাতে অভিভূত হইয়া গেলাম।

"আমি জানিতাম প্রচলিত যন্ত্রবদ্ধ শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি তাঁহার মোটেই আস্থা ছিল না; অথচ তিনি রিপন কলেজটিকে কেন এত প্রাণের বস্তুর মত আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, তাহা আমি বাহির হইতে বুঝিতাম না। ভিতরে আসিয়া সে রহস্যের সন্ধান পাইলাম। দেখিলাম কলেজের যে দিক্‌টা যন্ত্রধর্ম্মী, সে দিক্‌টা তিনি যন্ত্রবৎই পরিচালনা করিয়া যাইতেন। কিন্তু ইহার সবটাই ত যন্ত্র নহে; যন্ত্রের মধ্যে যে কতকগুলি জীবন্ত মানুষ শিক্ষক ও ছাত্র নাম লইয়া আসিয়া ধরা দিয়াছে। তাঁহার আসল কারবার ছিল সেই প্রাণসমষ্টি লইয়া। ছাত্রসংখ্যা অপরিমেয়, সুতরাং তাহাদের

সকলের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ পাতান অসম্ভব; তথাপি যে অল্প কয়েকটি ছাত্র বি, এস্‌সি, ক্লাসে তাঁহার বিজ্ঞানব্যাখ্যান শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিত, তাহাদের অধিকাংশের সহিতই তিনি আত্মীয়তা স্থাপন করিতেন। তিনি যে বঙ্গ ভাষায় অধ্যাপনা করিতেন তাহার প্রধান কারণ এই যে, বিদেশী ভাষার কৃত্রিম আবরণের মধ্য দিয়া যন্ত্রের কার্য্য চলিতে পারে, কিন্তু প্রাণের কারবার চলে না। তাঁহার নিকট প্রাণের কারবার ছিল, সেখানে তিনি যন্ত্রনীতির অধিকার স্বীকার করিতেন না। তাঁহার বিজ্ঞান শ্রেণীর বাহিরে যে অগণিত ছাত্র ছিল, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন অসম্ভব ব্যাপার হইলেও তিনি অনেক স্থলে পরিচয়ের সুযোগ খুঁজিতেন। এই ব্যাপার তাঁহার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক ছিল। ছাত্রেরা কলেজে অধ্যক্ষের নিকট যে সকল আবেদন করে, অধিকাংশ কলেজেই সেই আবেদনপত্রগুলি অফিসের হাত দিয়া অধ্যক্ষের হাতে পৌঁছায়। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর নিয়ম করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক ছাত্র নিজ নিজ আবেদনপত্র হাতে লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবে, এবং প্রত্যেকের সঙ্গে কথা কহিয়া তিনি বিচার মীমাংসা করিবেন। ইহার ফলে এই দাঁড়াইত যে, প্রত্যহ অপরাহ্ণে যখন তিনি ঘরে আসিয়া আসন গ্রহণ করিতেন, তখন সে ঘরে ছাত্রের ভিড় লাগিয়া যাইত। কিন্তু ইহাতে তাঁহার কিছুমাত্র বিরক্তি ছিল না। ছাত্রদিগের সম্পর্কে তাঁহার কঠোর ও কোমল দুই মূর্ত্তিই দেখিয়াছি। এক দিকে যেমন দারিদ্র্য বা অক্ষমতা জনিত অভাব অভিযোগের সহিত তাঁহার সহানুভূতি দেখা যাইত, অন্য দিকে তেমনি নৈতিক অপরাধের দণ্ড বিধানে তাঁহার বজ্রকঠোর দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যাইত। অপরাধী ছাত্রদিগকে জরিমানা করিয়া যে টাকা উঠিত, তাহা তিনি কলেজের সাধারণ অর্থকোষে না দিয়া, তদ্দ্বারা দরিদ্র ছাত্রদিগের সাহায্য কল্পে একটি অর্থভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছিলেন। ছাত্রদিগকে যখন কোন

বিষয়ে অনুযোগ করিতেন বা উপদেশ দিতেন, তখন তিনি কেবলমাত্র স্মরণ করাইয়া দিতেন যে, তাহারা ভারতীয় ছাত্র, তাহাদের আচরণের উপর ভারতের খ্যাতি অখ্যাতি নির্ভর করিতেছে। ছাত্রদের আনন্দ মিলনে যোগদান করিতে তিনি ভালবাসিতেন। ফুটবল প্রভৃতি বিদেশীয় ক্রীড়ার তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না; কিন্তু তাঁহার ছাত্রগণ যখন খেলা জিতিয়া তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইত, তখন তিনি তাহাদের আনন্দে সম্পূর্ণ ভাবে যোগ দিতেন, এবং প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন ভোজন না করাইয়া তাহাদিগকে ছাড়িতেন না। বাস্তবিক তাঁহার গৃহে অতিথিসৎকার একটি প্রাণের ব্যাপার ছিল। এ বিষয়ে তাঁহার গৃহিণী যথার্থই তাঁহার সহধর্ম্মিণী ছিলেন। একবার তিনি কলেজের অধ্যাপক ও কতিপয় বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। আহার্য্য বস্তুর পরিমাণ বৈচিত্র্য ও পাক-কৌশলে আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম। আহারস্থলে দাঁড়াইয়া তিনি সকলকে অভয় দিয়া বলিলেন, "আপনারা নিঃসঙ্কোচে আহার করুন, ইহার মধ্যে রাঁধুনী বামুনের রান্না নাই, বা বাজারের সন্দেশ নাই। অর্থাৎ প্রত্যেক সামগ্রী অপূর্ব্ব নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের সহিত তাঁহার বাড়ীর মেয়েরাই প্রস্তুত করিয়াছেন। না হইবে কেন, তিনি যে গৃহস্থলীর মধ্যে প্রাচীন আদর্শানুযায়ী আশ্রমধর্ম্মেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

"কলেজের বিরাট যন্ত্রের মধ্যে অধ্যাপক নামধারী আর এক দল যে মানুষ ছিলেন, তাঁহাদের সহিতই তাঁহার প্রধান কারবার ছিল। রিপন কলেজের অধ্যক্ষের জন্য কেন যে পৃথক্ খাস কামরা নাই, এ লইয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইন্‌স্পেক্টরদিগের নিকট তাঁহাকে অনেকবার কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছে। তিনি বলিতেন—"আমি এতগুলি লোক ছাড়িয়া একা ঘরে কি করিয়া থাকিব?" খাস কামরা থাকিলে, কলেজ-যন্ত্রের কাজ চালান

পক্ষে অনেক সুবিধা হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি ত এখানে শুধু কল চালাইতে আসেন নাই, সেটাত একটা উপলক্ষ্য মাত্র; তিনি আসিতেন প্রাণ বিনিময়ের আনন্দ উপভোগ করিতে। অপরাহ্ণে তিনি যখন আসিয়া আসন গ্রহণ করিতেন, তখন তাঁহার ঘরে একটা আনন্দলহরী ছুটিয়া চলিত। কখনও বা বৈদিক যজ্ঞ, কখনও বা ইহুদী জাতির ইতিহাস, কখনও বা প্রাচীন গ্রীসের ব্যক্তিসর্ব্বস্বতা, কখনও বা বৌদ্ধ দর্শন, কখনও বা বৈষ্ণব তত্ত্ব, এইরূপ একটা না একটা বিষয় লইয়া সরস আলোচনা চলিত। সে যে কি আনন্দের ব্যাপার ছিল, তাহা যাঁহারা উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। এই সমস্ত আলোচনার প্রধান লক্ষ্য ছিল—নবীন অধ্যাপকদিগকে উদ্বুদ্ধ করা। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির বিরাট যন্ত্রের আওতা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি যাহাতে অলোকের দিকে প্রসারিত হইয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে, সেই ছিল তাঁহার প্রধান চেষ্টা। তিনি প্রত্যেক অধ্যাপকের মনের গতি লক্ষ্য করিতেন, এবং কখনও প্রশংসাদ্বারা, কখনও প্ররোচনাদ্বারা কখনও বা তিরস্কার করিয়া সকলকে বাণীর সেবায় নিয়োগ করিতে চেষ্টা করিতেন। চর্চ্চা কর, অনুসন্ধান কর, লেখ,—এই ছিল তাঁহার কথা। এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কলেজে একটি অধ্যাপকসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। ইচ্ছা করিয়াই তিনি এই সঙ্ঘে কোন আইন কানুন বাঁধিতে দেন নাই। ইহার মধ্যে তিনি প্রাণের স্বচ্ছলীলা দেখিতে চাহিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে হয় তিনি নিজে অথবা কোন অধ্যাপক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া উপস্থিত করিতেন। হয়ত বা বাহির হইতে দুই একটি বিশেষজ্ঞ বন্ধুকে আহ্বান করিয়া আনা হইত। ছাত্রদিগের মধ্যে যাহারা শুশ্রূষু তাহাদিগকেও ডাকা হইত। সকলের সম্মুখে প্রবন্ধটি পঠিত ও আলোচিত হইত, এবং সর্ব্বশেষে মিষ্টান্ন জলযোগসহকারে ব্যাপারটি মধুরেণ সমাপিত হইত। এই অধ্যাপক

সঙ্ঘের সম্মুখে তিনি যে ধারাবাহিক দার্শনিক প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাই সম্প্রতি 'বিচিত্র জগৎ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

"দর্শন ও বিজ্ঞানের এমন অপূর্ব্ব সমন্বয়, শুধু আমাদের দেশে নহে, পাশ্চাত্য জগতেও অতি বিরল। কলেজ-সম্পর্কে তাঁহার আর একটি প্রিয় বস্তু ছিল "রিপন-কলেজ-পত্রিকা।" এই পত্রিকা তাঁহারই উৎসাহে ও নেতৃত্বে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম দুই বৎসরের সংখ্যাগুলি দেখিলেই বুঝা যায়, রামেন্দ্রবাবুর প্রভাবে কলেজের অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যে কেমন একটা সজীবতা আসিয়াছিল। তাঁহার উৎসাহ দেওয়ার প্রণালীই একটু স্বতন্ত্র ধরণের ছিল। তিনি নিজের ছাঁচে সকলকে ঢালিতে চাহিতেন না। কাহার কোন্ দিকে স্বাভাবিক প্রবণতা, কোন্ বিষয়ে কাহার স্বাভাবিক অনুরাগ এইটি লক্ষ্য করিয়াই তিনি কথা কহিতেন। এই ব্যাপারে তাঁহার চিত্তের উদারতা দেখিয়া অবাক হইতে হইত। কলেজের গ্রন্থাগারের জন্য যখন গ্রন্থ ক্রয় করা হইত, তখন তিনি কেবল নিজের রুচি অনুসরণ করিয়া গ্রন্থ নির্ব্বাচন করিতেন না। সংস্কৃত সাহিত্য, বঙ্গ সাহিত্য ও বিজ্ঞানের গ্রন্থ যে তাঁহার প্রিয় হইবে, তাহাত স্বাভাবিক। ইহা ছাড়া আধুনিক য়ুরোপের দর্শন, ইতিহাস, কাব্য, উপন্যাস, নাটক কিছুই তাঁহার সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইত না। নবীন অধ্যাপকেরা যে সকল অতিনবীন কাব্য-নাটকাদি পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিতেন, তিনি নিজে না পাঠ করিলেও তাঁহাদের নিকট সে সকল গ্রন্থের সারমর্ম্ম শুনিয়া লইয়া কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতেন। তাঁহার নিজের আলোচ্য বিষয়সম্পর্কীয় যে কোন রচনা নূতন প্রকাশিত হইত, তাহা তিনি সঙ্গে সঙ্গে ক্রয় করিয়া পাঠ করিতেন। তাঁহার মুখে আধুনিক দার্শনিক বের্গসোঁর দার্শনিক মত, বা আধুনিক বৈজ্ঞানিক মেণ্ডেলের বংশক্রমতত্ত্ব বা নবাবিষ্কৃত সংস্কৃত কবিভাসের নাট্যগ্রন্থ সম্বন্ধে

আলোচনা যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার চিত্তবৃত্তির সজীবতার ও চিরনবীনতার পরিচয় পাইয়াছেন।"

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ৩০এ নবেম্বর সাড্‌লার কমিশন রিপন কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। কমিশনের কর্ত্তা ইংলণ্ড হইতে আগত সাড্‌লার সাহেব রামেন্দ্রসুন্দরের বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানবত্তার পরিচয় পাইয়া একান্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্টগ্রাজুয়েট ক্লাসে এরূপ লোক নিযুক্ত না করিয়া কতকগুলি ছোকরা নিযুক্ত করা হইয়াছে কেন? তিনি উত্তরে শুনিয়াছিলেন "This is the fate of our country ইহাই আমাদের দেশের ভাগ্য।

একাদশ অধ্যায়

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে

যে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ অধুনা বঙ্গের নানাস্থানে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, সকলেই অবগত আছেন উহার প্রাথমিক অবস্থা বর্ত্তমান কালের অনুরূপ ছিল না। উহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনকল্পে দেশমধ্যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ধারা প্রবাহিত করিবার জন্য রামেন্দ্রসুন্দর ও তাঁহার সহকর্ম্মী ব্যোমকেশ মুস্তফী উভয়ে জীবনপাত করিয়াছেন। রামেন্দ্র-সুন্দর সাহিত্য-পরিষৎকে প্রাণের সামগ্রী করিয়া লইয়াছিলেন। উহার উচ্চ আদর্শে কত সাহিত্য-পরিষৎ, সাহিত্য-সভা, অনুসন্ধান-সমিতি প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে, এবং সাহিত্য-সম্মিলনের আদর্শে বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বহু সাহিত্য-সম্মিলন বৎসর বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সাহিত্য সেবি-গণের তাহা অবিদিত নাই। সাহিত্যসেবকদের মিলন পরিকল্পনার মূলে উক্ত উভয় মহাত্মার যে প্রচুর কৃতিত্ব রহিয়াছে, তাহা অসঙ্কোচে বলা যায়। বঙ্গসাহিত্যের প্রতি সাধারণের প্রীতি ও ভক্তির উন্মেষ সাধনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ যাহা করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। পরিষদের গঠন ও পরিচালনে রামেন্দ্রসুন্দরের কতটুকু কৃতিত্ব ছিল, তাহা আর নূতন করিয়া কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। তিনি পরিষৎকে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আলোচনার কেন্দ্রস্থল করিয়া বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য ও পুরাতত্ত্ব আলোচনা, বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে মৌলিক ও নব নব বৈজ্ঞানিক তথ্যের গবেষণা প্রভৃতির জন্য বহু শিষ্য ও কর্ম্মীর সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তিনি নানাশাস্ত্রের

বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করিবার জন্য তাঁহার ছাত্র ও শিষ্যবর্গের মনে যে প্রেরণার ঝঙ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাহার ফলে অধুনা বাঙ্গালা সাহিত্য, নব নব সম্পদ লাভ করিতেছে।

বাঙ্গালার সাহিত্য ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎকে রামেন্দ্রসুন্দর যে কি চক্ষে দেখিতেন, তাহা কোন ভাষার দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। সাহিত্য-পরিষদের প্রথমবর্ষ হইতে কোন না কোন কর্ম্মের অধ্যক্ষ-রূপে এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যরূপে তিনি পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও তিনি পরিষদের প্রতি স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগবশতঃ তাহার সকল বিভাগের কার্য্যপরিচালনে কর্ত্তৃপক্ষকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। তাঁহার ন্যায় অদ্ভুত শক্তিশালী, প্রতিভাবান্, জ্ঞানী ও কর্ম্মী সেবককে হারাইয়া সাহিত্য-পরিষৎ আজ কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

বাঙ্গালার মহাকবি তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার সময় বলিয়াছেন—"সাহিত্য-পরিষদের সারথি তুমি এই রথটিকে নিরন্তর বিজয়পথে পরিচালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্য্যে তুমি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্য্যের দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ, এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ। আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।" পরিষদ্‌ই রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের যথার্থ স্মৃতিচিহ্ন। এই পরিষদের অস্তিত্ব ও উন্নতির সহিত তাঁহার স্মৃতি চিরকাল বিজড়িত থাকিবে। রামেন্দ্র-সুন্দর ব্যোমকেশ মুস্তফীর স্মৃতিসভায় বলিয়াছিলেন—"ব্যোমকেশ নাই, সাহিত্য-পরিষৎ বর্ত্তমান, বেশ কথা। আমরা এক দিন কেহই থাকিব না, সাহিত্য-পরিষৎ বর্ত্তমান থাকিবে, ইহা আমি প্রার্থনা করি;

আপনারাও প্রার্থনা করেন।” আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি সাহিত্য-পরিষৎ দিন দিন উন্নতির পথে ধাবিত হইয়া সেই পরলোকগত মহাত্মার পবিত্র স্মৃতিরক্ষার সহায়তা করুক।

ইংরাজী ১৮৯৩ অব্দের ২৩এ জুলাই কয়েকজন ভদ্রলোক কলিকাতা শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণের ভবনে সমবেত হইয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধনকল্পে “বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার” নামে একটি সভা স্থাপন করেন। ঐ সভার কার্য্যসমূহ অধিকাংশই ইংরাজী ভাষায় সম্পাদিত হইত, সে কারণে প্রথম অধিবেশনের পর দুই বৎসর অতীত না হইতেই কয়েকজন সভ্যের আপত্তি ক্রমে ঐ সভাকে পুণর্গঠিত করিয়া বঙ্গাব্দ ১৩০১, ১৭ই বৈশাখ “বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ” নামে অভিহিত করা হয়।

সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয় অধিবেশনে ১৮৯৪ অব্দের ২৯এ জুলাই সর্ব্বসম্মতিক্রমে রামেন্দ্রসুন্দর উহার সভ্যপদে নির্ব্বাচিত হন। ঐ অধিবেশনে রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে পারিভাষিক শব্দ প্রণয়নের জন্য আট জন সভ্য লইয়া একটি শাখাসমিতি গঠিত হয়। উক্ত সমিতিকে ভূগোল, গণিত প্রভৃতি বিষয়ের পারিভাষিক শব্দ প্রণয়ন করিবার ভার দেওয়া হয়। ১৩০১ সালের কার্ত্তিক মাসে প্রকাশিত পরিষৎ পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দর ‘বৈজ্ঞানিক পরিভাষা’ নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। মাঘ মাসে প্রকাশিত পত্রিকায় অপূর্ব্ব চন্দ্র দত্ত মহাশয় উক্ত প্রবন্ধসম্বন্ধে আলোচনা করেন। ঐ পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দরের নিজের বক্তব্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। ঐ বর্ষে চতুর্থ অধিবেশনে রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের পুস্তকালয় স্থাপনের জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করেন। সে সময় উপযোগী অর্থবল না থাকায় পরিষৎ সাহস করিয়া পুস্তকালয় স্থাপন করিতে পারেন নাই; তবে ভবিষ্যতে

অর্থ সংগৃহীত হইলে পুস্তকালয় স্থাপন করা হইবে, এবং হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাগারে রক্ষিত হইবে, ইহা স্থির হয়।

লিওটার্ড সাহেব পরিষদের সম্পাদক ছিলেন, তাঁহার স্থলে নূতন সম্পাদক নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন হইল। ২৪এ অগ্রহায়ণ সপ্তম অধিবেশনে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও রমেশচন্দ্র দত্তের সমর্থনানুসারে রামেন্দ্রসুন্দর সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। ঐ অধিবেশনে তিনি কবিকঙ্কণ সম্বন্ধে চারিটী প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার একখানি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের শেষে কয়েকটি শ্লোক লিখিত ছিল, সেই শ্লোক কয়টির মধ্যে কবিকঙ্কণের নামোল্লেখ ছিল, তাহা দেখিয়া তাঁহার মনে ঐ চারিটি প্রশ্নের উদয় হয়। ঐ বিষয়ের মীমাংসার ভার পত্রিকাসম্পাদকের উপর অর্পিত হইল। অষ্টম অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ তিনি স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করেন। এই অধিবেশনে তাঁহার প্রস্তাবক্রমে সভ্যগণকে সভাস্থলে সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধাদি পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। বলা বাহুল্য ইতিপূর্ব্বে সাধারণ অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠের প্রথা ছিল না। উহার ফলে ১৩ই ফাল্গুন নবম অধিবেশনে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের জীবনচরিতের কিয়দংশ পাঠ করেন।

১৩০২ সালে পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে আট জন সদস্য নিযুক্ত হন। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ঐ বৎসর শ্রাবণ মাসে সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় তিনি 'রাসায়নিক পরিভাষা' শীর্ষক একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাসায়নিক পরিভাষা সঙ্কলনের জন্য কোন স্বতন্ত্র সমিতি ছিল না। রামেন্দ্রসুন্দর ১৩০২ সালে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া উহা সঙ্কলিত করিয়াছিলেন। উহা প্রথমতঃ পত্রিকায় এবং পরে স্বতন্ত্র ভাবে মুদ্রিত হইয়া রসায়নবিৎ পণ্ডিতগণের নিকট সমালোচনার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল

বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্য ও অন্যান্য সারগর্ভ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য পরিষৎ কর্তৃক একটি গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি স্থাপিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দর উহার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ সঙ্কলনের জন্য হীরেন্দ্র নাথ দত্তকে সাহায্য করিবার ভার গ্রহণ করেন। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যা নিধিকে কবিকঙ্কণের চণ্ডী প্রকাশের ভার দেওয়া হয়। সেই সমিতিতে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য রামেন্দ্রসুন্দর সদস্য নিযুক্ত হন। রামমোহনের রামায়ণ সমিতির সম্পাদক হইয়া তিনি তাহার পাণ্ডু লিপি শেষ করেন, এবং মুদ্রণ ভার গ্রহণ করেন। ঐ বৎসর তিনি গ্রন্থপ্রকাশ সমিতিতে 'মনসামঙ্গল' গ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তাব উথাপন করেন।

১৩০৩ সালে রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হন। কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা ভাষায় আনালিটিকাল জিওমেট্রিবিষয়ক একখানি পুস্তক রচনা করিয়া পরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রণের জন্য সম্পাদকের নিকট[২] প্রেরণ করেন। গ্রন্থখানি মুদ্রণের যোগ্য কিনা তাহা নির্ণয়ের জন্য পরিষৎ রামেন্দ্রসুন্দর ও অপর পাঁচ জন সভ্যের উপর ভার অর্পণ করেন। গ্রন্থখানি মুদ্রণযোগ্য বিবেচিত হইলে গ্রন্থকার পরিষৎকে উহা কি ভাবে মুদ্রিত করিতে দিবেন, তাহা স্থির করিবার ভার রামেন্দ্র-সুন্দরের প্রতি অর্পিত হয়। ঐ বৎসরে নবীনচন্দ্র সেনের প্রস্তাব ক্রমে প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষাপ্রণালীর সংশোধনার্থ একটি শিক্ষা সমিতি গঠিত হয়। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে রামেন্দ্রসুন্দর ঐ সমিতিতে আসন প্রাপ্ত হন। শিক্ষাসমিতির সদস্যগণ প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষাপ্রণালীর সংশোধনার্থ একখানি আবেদন প্রস্তুত করেন, এবং উহা শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত

হইবে, এইরূপ স্থির হয়। ঐ বৎসর রামেন্দ্রসুন্দর 'মনসামঙ্গল' গ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন, এবং পরিষৎ পত্রিকায় 'গৌরীমঙ্গল' নামক প্রবন্ধে একখানি পুঁথির বিবরণ প্রকাশ করেন।

১৩০৪ সালে রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের অন্যতম আয়ব্যয়-পরীক্ষক নিযুক্ত হন। গ্রন্থপ্রকাশ সমিতির পক্ষ হইতে তিনি কৃত্তিবাসী রামায়ণ সমিতিতে প্রবেশ করেন। রামমোহনের রামায়ণ সম্পাদন বিষয়ে রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী ও মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি তাঁহার সাহায্যকারী সদস্য নিযুক্ত হন। ঐ বৎসর রামেন্দ্রসুন্দর পরিভাষা সমিতির সম্পাদক ছিলেন। সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে সখারাম গণেশ দেউস্কর পরিষৎ পত্রিকায় ভৌগলিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি সেই প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের বিবিধ ভৌগলিক নাম বাঙ্গালা ভাষায় বিকৃতভাবে উচ্চারিত ও লিখিত হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে আলোচনা সমিতির দ্বিতীয় কার্য্য হইবে। রামেন্দ্রসুন্দর ঐ বৎসর উদ্ভিদ্‌পরিভাষা সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হন, এবং এতদ্ভিন্ন তিনি পদার্থবিদ্যাবিষয়ক পরিভাষা সঙ্কলনেও ব্রতী হন। হারাণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রামেন্দ্রসুন্দরের অনুরোধে ভাস্করাচার্য্যের ব্যবহৃত গণিত শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দের সঙ্কলন করেন।

পরিষৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা প্রচলন সম্বন্ধে ১৩০২ ও ১৩০৩ সালে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু উহা ফলবতী হয় নাই। পরবর্ত্তী কালে পরিষদের সভ্যগণের অনুরোধে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। সভায় স্থির হয়, পরীক্ষার্থীরা ইচ্ছা করিলে এফ্, এ ও বি, এ পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনা বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারিবেন। এই ব্যাপারে রামেন্দ্রসুন্দরের যথেষ্ট চেষ্টা ছিল।

ঐ বৎসর পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশ সমিতিতে নূতন পনর জন সভ্য

নিযুক্ত হন, রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। রামমোহনের রামায়ণ সমিতির সম্পাদকরূপে তিনি উক্ত রামায়ণের মুদ্রণোপযোগী এক প্রতি-লিপি প্রস্তুত করেন, পরিষৎ কিন্তু সে বৎসর উহার মুদ্রণের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। পরিভাষা সমিতির সম্পাদকরূপে রামেন্দ্রসুন্দর ওয়েবেষ্টারের অভিধান, হাণ্টার সাহেবের ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার, ও অন্যান্য ভৌগলিক গ্রন্থ অবলম্বনে ভৌগলিক নামের তালিকা প্রস্তুত করিতে সচেষ্ট ছিলেন, এবং তিনি রাসয়নিক পরিভাষার সাহায্যার্থে জন ম্যাক্ সাহেবের প্রণীত প্রাচীন বাঙ্গালার রসায়ন গ্রন্থে ব্যবহৃত রাসায়নিক শব্দের পরিভাষা মাঘ মাসের পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ডাক্তার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ইংরাজী শব্দের বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনুবাদ সমর্থন করেন।

ঐ বৎসর রজনীকান্ত গুপ্ত পরিষৎ হইতে বঙ্গভাষায় নানা বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনার প্রস্তাব করিলে পরিষদের পক্ষ হইতে রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞান বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিবার ভার প্রাপ্ত হন। কিন্তু পরিষদের অক্ষমতাবশতঃ কোন নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই।

১৩০৫ সালে রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের অন্যতম আয়ব্যয় পরীক্ষক ছিলেন। তিনি ৫ই বৈশাখ পত্রিকায় প্রাচীন পঁুথির বিবরণ প্রকাশের প্রস্তাব করেন, এবং তদনুযায়ী তিনি তাঁহার সংগৃহীত পঁুথির তালিকা পরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রিত করিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। ২রা আষাঢ় তিনি জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল ও শীতলামঙ্গল প্রকাশের প্রস্তাব করেন। ঐ বৎসর তাঁহার লিখিত "বাঙ্গালার আদি রসায়ন গ্রন্থ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।

১৩০৬ সালে পরিষদের কার্য্যালয় স্থানান্তরিত করিবার জন্য ৩রা ফাল্গুন তারিখে একটি বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ও অপর দশজন সভ্য পরিষদের কার্য্যালয়

স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব করেন। রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী ও মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি প্রভৃতি কয়েকজন সভ্য তাহাতে আপত্তি করেন; কিন্তু পরে পরিষদের কার্য্যালয় স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাবই গৃহীত হয়। পরিষদের গৃহ রাজা বিনয়কৃষ্ণের ভবন হইতে ১৩৭।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ভাড়াটিয়া বাড়ীতে উঠিয়া গেল। একটি সাধারণ সভা চিরকাল ব্যক্তিবিশেষের আবাস বাড়াতে অনুষ্ঠিত হওয়া সুবিধাজনক নহে বিবেচনা করিয়া কার্য্যালয় স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। এই সময় হইতে রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-পরিষদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। সাহিত্য-পরিষৎকে তাহার নিজভবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের সাহায্য পাইলেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক যত্নে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে অচিরকাল মধ্যে সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল।

সাহিত্য-পরিষৎ ভাড়াটিয়া বাড়ীতে উঠিয়া আসিলে তথায় এক দিন রামেন্দ্রসুন্দর ও ব্যোমকেশ মুস্তফী ভবিষ্যৎ সাহিত্য-পরিষৎ ভবন কি আকারে নির্ম্মিত হইবে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। ব্যোমকেশ বাবু বলিলেন—"আপনার কল্পনামত পরিষৎ ভবন নির্ম্মাণ করিবার মত টাকা কোথায়?" রামেন্দ্রসুন্দর তদুত্তরে একটু উত্তেজিত ভাবে বলিয়াছিলেন—"দেশের কাজে যদি টাকা না পাওয়া যায়, তা'হলে চলুন, সব বন্ধ করে আমরা বাড়ী গিয়ে ব'সে থাকি।" প্রাণপণ যত্ন এবং চেষ্টা থাকিলে টাকার অভাবে কোন শুভকার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে না, এ ধারণা তাঁহার মনে উদিত হইত না। তিনি অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরিষদের অন্যতম সভ্য চারুচন্দ্র ঘোষ কাশিম বাজারের মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্রের নিকট পরিষদের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য একটু জমি চাহিলে মহারাজ তাহাতে সম্মত হন। ভূমি পাইয়া

রামেন্দ্রসুন্দরের উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল, তিনি অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন।

ঐ সময়ে গৃহনির্ম্মাণ সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়, রামেন্দ্রসুন্দর ঐ সভায় অন্যতম সভ্য নিযুক্ত হন। ঐ বৎসর তিনি পত্রিকার সম্পাদকপদ গ্রহণ করেন। পরিভাষা ও উদ্ভিদ্‌পরিভাষা সমিতি মিলিত হইয়া একটি পরিভাষা সমিতি গঠিত হয়, তিনি উহার সম্পাদক ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে রামেন্দ্রসুন্দর পরিষৎ পত্রিকার ষষ্ঠ ভাগে যে ভৌগলিক পরিভাষা প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, যোগেশচন্দ্র রায় তাহার কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করেন। ঐ বৎসর রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় কাশীরাম দাসের বংশ-পরিচয় ও কালনির্ণয়, ভৌগলিক পরিভাষা, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (চিকিৎসা-বিজ্ঞান) শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরিষদের নিয়মাবলী সংশোধন, পরিবর্জ্জন, ও পরিবর্দ্ধনাদি করিবার জন্য ছয়জন সভ্য লইয়া একটি সমিতি গঠিত হয়; তিনি ঐ ছয়জন সভ্যের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

১৩০৭ সালে রামেন্দ্রসুন্দর পরিষৎ পত্রিকার ও পরিভাষা সমিতির সম্পাদক ছিলেন, এবং গ্রন্থরচনা সমিতি, শব্দ সমিতি ও গৃহনির্ম্মাণ সমিতির সভ্য ছিলেন। ঐ বৎসরের পরিষৎ পত্রিকায় তাঁহার লিখিত "চম্পককলিকা" ও রজনীকান্ত গুপ্ত" শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

বাবু রাজকুমার মুখোপাধ্যায় অনেকগুলি চলিত কথা অভিধানাকারে সংগ্রহ করিয়া পরিষৎকে -দিয়াছিলেন, সেইগুলি পরীক্ষার জন্য, এবং আবশ্যক বুঝিলে তাহার সম্পাদনের ভার পরিষৎ রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতি অর্পণ করিয়াছিলেন।

১৩০৮ সালে পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় রামেন্দ্রসুন্দর পরিষৎ পত্রিকার ও

পরিভাষা সমিতির সম্পাদক, এবং গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি, গ্রন্থরচনা সমিতি ও গৃহনির্ম্মাণ সমিতির সভ্য ছিলেন।

স্বর্গীয় খ্যাতনামা লেখকদিগের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাঁহাদের ফটো, হস্তাক্ষর, চিঠিপত্র ও পুস্তকাদি রক্ষার প্রস্তাব পরিষদের সভায় উপস্থিত হয়, রামেন্দ্রসুন্দরের প্রস্তাবে নূতন গৃহ নির্ম্মিত না হওয়া পর্য্যন্ত উহা স্থগিত রাখা স্থির হয়। ঐ বৎসর রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। অষ্টম ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় তাঁহার লিখিত "বাঙ্গালা ব্যাকরণ" শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ২৭এ মাঘ নবম অধিবেশনে রামেন্দ্রসুন্দর প্রস্তাব করেন—'যাঁহাদের দ্বারা পরিষৎ উপকৃত, বা উপকারের আশা রাখেন, এরূপ বারজন ব্যক্তি চাঁদা দিতে অক্ষম হইলেও তাঁহাদিগকে বিনা চাঁদায়, সভ্য করা হউক। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সমর্থনে ঐ প্রস্তাব নিয়মাবলীর মধ্যে সন্নিবেশিত করা হইয়াছিল।

পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক রজনীকান্ত গুপ্ত পরলোক গমন করিলে ১৭ই আষাঢ় প্রথম অধিবেশনে তাঁহার জন্য শোক প্রকাশার্থ এক বিশেষ অধিবেশন হয়। উক্ত সভাস্থলে রামেন্দ্রসুন্দর রজনীকান্ত গুপ্তের গুণ বর্ণনায় বাষ্পাকুল কণ্ঠে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন; উহা শুনিয়া সকলেরই চিত্ত বিগলিত হইয়াছিল।

অষ্টম বর্ষের পরিষৎ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য মন্দির হইতে জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস "বাঙ্গালা শব্দতত্ত্ব" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। রামেন্দ্রসুন্দর পত্রিকাসম্পাদকরূপে উক্ত প্রবন্ধের শেষ অংশে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন—"বর্ত্তমান প্রবন্ধের অধিকাংশ শব্দই গ্রাম্য অপভাষায় ব্যবহৃত হয়। * * * ভাষা বিজ্ঞানের নিকট গ্রাম্য

ভাষা ও সাধুভাষার সমান আদর। বরং গ্রাম্য ভাষা হইতে ভাষার মূল প্রকৃতি ও ভাষার সহিত জাতীয় প্রকৃতির সম্বন্ধ যত সহজে বোঝা যায়, সাধু ভাষা হইতে তেমন হয় না। এই জন্য গ্রাম্য slang শব্দের সংগ্রহের যথেষ্ট প্রয়োজন। এই সংগ্রহকার্য্যে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই।"

নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকৃত জ্যামিতিক পরিভাষা মুদ্রণের কথা সাহিত্য-পরিষদের সভায় আলোচিত হইলে সম্পাদক তাঁহার নিজের আলোচনা সহ উহা প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করেন ; কিন্তু অনবকাশবশতঃ সে বৎসর উহা সম্পন্ন হয় নাই।

১৩০৯ সালে রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ও পরিভাষা সমিতির সম্পাদক, এবং গৃহনির্ম্মাণ সমিতি ও গ্রন্থপ্রকাশ সমিতির সভ্য ছিলেন। সে বৎসর পরিষৎ গৃহনির্ম্মাণ ভাণ্ডারে তিনি ১৩৮০০৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পান। তদ্ভিন্ন নাটোর ও ময়ূরভঞ্জের মহারাজ, কুমার মন্মথনাথ মিত্র, প্রমথনাথ মল্লিক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাণশঙ্কর চৌধুরী প্রভৃতি ধনিসন্তানগণের নিকট হইতে সাহায্য পাইবেন এইরূপ আশাও ছিল।

কাশিমবাজারের মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র বাহাদুর গ্রন্থপ্রকাশ সমিতির সভ্য রামেন্দ্রসুন্দরকে জানান যে, তিনি বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী প্রকাশকল্পে পরিষৎকে বার্ষিক এক শত টাকা সাহায্য করিতে চান।

১৩১০ সালে রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। লালগোলার রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি হইতে প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিবার জন্য বার্ষিক তিন শত টাকা সাহায্য করিবেন এই কথা রামেন্দ্রসুন্দরকে জানান। ঐ দান প্রাপ্ত হইয়া পরিষৎ সপ্তম অধিবেশনে নূতন নিয়ম প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করেন।

সাহিত্য-পরিষদের সভ্য না হইয়াও রাজা বাহাদুর রামেন্দ্রসুন্দরের অনুরোধে বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতিকল্পে অর্থ দান করিয়াছিলেন। সেই অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে ১৩১২ সালে ভূকৈলাসের রাজার প্রণীত "কাশী পরিক্রমা" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

নবম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় মহাশয়ের অনুষ্ঠিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সটিক বঙ্গানুবাদ প্রকাশ সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ গ্রন্থের অনুবাদ মুদ্রিত করিবার ব্যয়ভার কুমার শরৎকুমার নিজে বহন করিতে সম্মত হন। রামেন্দ্রসুন্দর স্বয়ং ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। পরিষদের কার্য্য সুপরিচালিত করিবার জন্য রামেন্দ্রসুন্দর একাদশ অধিবেশনে মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনে একজন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করার প্রস্তাব করেন। তদনুসারে একজন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়।

মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত প্রদ্যোত কুমার ঠাকুর পরিষৎ হইতে কালী-প্রসন্ন ঘোষ নামীয় একটি পদক দান করিতে চাহিয়াছিলেন। রামেন্দ্র-সুন্দর পরিষদের সভায় শব্দসংগ্রহসম্পর্কীয় কোন কার্য্যের প্রতিযোগিতার জন্য ঐ পদক দান করা হউক, এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রস্তাবটি তৎকালে মহারাজকুমারের বিবেচনাধীন ছিল।

রামেন্দ্রসুন্দর উদ্ভিদ্‌বিষয়ক যে পরিভাষা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তিনি তাহা পণ্ডিতগণের বিচারার্থ সাহিত-পরিষৎ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে রাসায়নিক পরিভাষা রচনার কার্য্য স্থগিত ছিল। সাধারণের সংশয় দূর করিবার জন্য তাঁহাকে তাহার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হয়। তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি নিজে রসায়নের একটা পরিভাষা করিয়া দিয়াছিলাম। তাহার পর হইতে ঐ সমিতির কার্য্য এক প্রকার বন্ধ আছে। আমি ঐ সমিতির সম্পাদক;

সুতরাং কেন স্থগিত রহিল তাহার কৈফিয়ৎ দিতে আমিই বাধ্য। পরিভাষা প্রণয়নের দুইটা দল আছে; এক দল বলেন, আমরা যখন বৈজ্ঞানিক শব্দ য়ুরোপ হইতে ধার করিয়া লইতেছি, বা য়ুরোপীয়গণের রচিত গ্রন্থ হইতে শিখিতেছি, তখন তরজমা না করিয়া ঐ সকল শব্দই অক্ষরান্তরিত করিয়া লওয়া হউক। আর এক দল বলেন, বাঙ্গালায় যখন পরিভাষা হইবে, তখন বাঙ্গালাই করিতে হইবে। তাঁহাদের মধ্যে আবার দুই দল। এক দল বলেন, পরিভাষাগুলি খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ দিয়া বা খুঁজিয়া লইয়া করিতে হইবে। অপর দল বলেন, যখন সংস্কৃতে শব্দ পাওয়া যায়, তখন খাঁটি সংস্কৃত শব্দ গুলিই বাছিয়া বাহির করিতে হইবে। আর নূতন যাহা গড়িতে হইবে তাহা খাঁটি সংস্কৃত করিয়া লইতে হইবে। কাজেই পরিভাষা সমিতির কার্য্য স্থগিত আছে।"

ঐ বৎসর রামেন্দ্রসুন্দর গৃহনির্ম্মাণ সমিতি, গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি ও গ্রন্থ রচনা সমিতির সভ্য এবং পরিভাষা সমিতির সম্পাদক ছিলেন। ২৮এ চৈত্র তিনি পরিষদের সম্পাদক হইতে সম্মত হন। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ৭১ পৃষ্ঠায় "হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়" শীর্ষক তাঁহার একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

১৩১১ সালে রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের সম্পাদক হইয়াছিলেন। ঐ বৎসর ষষ্ঠ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ পরিষদের পুস্তকালয়ের পুষ্টি ও উন্নতিকল্পে কয়েকটি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। সম্পাদক রামেন্দ্র-সুন্দর তদনুসারে নিয়মাদি প্রস্তুত করেন। নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে বিবেচনার ভার পরবর্ত্তী সভা হইতে তাঁহার এবং অপর তিনজন সভ্যের উপর অর্পিত হয়।

একাদশ অধিবেশনে রামেন্দ্রসুন্দর প্রস্তাব করিয়াছিলেন, পরিষদের একাল পর্য্যন্ত কৃত কর্ম্মের বিবরণ পুস্তিকাকারে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায়

মুদ্রিত করিয়া দেশীয় ও বিদেশীয় বিদ্বজ্জনের নিকট ও সভা সমিতিতে পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাদের সহানুভূতি আনুকূল্য ও প্রকাশিত পুস্তকাদি প্রার্থনা করা হউক। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

পরিষৎ কার্য্যালয়ে কর্ম্মচারিগণের ছুটির ব্যবস্থা ছিল না। সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর প্রধানতঃ ছুটি ও কার্য্যালয়ের পরিচালনা সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়মের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। ঐ পাণ্ডুলিপি তিনি সভাস্থলে উপস্থিত করিলে, একটি নির্দ্দিষ্ট শাখাসমিতি কর্ত্তৃক পুনরালোচিত হইয়া পরিবর্ত্তিত আকারে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিষদে প্রস্তাব করেন যে, পরিষদের নিকট হইতে বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালা জাতির সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান পাইবার জন্য বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কিন্তু উহা বিপুল ব্যয়সাধ্য ব্যাপার বলিয়া আপাততঃ পরিষৎ স্থির করেন, মফঃস্বলবাসী ছাত্রগণের সাহায্য লইলে অল্প ব্যয়ে অধিক ফলের প্রত্যাশা আছে। পরিষদের ছাত্রসভ্য নামে নূতন শ্রেণীর সভ্য নির্ব্বাচনের কথা হইল। নূতন ছাত্রসভ্য গ্রহণ সম্বন্ধে নিয়মাদি নির্দ্ধারণের জন্য রামেন্দ্রসুন্দর ও কতিপয় সভ্যের উপর ভার অর্পিত হইল।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কারের জন্য একটি কমিটি স্থাপিত করেন। ঐ কমিটির মন্তব্য অনুসারে গবর্ণমেণ্ট যে সকল পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করেন, তাহাতে দেশীয় শিক্ষা, ভাষা ও সাহিত্যের কিরূপ ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে, তাহার আলোচনার জন্য পরিষৎ একটি শাখা সমিতি স্থাপন করেন। রামেন্দ্রসুন্দর ঐ শাখাসমিতির সভ্য ছিলেন। নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব আলোচনা করিবার জন্য ২৭এ ফাল্গুন জেনারল এসেম্ব্লি কলেজে এক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। রামেন্দ্রসুন্দর ঐ সভার সভাপতি ছিলেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর ঐ সভায় 'সফলতার সদুপায়' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

রঙ্গপুরের সপ্তপুষ্করিণীর জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, বাঙ্গালার প্রতিজেলায় পরিষদের শাখাসভা স্থাপন করা হউক, এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব করেন। বহু আলোচনার পর পরিষদে তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ শাখাসভা পরিচালনের জন্য নিয়মাদির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার ভার রামেন্দ্রসুন্দরের উপর অর্পিত হয়।

রামেন্দ্রসুন্দরের যত্নে সেই বৎসর হইতে সাহিত্য-পরিষৎ পঞ্জিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি ঐ বৎসর গৃহনির্ম্মাণ, গ্রন্থরচনা, শব্দ এবং গ্রন্থপ্রকাশ সমিতির সভ্য, এবং পরিভাষা সমিতির সম্পাদক ছিলেন।

১৩১২ বঙ্গাব্দে দীঘাপতেয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমারের অর্থানুকূল্যে রামেন্দ্রসুন্দরকৃত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ অর্দ্ধেকের অধিক মুদ্রিত হইয়াছিল।

পরিষদের গৃহনির্ম্মাণ সমিতি ব্যতীত ১৩০৯ সালের পূর্ব্বে অনেকগুলি সমিতি ছিল। উহাদের সংখ্যাধিক্যের জন্য কার্য্যাবলী আশানুরূপ অগ্রসর হয় নাই। সেই কারণে গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি, পরিভাষা সমিতি, ভাষাবিজ্ঞান সমিতি, শব্দ সমিতি ও গ্রন্থরচনা সমিতি এই মোট পাঁচটি শাখা সমিতি এক প্রকার স্থায়ী ভাবে গঠিত হইয়াছিল। পরিভাষা সমিতি ও উদ্ভিদ্‌পরিভাষা সমিতি মিলিত হইয়া পরিভাষা সমিতি নামক একটি মূল শাখাসমিতি গঠিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দর তাহার সম্পাদক হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি নবগঠিত গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি, ভাষা-বিজ্ঞান সমিতি, শব্দ সমিতি, গ্রন্থরচনা সমিতি এবং গৃহনির্ম্মাণ সমিতিরও সভ্য ছিলেন।

পরীক্ষার্থী ও অন্যান্য ছাত্রগণের অভ্যর্থনার জন্য ২০এ চৈত্র পরিষদের পক্ষ হইতে মিনার্ভা থিয়েটারে একটি ছাত্রসভার অধিবেশন হয়। উপস্থিত ছাত্রগণে থিয়েটারগৃহ পূর্ণ হইয়া যায়। সভাপতির আদেশক্রমে সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ছাত্রগণের সম্মুখে একটি অভিভাষণ পাঠ করেন, এবং ছাত্রগণকে আগামী বৎসর সাহিত্য-পরিষদের জন্য প্রাদেশিক সাহিত্যসঙ্কলন ও প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে উদ্যোগী হইতে উপদেশ দেন।

ঐ বৎসর নূতন আইন অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি পরিবর্ত্তিত হইতেছিল বলিয়া তিনি চতুর্থ অধিবেশনে বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে পরিষদের কর্ত্তব্য নিরূপিত করিবার উদ্দেশ্যে একটি শাখাসমিতি স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন; প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ শাখাসমিতি তৎকালীন অবস্থা বিবেচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাই। ঐ বৎসর সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি সারদাচরণ মিত্র ৺ রজনীকান্ত গুপ্তের একখানি তৈল চিত্র পরিষৎ গৃহে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই সভায় রামেন্দ্রসুন্দর "সাহিত্যে রজনী কান্ত গুপ্তের স্থান" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। রঙ্গপুর ভাগলপুর এবং রাজসাহীতে পরিষদের শাখাসমিতি স্থাপিত হয়। সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকরূপে রামেন্দ্রসুন্দরকে তজ্জন্য কিছু পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল।

শান্তিপুর হইতে ৺ যশোদানন্দন প্রামাণিকের পত্নী অনেকগুলি মূল্যবান্ অপ্রকাশিত গ্রন্থ পরিষৎকে উপহার দিয়াছিলেন। পুঁথির সংখ্যা প্রায় এক শত। উক্ত পুঁথিসংগ্রহ ব্যাপারে রামেন্দ্রসুন্দরই একমাত্র উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার ছাত্র সুধাময় প্রামাণিক ঐ কার্য্যে তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন। সেওড়াফুলির শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ পরিষৎকে একরাশি গ্রন্থ দান করেন। উহার মধ্যে নব্য ন্যায়শাস্ত্রের অনেকগুলি মূল্যবান্ গ্রন্থ ছিল। আদি ব্রহ্মসমাজ লাইব্রেরী হইতে পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র-

নাথ ঠাকুর অনেকগুলি পুরাতন পুস্তিকা সাহিত্য-পরিষৎকে দান করিয়াছিলেন। ঐ সকল পুঁথির একটা বিবরণ প্রস্তুত করিবার জন্য সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দরকে ভার দেওয়া হইয়াছিল।

১৩১১ সালে বঙ্গ বিভাগের প্রথম প্রস্তাব উঠিয়াছিল; রাজনীতি আলোচনা পরিষদের অধিকারের বহির্ভূত হইলেও জাতীয় বিপৎপাতে পরিষৎ একবারে নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন নাই। ষ্টার থিয়েটারে একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া বঙ্গদেশ বিভক্ত করিলে বঙ্গভাষার ও বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি ও পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটিবে, এই মর্ম্মে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিবাদপত্র পাঠান হইয়াছিল। রামেন্দ্রসুন্দর উহাতে একজন বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে পরিষৎ দ্বিতীয় বার প্রতিবাদপত্র পাঠাইবার আয়োজন করিতেছিলেন, এমন সময় সহসা ঘোষণাপত্র বঙ্গের উপর নিক্ষিপ্ত হইল। ৩০এ আশ্বিন রাখী বন্ধনের দিন পরিষদের গৃহের উপর "বন্দে মাতরম্" ধ্বজা স্থাপন করিয়া গভীর হৃদয়োচ্ছ্বাসের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করা হয়।

হায়দ্রাবাদের শ্রীযুক্ত সিদ্ধমোহন মিত্র (ডেকান গেজেটের সম্পাদক) সাহিত্য-পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি আরবী ও পারসী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় অক্ষরান্তরিত করিবার ভার পাইয়াছিলেন, কিন্তু কোন কার্য্যই করেন নাই। তিনি ঐ সময়ে য়ুরোপ ও আমেরিকা যাইবেন এই কথা প্রকাশ করেন। সাহিত্য-পরিষৎ পাশ্চাত্য সাহিত্যসমাজগুলির সহিত বিশেষতঃ লণ্ডনের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য তাঁহাকে প্রতিভূ নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে কোনরূপ নিয়োগ পত্র প্রদান করা হয় নাই। তিনি ইংলণ্ডে গিয়া তথায় পরিষদের প্রতিভূ বলিয়া নিজের পরিচয় দেন, এবং বঙ্গবিভাগের সমর্থন করেন। তথাকার সংবাদপত্রাদিতে তিনি উহার আলোচনাও করেন। রামেন্দ্রসুন্দর টেলিগ্রাম ও পত্রাদির দ্বারা তাঁহার সেই অবৈধ কার্য্যের প্রতিবাদ করেন।

বঙ্গবিভাগের পর বাঙ্গালীর ঐক্যবন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য বর্ষে বর্ষে বঙ্গের বিভিন্ন নগরে সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যবস্থা করিলে সাহিত্যসেবীদের মিলন ও বিবিধ তত্ত্বের আলোচনা চলিতে পারে, এই মর্ম্মে সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর টাউন হলে প্রকাশ্য সভায় "অবস্থা ও ব্যবস্থা" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, এবং সম্মিলনের অনুষ্ঠান করিতে সকলকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বৎসরের শেষ ভাগে রঙ্গপুর ও বরিশাল উভয় স্থান হইতে পরিষৎ সাহিত্যসম্মিলনের নিমন্ত্রণ পান। সেই সময়ে বরিশালে বঙ্গের প্রাদেশিক সমিতি বসিবার কথা ছিল, সেই জন্য রঙ্গপুরে সম্মিলন স্থগিত রাখিয়া বরিশালে অধিবেশন হওয়া স্থির হয়। সেই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ পরিষদের পক্ষ হইতে বরিশালে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

পুলিশ প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দেয়। ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দেন ঐ মণ্ডপে কেহ "বন্দে মাতরম্" মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিবে না। প্রাদেশিক সমিতির অদৃষ্টে যাহা ঘটিল, সাহিত্যসম্মিলনের অদৃষ্টে সেরূপ ঘটা অসম্ভব নহে, এই আশঙ্কায় তথায় আর উহা হইল না।

ঐ বৎসর রামেন্দ্রসুন্দর কতকগুলি ইংরাজী পুস্তক পরিষৎকে উপহার দিয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় তাঁহার লিখিত "বাঙ্গালা কারক প্রকরণ" ও "না" শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৩১৩ সালে রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গ বিভাগের পর স্বদেশী আন্দোলনের সময় স্বদেশের শিল্পজাত সামগ্রীর উন্নতি সাধনকল্পে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্মিলিত হইয়া কলিকাতায় একটি স্বদেশী শিল্পপ্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের বাহিরে পরিষদের প্রচার উদ্দেশ্যে উক্ত প্রদর্শনী ক্ষেত্রে পরিষৎ তাহার সংগৃহীত দ্রব্যসমূহের একটি

প্রদর্শনী খুলিবার সঙ্কল্প করেন। ঐ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য রামেন্দ্রসুন্দর যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সাধারণের চিত্ত আকৃষ্ট করিবার জন্য ঐ প্রদর্শনী এক মাসেরও উর্দ্ধকাল খুলিয়া রাখা হয়। ঐ স্থানে প্রদর্শনের জন্য বাঙ্গালাদেশের নানাস্থান হইতে পুরাতত্ত্ব ও পুরাতন ইতিহাস সম্পর্কীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিবার জন্য কয়েকজন উদ্যোগী বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় রাঢ় কান্দি অঞ্চলে পর্য্যটন করিয়া অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদিগের আলোচনার সামগ্রী দেখিয়া আসেন; পরে তিনি উক্ত স্থান, নানা দেব-দেবীর মূর্ত্তি, পুষ্করিণী, প্রস্তরফলক ইত্যাদি সম্বন্ধে এক সারগর্ভ প্রবন্ধ দশম অধিবেশনে পাঠ করেন।

প্রদর্শনী ক্ষেত্রের সংগৃহীত দ্রব্যসকল দর্শন করিয়া, প্রাচীন জিনিষ দর্শন, রক্ষণ ও সংগ্রহ যে বিশেষ তৃপ্তির, আদরের এবং গৌরবের তাহা লোকে বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। ঐ সকল দ্রব্য এবং আরও বিস্তর দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া পরিষদে একটি মিউজিয়ম স্থাপন করিবার জন্য অনেক বিজ্ঞ লোক উপদেশ দিয়াছিলেন। পরিষদের অট্টালিকা নির্ম্মিত হইলে ঐ বিষয়ের ব্যবস্থা করা হইবে শুনিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশের সকল শ্রেণীর লোকের নিকট এবং বাঙ্গালার বাহিরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকের নিকট পরিষদের নাম ও উদ্দেশ্য বিশেষ ভাবে প্রচার করিবার জন্য রামেন্দ্রসুন্দর ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় পরিষদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পুস্তিকাকারে ছাপাইয়া মেলার মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন।

ঐ বৎসর পঞ্চম অধিবেশনে রামেন্দ্রসুন্দর সভ্যদিগকে বলিয়াছিলেন যে, "আমি শ্রীযুক্ত মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত মনিমোহন সেন মহাশয়কে বহরমপুরে সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বানের জন্য পত্র লিখিয়াছিলাম। তাঁহারা

আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আগামী ১৭।১৮ই চৈত্র প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলনের আয়োজন করিতেছেন। সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গের যাবতীয় সাহিত্য সেবীকে এই সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছেন। এই সম্মিলন বার্ষিক অনুষ্ঠানে পরিণত হইলে সাহিত্যের মহোপকার সাধিত হইবে।"

১৩১২ সালের পূর্ব্বে পরিষদের অনেকগুলি শাখাসমিতি ছিল, উহাদিগকে পুণর্গঠিত করিয়া মোট পাঁচটি শাখা-সমিতি স্থাপিত হয়; কিন্তু সমিতিগুলির কার্য্য অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া উহাদিগকে পুনঃ সংস্কৃত করিয়া ১৩১৩ সালে দুইটি সমিতিতে পরিণত করা হয়—গ্রন্থ-প্রকাশ সমিতি ও শব্দ সমিতি; পূর্ব্বতন সমিতি হইতে সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া এই দুইটি সমিতি গঠিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দর উভয় সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

৺অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রস্তাব করেন, পরিষৎ তাঁহার পিতামহের মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইলে, তিনি তাহার এক তৃতীয়াংশ ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত আছেন। তদুত্তরে সম্পাদক মহাশয় বলেন, অট্টালিকা প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত পরিষৎ কোন বহুব্যয়-সাধ্য কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না; সুতরাং ঐ প্রস্তাব তখন স্থগিত রাখা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা প্রচলনের জন্য রামেন্দ্রসুন্দরের মনে একটা প্রবল আগ্রহ ছিল। পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিসঙ্কলন সমিতির সভ্য ছিলেন। তাঁহার প্রস্তাবানুসারে স্থির হয়, প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ইতিহাসের পরীক্ষায় বাঙ্গালায় উত্তর লিখিতে পারিবেন, এবং প্রবেশিকা, মধ্য ও বি, এ পরীক্ষায় প্রত্যেক ছাত্রকে বাঙ্গালা ভাষায় বা মাতৃভাষায় স্বতন্ত্র পরীক্ষা

দিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইলে রামেন্দ্রসুন্দর বড়ই আনন্দিত হন।

১৩১৪ সালে রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি এবং গৃহ নির্ম্মাণ সমিতির সম্পাদক ছিলেন। মার্টিন কোম্পানী পরিষদের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য নক্সা প্রস্তুত করিয়া ২৮০০০৲ টাকা এষ্টিমেট দিয়াছিলেন; কিন্তু উহা পরিষদের পক্ষে দুর্ব্বহ। মার্টিন কোম্পানির নক্সাখানি ক্রয় করিয়া লইয়া উহার অনুযায়ী গৃহ নির্ম্মাণের জন্য সম্পাদক টেণ্ডার আহ্বান করেন। কন্‌ট্রাক্টর করুণাময় গঙ্গোপাধ্যায় ১৮০০০৲ টাকায় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতে স্বীকৃত হন। সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর তখন লালগোলার রাজা বাহাদুরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কাশিমবাজারের সাহিত্য-সম্মিলনে লালগোলার রাজা বাহাদুর সম্পাদকের প্রার্থনা পূরণের আশা দেন। দ্বিতীয় তল নির্ম্মাণের জন্য সমগ্র ব্যয় তিনি নিজে করিতে প্রতিশ্রুত হন। উক্ত কার্য্যে ১০০৫৮৲ টাকার প্রয়োজন হয়। রাজা বাহাদুর সম্পাদককে সমগ্র টাকা দান করেন। তাহাতে সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরের দ্বিতীয় তল নির্ম্মিত হয়।

১৩১৩ সালে বহরমপুরে পুনরায় সম্মিলনের উদ্যোগ হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদবাসীদের সহযোগে সাহিত্য-পরিষৎ স্বয়ং উদ্যোগভার গ্রহণ করেন। মুর্শিদাবাদের পক্ষ হইতে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এবং সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সাহিত্যসেবীদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র ঐ কার্য্যে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন; অকস্মাৎ তাঁহার পুত্রবিয়োগ ঘটে, সেই কারণে তখন সম্মিলন স্থগিত রাখা হয়। পূজার পূর্ব্বে সম্মিলন পুনরাহ্বানের সঙ্কল্প করিয়া মহারাজ সম্পাদককে পত্র লেখেন, এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া উদ্যোগে প্রবৃত্ত হন।

১৭ই ও ১৮ই কার্ত্তিক সম্মিলনের দিন ধার্য্য হয়। কাশিমবাজারের রাজবাড়ীতে সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ঐ সভায় সভাপতির অভিভাষণ পাঠের পর সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন * * * "বর্ত্তমান কালে দেশে যে হাওয়া বহিতেছে, তাহাতে দেশের লোককে দল বাঁধিয়া সমবেত শক্তি প্রয়োগে কোন্ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে বলিতেছে, তাহাই যথাসাধ্য বিবৃত করিতে আমি চেষ্টা করিতেছি।

"আমরা সাহিত্য-সেবী, আমরা কিরূপে মার অর্চ্চনা করিব? আমরা যে মার কোলে অবস্থান করিয়া তাঁহার স্তন্য পানে বর্দ্ধিত হইয়াছি, সেই মাকে আমরা ভালরূপে চিনিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। যে দিন আমরা চিনিতে পারিব, সেদিন আমাদের সাধনা পূর্ণ হইবে। * * *

"সাহিত্য-পরিষৎ একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিতে চাহেন, যেথানে বসিয়া আমরা বাঙ্গালাদেশকে ও বাঙ্গালী জাতিকে প্রত্যক্ষ ভাবে ও স্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাইব। সেইখানে বসিয়া আমরা বঙ্গভূমির বর্ত্তমান অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে পারিব ও অতীত ইতিহাসের সম্যক্‌রূপে আলোচনার সুযোগ পাইব। সেই মন্দিরের এক পার্শ্বে একটি পুস্তকালয় থাকিবে, সেথানে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত, মুদ্রিত, অমুদ্রিত, প্রকাশিত, অপ্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থ সংগৃহীত হইবে। * * * আর এক স্থানে বাঙ্গালার পুরাতত্ত্বের উপাদান সংগৃহীত হইবে। * * * মন্দিরের অন্য স্থানে আমরা বঙ্গের সাহিত্যিকগণের চিহ্ন দেখিতে পাইব। * * * আর এক স্থানে বাঙ্গালার কর্ম্মবীরদের স্মৃতিচিহ্নের সংগ্রহ থাকিবে। * * * বাঙ্গালার বিখ্যাত জমিদারবংশের ইতিবৃত্ত আমরা সেথানে জানিতে পারিব। বাঙ্গালার ফুলফল, লতাপাতা, গাছপালা, জীবজন্তু, শিল্পসম্ভারের নমুনা

দেখিয়া আমরা বঙ্গভূমিকে চিনিয়া লইব। এই মন্দিরকেই আমি মাতৃ-মন্দির নাম দিতে পারি, ও এই মন্দিরমধ্যে সংগৃহীত দ্রব্যসম্ভারকে আমি মাতৃপ্রতিমা নাম দিতে পারি। সাহিত্য-পরিষদের এই আশার কথা ও আকাঙ্ক্ষার কথা আমি বহু আশা বুকে বাঁধিয়া সাহিত্য সম্মিলনের সম্মুখে স্থাপন করিতে সাহসী হইয়াছি। আশা করি আপনারা ইহার অনুমোদন করিবেন। আমাদের প্রত্যেকের শক্তি সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ; "অল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ" যখন কার্য্য সাধিকা হয়, তখন আপনাদের শক্তিসমষ্টির পক্ষে এই প্রতিমা প্রতিষ্ঠা অসাধ্য না হইতেও পারে।" ঐ সম্মিলনক্ষেত্রে বহরমপুরে একটি শাখা-সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপন করিবার সঙ্কল্প স্থির হয়। ময়মনসিংহে একটি সাহিত্য-সম্মিলন ছিল, ঐ বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে তাহা সাহিত্য পরিষদের শাখাসমিতিরূপে গৃহীত হয়।

কুমার শরৎকুমারের অর্থসাহায্যে কবিকঙ্কণের স্বহস্তলিখিত চণ্ডী গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হয়। উহার সম্পাদনের ভার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের উপর অর্পিত হয়। মূল পুঁথিখানি পরিষদের সম্পাদক বংশীধর বাবুর নিকট হইতে উচিত মূল্য দিয়া ক্রয় করেন। দীনেশ বাবুর নিকট হইতে বংশীধর বাবু গ্রন্থখানি লইয়া যান কিন্তু আর ফিরাইয়া দেন নাই। পরে পরিষৎ তাঁহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী আদালতে অভিযোগ করিয়াছিলেন, মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হইতেই বংশীধর বাবু ইহলোক ত্যাগ করেন।

সেই বৎসর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দর "গ্রামদেবতা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে তাঁহার জন্মস্থান জেমোকান্দির গ্রামদেবতা রুদ্রদেবের একটি বিস্তৃত বিবরণ, এবং পত্রিকার ৬৫ পৃষ্ঠায় "ধ্বনিবিচার" নামক আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৩১৫ সাল সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে স্মরণীয় বৎসর। সে বৎসর রামেন্দ্র-

সুন্দর পরিষদের সম্পাদক এবং গ্রন্থ-প্রকাশ সমিতি ও শব্দ সমিতির সভ্য ছিলেন। ২৯এ অগ্রহায়ণ শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮টার সময় শুভ মুহূর্ত্তে সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি, সম্পাদক ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অন্যান্য সদস্যগণ পুরাতন গৃহ হইতে যাত্রা করিয়া পদব্রজে নূতন মন্দিরে প্রবেশ করেন। লালগোলার শ্রীযুক্ত রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া আনন্দ ও উৎসাহসহকারে সেই শুভযাত্রায় যোগ দেন। মঙ্গলঘটশোভিত মন্দিরদ্বারে সহকারী সম্পাদক ব্যোমকেশ মুস্তফী চন্দন এবং পুষ্পমাল্যদ্বারা তাঁহাদিগের সংবর্দ্ধনা করিলেন। মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলে আসন গ্রহণ করিলে, তাঁহাদের সম্মুখে রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের একটি স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপনের কথা তুলেন; উপস্থিত ব্যক্তিগণ সকলেই তাহাতে সম্মত হইয়া প্রত্যেকে মঙ্গলঘটের নিকট এক টাকা স্থাপন করেন; এইরূপে স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপনের সূচনা হয়। সেই দিন মধ্যাহ্নকালে মন্দিরমধ্যে স্বস্ত্যয়নাদির অনুষ্ঠান হয়।

২১এ অগ্রহায়ণ রবিবার অপরাহ্ণ চারিটার সময় পরিষদের নব গৃহ প্রবেশ উপলক্ষে উৎসব সভার অনুষ্ঠান হয়। ঐ সভায় যোগদান করিবার জন্য পরিষদের সকল শ্রেণীর সভ্য, কলিকাতার যাবতীয় সাহিত্য-সমিতি, শিক্ষা-সমিতি, চতুষ্পাঠী ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সর্ব্ব-শ্রেণীর গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত দেশহিতৈষী ও সাহিত্যভক্তগণকে নিমন্ত্রণ করা হয়। রঙ্গপুর, ভাগলপুর, ময়মনসিংহ, রাজসাহী ও মুরশিদাবাদ পরিষৎ-শাখা হইতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ আগমন করেন। উৎসব সভার সজ্জা, অভ্যাগতগণের সংবর্দ্ধনা ও সভায় শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষা প্রভৃতি কার্য্য ছাত্র সঙ্ঘের দ্বারা সম্পন্ন হয়।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহুপূর্ব্বেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইলেন।

দ্বিতীয় তল পূর্ণ হইয়া গেল। এমন কি লোকের ভারে পার্শ্বের গ্যালারী ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল, তখন নিম্নতলে একটি স্বতন্ত্র সভার প্রয়োজন হইল। উপরতলে সারদাচরণ মিত্র ও নিম্নতলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। অপরাহ্ণ ৫ টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। যথারীতি সঙ্গীত ও বক্তৃতাদির পর সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপনে সাহায্য করিবার জন্য দেশের অভিজাতগণের নিকট প্রার্থনা করেন। ভাণ্ডারের সাহায্যার্থ সেই সভাস্থলে ১৯৫০০৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। পরে সভাপতি মহাশয় দ্বিতল ও নিম্নতলে স্থাপিত বাঙ্গালার বিখ্যাত ব্যক্তিগণের কতকগুলি আলেখ্যের আবরণ উন্মোচন করেন। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সুচারুরূপে সভার কার্য্য চলিয়াছিল। তৎপরে সকলেই মিষ্ট মুখ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৩০৬ সালে রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-পরিষদের নব গৃহ প্রতিষ্ঠার যে আশা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ভগবানের কৃপায় দশ বৎসর পরে তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল। তিনি তাই আনন্দসহকারে বলিয়াছিলেন—"মুর্শিদাবাদ নিবাসী মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্রের প্রদত্ত ভূমির উপর নূতন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, মুর্শিদাবাদ নিবাসী রাজা যোগীন্দ্র-নারায়ণের ব্যয়ে উহার দ্বিতীয় তল সম্পূর্ণ হইয়াছে, মুর্শিদাবাদ নিবাসী রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর গৃহতল মর্ম্মরমণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন। মুর্শিদাবাদের সহিত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সম্পর্ক এইরূপে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া মুর্শিদাবাদ নিবাসী বর্ত্তমান সম্পাদক যদি কিছু আনন্দ ও গর্ব্ব বোধ করেন, তাহা অবশ্যই মার্জ্জনীয় হইবে।"

ঐ বৎসর ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ মুদ্রিত হইলে, অনুবাদক রামেন্দ্রসুন্দর উহার একটি সুবৃহৎ ভূমিকাও মুদ্রিত করেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির

১৪৬পৃষ্ঠা
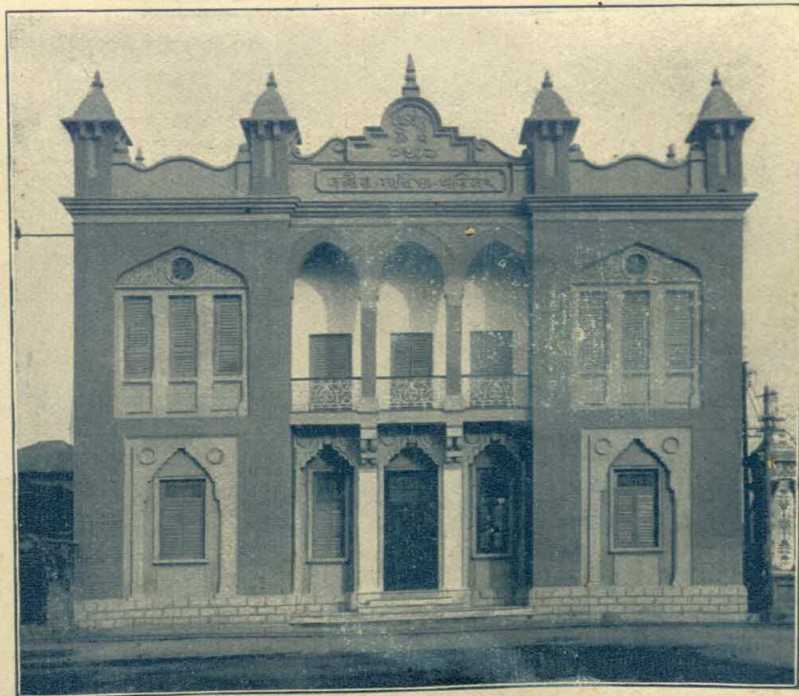
২৫এ পৌষ সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর নব নির্ম্মিত মন্দিরে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রথম অধিবেশনে তদানীন্তন সভাপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া এক অভিনন্দন পাঠ করেন।

১৮।১৯এ মাঘ রাজসাহীতে সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। ঐ অধিবেশনে রামেন্দ্রসুন্দর উপস্থিত ছিলেন। তিনি সভাস্থলে বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে উত্তর বঙ্গ হইতে উপকরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক গ্রন্থ প্রকাশ করিবার জন্য রাজসাহী শাখা-পরিষৎকে অনুরোধ করিবার প্রস্তাব করেন।

লালগোলার রাজা বাহাদুর ১৩১০ সাল হইতে প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ-সমিতির সাহায্যার্থ বার্ষিক ৩০০৲ টাকা হিসাবে দান করিতেছিলেন। ঐ বৎসর হইতে তিনি ৩০০৲ টাকার স্থলে ৪০০৲ এবং পত্রিকা প্রকাশের জন্য বার্ষিক ৪০০৲ সাহায্য করিবার অভিপ্রায় সম্পাদক মহাশয়কে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সেই বৎসর সম্পাদক মহাশয় কয়েকজন কর্ম্মী সদস্যের সহায়তায় বিখ্যাত সাহিত্যিকগণের চিত্র ও স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রিকাধ্যক্ষের সাহায্যকারী নির্ব্বাচিত হন।

সাহিত্য-পরিষৎ ভারতীয় চিত্রশালার ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ হাভেল সাহেব ও কাশ্মীররাজকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন। উভয় সভায় রামেন্দ্রসুন্দর সভাপতি ছিলেন।

১৩১৬ সালে রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। ২রা বৈশাখ সাহিত্য-পরিষৎ রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সংবর্দ্ধনার জন্য একটি সান্ধ্য-সমিতির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ঐ সান্ধ্য-সম্মিলন কার্য্যের এক জন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

সাহিত্য-পরিষৎ প্রাচীন সাহিত্য ও প্রত্নতত্ত্ব লইয়াই অতিমাত্র ব্যাপৃত ছিলেন, আধুনিক বিজ্ঞানাদির আলোচনায় ও প্রচারে তাদৃশ মনোযোগ দিতেন না, এইরূপ অনুযোগ প্রায়ই শুনা যাইত। তাহার কয়েকটি কারণ ছিল। স্বাধীনভাবে বিজ্ঞানচর্চ্চায় নিযুক্ত পণ্ডিতের সংখ্যা অতি কম ছিল। ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা তাঁহারা ইংরাজী ভাষাতেই করিতেন ; কারণ বাঙ্গালা ভাষায় আলোচনা করিলে সমুচিত আদরের সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি পরিষৎ এ বিষয়ে যথাসাধ্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের দ্বারা বিবিধ বিজ্ঞান বিষয়ে ধারাবাহিক উপদেশ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ২রা আশ্বিন সেই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। পরিষৎ-সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ধারাবাহিক বিজ্ঞান আলোচনার উপক্রমণিকাস্বরূপ 'মায়াপুরী' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এই কর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। প্রবন্ধটি 'সাহিত্য' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়, এবং পরে পরিষৎ গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়।

ঐ বৎসর পরিষদের সভাপতি শারদাচরণ মিত্র অভিভাষণে বলিয়া ছিলেন, "পরিষৎ বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতিসোপানের পথপ্রদর্শক, সুতরাং সমস্ত বঙ্গবাসী শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রমুখ মহোদয়গণের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ।"

১৩১৭ সালে সাহিত্য-পরিষৎ পরমহিতৈষী লালগোলার রাজা বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের সংবর্দ্ধনার জন্য ঠাকুর প্রাসাদে একটি সম্মিলনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সম্মিলনে কলিকাতাবাসী সভ্যগণ ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভাভঙ্গের পর গীতবাদ্য ও মিষ্টান্নের ব্যবস্থা ছিল। রাজাবাহাদুর পরিষদের স্থায়ী ধন-ভাণ্ডারে সঙ্কল্পিত ৫০০০০৲ টাকার এক চতুর্থাংশ নিজেই দান করিবেন, এই কথা সভাস্থলে জ্ঞাপন করিবার জন্য সভাপতি মহাশয়কে অনুরোধ

করেন। পরিষদের প্রতি এই রাজোচিত অনুগ্রহ প্রকাশে সভাস্থল হর্ষকোলাহলপূর্ণ হইয়া উঠে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিখ্যাত গ্রন্থরাজির কথা অনেকেই বিদিত আছেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী ঋণদায়ে উহা মহাজনের নিকট বন্ধক রাখিয়াছিলেন। গ্রন্থগুলি নীলামে বিক্রীত হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইলে উহার রক্ষার জন্য রামেন্দ্রসুন্দরের উদ্যোগে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। ঋণী ও ধনী উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে উহা পরিষৎ মন্দিরে আনিয়া রক্ষিত হয়। পরে প্রকাশ্য নীলামে উহা বিক্রীত হইবে এইরূপ বিজ্ঞাপন বাহির হইলে উহা লালগোলার রাজাবাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কীর্ত্তি রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে উহা ক্রয় করিয়া সাহিত্য-পরিষদের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দেন।

সাহিত্য-পরিষদের প্রথম সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত পরলোক গমন করিলে ভাগলপুরের সাহিত্যসম্মিলনের দ্বিতীয় দিবসে রামেন্দ্রসুন্দর প্রস্তাব করিয়াছিলেন—সাহিত্যসম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে তিনি যে সারস্বত ভবন প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সারস্বত ভবনই স্বর্গীয় রমেশচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ‘রমেশ সারস্বত ভবন’ নামে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সমস্ত ভারতবর্ষের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা হইবে। তজ্জন্য একটি সমিতিও স্থাপিত হইয়াছিল। সেই উপলক্ষে সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দরের পঠিত প্রবন্ধ চৈত্র মাসের ‘সাহিত্য’ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ভাগলপুরের সম্মিলনে রামেন্দ্রসুন্দর বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যপ্রণালী স্থিরীকরণ ও তাহার নিয়মাবলী প্রণয়নের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা শিক্ষার ও পরীক্ষার প্রণালী ও পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে সংস্কারের প্রস্তাব করিবার জন্য রামেন্দ্রসুন্দর এবং অপর সাতজন সভ্য মিলিয়া একটি সমিতি স্থাপন করেন।

লালগোলার রাজা বাহাদুর গ্রন্থ প্রকাশের সাহায্যকল্পে বার্ষিক ৩০০৲ টাকার স্থলে ৮০০৲ টাকা দান করিতেছিলেন; পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক বৎসর উহার মধ্যে ৪০০৲ টাকা পত্রিকা মুদ্রণকার্য্যে ব্যয় করা হইত। পরে পত্রিকা মুদ্রণের জন্য ঐ টাকা গ্রহণ করিতে হয় নাই। লালগোলার রাজদত্ত ঐ টাকা হইতে ভারত-শাস্ত্রপিটক গ্রন্থাবলী প্রকাশ করার সঙ্কল্প হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মুদ্রণকার্য্য তখন শেষ হইয়াছিল; কিন্তু তাহার ভূমিকা এত বৃহৎ হইয়াছিল যে, উহা একখানি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইতে পারিত। কুমার শরৎকুমার ও লালগোলার রাজা বাহাদুরের প্রদত্ত অর্থ সাহায্যে উহা ভারত-শাস্ত্রপিটক নামক গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।

১৩১৭ সালে রামেন্দ্রসুন্দর ও কয়েকজন কর্ম্মী সদস্যের একান্ত চেষ্টার ফলে চিত্রশালার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। পরিষৎ সেই বৎসর কলিকাতা মিউনিসিপালিটির প্রথম অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হন। ঐ বৎসরের সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় রামেন্দ্রসুন্দর 'শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, এবং পরিষৎকে অনেকগুলি ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক উপহার দেন।

১৩১৮ সালে রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক এবং পরিভাষা ও শব্দ সমিতির সদস্য ছিলেন। তাঁহার পরিকল্পিত রমেশভবনের কার্য্য তখন কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছিল। কাশিমবাজারের মহারাজ ভূমিদানে স্বীকৃত হন। পৌষ মাসে বড় দিনের ছুটির সময় প্রস্তাবিত রমেশভবনের জন্য সংগৃহীত দ্রব্যাদি ভারত সম্রাটের আগমনে এবং কংগ্রেস প্রভৃতি উপলক্ষে কলিকাতায় সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে দেখাইবার জন্য এক প্রদর্শনী খোলা হয়। প্রদর্শনী ছয় সপ্তাহ কাল খোলা ছিল।

১৯এ ফাল্গুন চুঁচুড়া সহরে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল।

সেই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে এবং রামেন্দ্রসুন্দর ও শশধর রায় মহাশয়ের ব্যবস্থা অনুসারে দ্বিতীয় দিবস প্রাতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি বিশেষজ্ঞের দ্বারা আলোচিত ও পঠিত হইয়াছিল। বিজ্ঞান বিভাগের কার্য্য কি ভাবে পরিচালিত হইবে, তদ্বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের গৃহে এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই ঐ বিষয়ের কোন না কোন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৩১৮ সালে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথঠাকুর তাঁহার জীবনের পঞ্চাশত্তম বর্ষ অতিক্রম করিলে তাঁহার যথোচিত অভিনন্দন ও সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য রামেন্দ্রসুন্দর ও কবিবরের বন্ধুগণ মিলিত হইয়া একটি সমিতি স্থাপন করেন। সমিতি বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষৎকে ঐ কার্য্য নিষ্পন্ন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তদনুসারে ১৪ই মাঘ পরিষদের সভাপতি সারদাচরণ মিত্রের নেতৃত্বে টাউন হলে এই সংবর্দ্ধনার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। দেশমান্য বহু ব্যক্তির সমাগমে টাউনহল পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে সম্পাদকরূপে রামেন্দ্রসুন্দর কবিবরকে সম্বোধন করিয়া এক অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। পত্রখানি শুভ্র হস্তিদন্তনির্ম্মিত ফলকে প্রচীন পুঁথির আকারে প্রস্তুত ও সুবর্ণখচিত কিংখাপে মণ্ডিত ছিল। পাঠান্তে রামেন্দ্রসুন্দর উহা কবিবরের হস্তে প্রদান করেন।

অভিনন্দন

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় করকমলেষু—

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের নবাভ্যুদয়ে নূতন প্রভাতের অরুণ-কিরণ পাতে যখন নব শতদল বিকশিত হইল, ভারতের সনাতনী বাগ্দেবতা তদুপরি চরণ অর্পণ করিয়া দিগন্তে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমনি দিগ্বধুগণ

প্রসন্ন হইলেন, মরুদ্‌গণ সুখে প্রবাহিত হইলেন, বিশ্বদেবগণ অন্তরীক্ষে প্রসাদ-পুষ্প বর্ষণ করিলেন, ঊর্দ্ধ ব্যোমে রুদ্রদেবের অভয়ধ্বনি ঘোষিত হইল, নবপ্রবুদ্ধ সপ্তকোটি নরনারীর হৃদয়মধ্যে ভাবধারা চঞ্চল হইল। বঙ্গের কবিগণ অপূর্ব্ব স্বরলহরীর যোজনা করিয়া দেবীর বন্দনাগানে প্রবৃত্ত হইলেন, মনীষিগণ স্বহস্তরচিত কুসুমোপহার তাঁহার শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

কবিবর, পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে এক শুভ দিনে তুমি যখন বঙ্গ-জননীর অঙ্ক শোভা বর্দ্ধন করিয়া বাঙ্গলার মাটি ও বাঙ্গলার জলের সহিত নূতন পরিচয় স্থাপন করিলে, বঙ্গের নব জীবনের হিল্লোল আসিয়া তখন তোমার অর্দ্ধস্ফুট চেতনাকে তরঙ্গায়িত করিয়াছিল; সেই তরঙ্গাভিঘাতে তোমার তরুণ জীবন স্পন্দিত হইল; সেই স্পন্দন-প্রেরণায় তোমার কিশোর হস্ত নব নব কুসুমসম্ভার চয়ন করিয়া বাণীর অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইল। তোমার পূর্ব্বগামিগণের স্নিগ্ধ নেত্র তোমাকে বর্দ্ধিত করিল; অনুগামিগণের মুগ্ধ নেত্র তোমাকে পুরস্কৃত করিল; বাগ্দেবতার স্মেরাননের শুভ্র জ্যোতি তোমার ললাট দেশে প্রতিফলিত হইল। তদবধি বাণীমন্দিরের মণি-মণ্ডিত নানা প্রকোষ্ঠে তুমি বিচরণ করিয়াছ; রত্নবেদীর পুরোভাগ হইতে নৈবেদ্যকণা আহরণ করিয়া তোমার দেশবাসী ভ্রাতা ভগিনীকে মুক্ত হস্তে বিতরণ করিয়াছ; তোমার ভ্রাতা ভগিনী দেবপ্রসাদের আনন্দ সুধা পান করিয়া ধন্য হইয়াছে। বীণাপাণির অঙ্গুলি প্রেরণে বিশ্বযন্ত্রের তন্ত্রী সমূহের অনুক্ষণ যে ঝঙ্কার উঠিতেছে, ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে তোমার অগ্রজাত কবিগণের পশ্চাতে আসিয়াও তুমি তাহা কর্ণগত করিয়াছ; সুপর্ণরূপিণী গায়ত্রী কর্ত্তৃক গন্ধর্ব্ব রক্ষিত অমৃতরসের দেবলোকে নয়নকালে মর্ত্ত্যোপরি যে ধারা বর্ষণ হইয়াছিল, পৃথিবীর ধূলিরাশি হইতে নিষ্কাশিত করিয়া নরলোকে সেই অমৃত কণিকার বিতরণে তোমার সহকারিতা

গ্রহণ দ্বারা তাঁহারা তোমায় কৃতার্থ করিয়াছেন। পঞ্চাশৎ সংবৎসর তোমাকে অঙ্কে রাখিয়া তোমার শ্যামা জন্মদা তোমাকে স্নেহ পীযূষে বর্দ্ধন করিয়াছেন, সেই ভুবনমনোমোহিনীর উপসনাপরায়ণ সন্তানগণের মুখস্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বিশ্বপিতার নিকট তোমার শতায়ুঃ কামনা করিতেছেন।

কবিবর, শঙ্কর তোমায় জয়যুক্ত করুন।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক।

সেই অভিনন্দন সম্বন্ধে কলিকাতার কোন কোন ভদ্রমহলে অল্প-বিস্তর একটা আন্দোলন উপস্থিত হয়; তাহার জন্য সম্পাদককে অনেকের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সেই সম্বন্ধে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

১২, পশিবাগান লেন, কলিকাতা।
২০এ মাঘ, ১৩১৮

আপনার পত্র পাইয়া আনন্দ লাভ করিলাম। রবীন্দ্রসংবর্দ্ধনার বিবরণ সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে, তৎসহিত অভিনন্দন পত্রখানিও প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্র পাঠে দেখিবেন, রবীন্দ্রবাবুর পঞ্চাশ বর্ষ বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে তাঁহার বহুবৎসরের সাহিত্যসেবার উপলক্ষ করিয়া (পরিষৎ) দীর্ঘায়ু কামনা করিয়াছেন মাত্র; কোনরূপ রাজ্যে বা সাম্রাজ্যে অভিষেক করেন নাই, কোনরূপ পদবী দেন নাই, বা সাহিত্য ক্ষেত্রে অন্যের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার স্থান নির্দ্দেশের বা পদবী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন নাই। রবীন্দ্রবাবুর সাহিত্য-ক্ষেত্রে স্থান লইয়া মতভেদ আছে ও চিরকাল থাকিবে; সাহিত্য-পরিষৎ সে বিষয়ে কোনরূপ মত প্রকাশ করিয়া ধৃষ্টতা দেখাইবেন না, বা দেখান নাই। তবে

তিনি বহু বৎসর সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন, সেই উপকারের পরিমাণও সামান্য নহে, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই ; কাজেই একটা উপলক্ষ পাইয়া তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ সম্মান প্রদর্শন করায় পরিষদের কোনরূপ অপরাধ হইয়াছে বলা উচিত নহে। অন্যান্য সাহিত্যসেবক ও সাহিত্য অনুগ্রাহকগণকেও পরিষৎ এইরূপে যথাযোগ্য ও যথাসাধ্য সম্মান-প্রদর্শনে চিরকাল প্রস্তুত আছেন ও থাকিবেন। তাহার নজিরও আছে। বহুদিন পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা প্রাপ্তি উপলক্ষে তাঁহার সম্মানার্থ বিশেষ উৎসব হইয়াছিল। পরিষদের সভাপতি সারদাচরণ মিত্র হাইকোর্টের বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল। পরিষদের শৈশবে বিদেশী পণ্ডিত বেণ্ডাল সাহেব পরিষদে উপস্থিত হইলে তাঁহার সম্মানার্থ উৎসব অনুষ্ঠান হয়। সে বার পরিষদের স্থাপনকর্ত্তা ৺রমেশচন্দ্র দত্ত কলিকাতা আসিলে তাঁহার সংবর্দ্ধনার ব্যবস্থা হয়। সম্প্রতি বিশ্বকোষ গ্রন্থ সমাপ্তি উপলক্ষে বিশ্বকোষসম্পাদক নগেন্দ্রবাবুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রস্তাব উপস্থিত আছে। পূর্ব্বতন 'সাহিত্য-রথী'দিগেরও সম্মানার্থ পরিষৎ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ কলিকাতা আসিলে পরিষৎ তাঁহার যথোচিত সংবর্দ্ধনা করেন। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির জীবদ্দশায় পরিষৎ তাঁহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাইবার অবসর পান নাই ; কেন না, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায় পরিষদের অস্তিত্ব ছিল না। তথাপি হেমচন্দ্রের শেষ বয়সে অর্থকষ্ট নিবারণের জন্য পরিষৎ যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মর্ম্মর মূর্ত্তির স্থাপন করিয়াছেন ও বার্ষিক বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ৺নবীনচন্দ্রের মর্ম্মর মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা পরিষৎ-মন্দিরে শীঘ্র হইবে। বিদ্যাসাগরের বহু যত্নের লাইব্রেরিটি যখন নিলামে চড়িয়া

বাঙ্গালীর দুই গালে চূণ কালি মাখাইবার উপক্রম করিয়াছিল, পরিষৎ তখন মাঝে পড়িয়া ঐ লাইব্রেরীটি রক্ষা করিয়াছেন, ও উহা পরিষৎ-মন্দিরে সযত্নে রক্ষিত হইয়া বিদ্যাসাগরের জীবন্ত মূর্ত্তিস্বরূপে সাধারণের সম্মুখে রহিয়াছে।

অতএব, রবীন্দ্রনাথের প্রতি সবিশেষ পক্ষপাত করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ একটা অপূর্ব্ব অন্যায় কাজ করিয়াছেন, তাহা বলা চলে না।

অপিচ এই অনুষ্ঠানে পরিষদের এক পয়সাও ব্যয় করিতে হয় নাই। বঙ্গের মান্যগণ্য কতিপয় ব্যক্তি একটি সংবর্দ্ধনার কমিটি স্থাপন করিয়া কয়েক সহস্র টাকা চাঁদা তুলিয়াছেন। এই চাঁদা সর্ব্বসাধারণের নিকট তোলা হয় নাই, তাঁহাদের নিজেরা ও বন্ধুবান্ধবদের নিকট তোলা হয়। পরিষৎকে বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজের মুখপাত্র করিয়া তাঁহারা পরিষৎকে এই অনুষ্ঠানের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। পরিষৎ সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা উচিত বোধ করেন নাই। সেই সংগৃহীত অর্থের কিয়দংশ মাত্র এই অনুষ্ঠানে ব্যয় করা হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশ সাহিত্যের কোনরূপ স্থায়ী উপকারের জন্য পরিষদের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। এখনও হিসাব শেষ হয় নাই; সম্ভবতঃ অন্যূন সাত হাজার টাকা এইরূপে সাহিত্যের স্থায়ী উপকারার্থ পরিষদের হস্তে ন্যস্ত হইবে। পরিষদের হিতৈষী মাত্রই এই সংবাদ পাইলে আনন্দিত হইবেন সন্দেহ মাত্র নাই।

আমাদের কতিপয় শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু কেন যে কলিকাতায় থাকিয়াও ও সমুদয় তথ্য জানিয়াও এই কবিসংবর্দ্ধনা ব্যাপারে এতটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। মফস্বলবাসীরা দূরে থাকেন, সকল তথ্য জানিতে পারেন না; তাঁহাদের মনে নানারূপ আশঙ্কা হওয়া সঙ্গত বটে, কিন্তু যাঁহারা কলিকাতায় আছেন ও অন্তরঙ্গরূপে

আমাদের সহিত কাজ করেন, তাঁহারা যে কেন এইরূপ অমূলক আশঙ্কা ও অভিযোগ করেন, বুঝি না। * * * *

আপনার কুশলপ্রার্থী

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাইবার পর, ১৩২০ সালে ৫ই অগ্রহায়ণ তিনি পত্রান্তরে লিখিয়াছিলেন :—

* * * * *

রবীন্দ্রবাবুকে যদি সে সময়ে সংবর্দ্ধনা করা না হইত, এবং আজি বিলাতের সার্টিফিকেট্ দেখিয়া আমরাও সম্মান দেখাইতে উপস্থিত হইতাম, তাহা হইলে লোকে বলিত না কি যে, আমরা স্বদেশী হইয়াও দেশের এত বড় লোকটাকে আদর করিলাম না বা চিনিলাম না ; আর আজ সাহেবি সার্টিফিকেট্ দেখিবামাত্র অমনি জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলাম। তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশের মুখখানা কতটুকু হইত ? একেই ত কথা আছে বিলাতি প্রশংসা-পত্র না দেখিলে আমাদের নিজের শাস্ত্রেও ভক্তি হয় না। ইহার পর বিদেশের সম্মান দেখিয়া স্বদেশীকে সম্মান করিতে প্রবৃত্ত হইলে নিদারুণ লজ্জায় পড়িতে হইতনা কি ? আমি ত বোধ করি বিলাত যাইবার পূর্ব্বে যে কোন একটা উপলক্ষ করিয়া রবীন্দ্রবাবুর প্রতি যে আদর দেখান হইয়াছিল, তাহাতে দেশের মুখ রক্ষা হইয়াছে। আপনার কুশল প্রার্থনা করিয়া ইতি করিলাম। * *

ভবদীয়

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

১৩১৮ সালের শেষভাগে রামেন্দ্রসুন্দর যকৃতের পীড়ায় কাতর হন, তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ; শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা

* ঐ পত্র দুইখানি শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ১৩২১ সালের শ্রাবণ মাসের 'সাহিত্য' মাসিক পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এক কালে লোপ পায়। সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকের পদ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়কে অর্পণ করিয়া তিনি বিশ্রাম লাভ করেন। তদুপলক্ষে তিনি পরিষদের সভাপতি ও অন্যান্য কর্ম্মাধ্যক্ষগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন—"মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের স্নেহ ও উৎসাহ এবং সহকারী সম্পাদক ও অন্যান্য কর্ম্মাধ্যক্ষগণের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও সাহায্য ব্যতীত সাহিত্য-পরিষদের কর্ম্মভার বহন করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হইত না। তাঁহাদের প্রতি সমুচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমার সাধ্য নহে। সম্প্রতি আমার শরীর এরূপ অবসন্ন যে, অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের সাহায্য না পাইলে এই বার্ষিক কার্য্যবিবরণ উপস্থিত করাই সম্ভাবনা ঘটিত না। আট বৎসর ব্যাপিয়া আমার উপর শ্রদ্ধার্পিত সম্পাদকীয় ভার যথাশক্তি বহন করিয়া অদ্য আমি পরিষদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি। আমার অক্ষমতা, অবিবেচনা বা অনবকাশ দরুণ যে সকল ত্রুটী ঘটিয়াছে, সানুনয়ে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।" তৎপরে তিনি ভাবী সম্পাদক মহাশয়ের গুণকীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি নিশ্চিন্তমনে পরিষদের ভবিষ্যতের জন্য শঙ্কাশূন্য হইয়া সদস্যগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি। বিধাতার কৃপায় সদস্যগণের স্নেহ পরিষদের প্রতি অক্ষুণ্ণ থাকুক, ইহাই প্রার্থনা।" সেই বৎসর সুকুমার হালদার মহাশয় তাঁহার সমগ্র লাইব্রেরী সাহিত্য-পরিষৎকে দান করেন।

১৩১৯ সালে রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি, গ্রন্থ প্রকাশ সমিতি, শব্দ সমিতি ও পরিভাষা সমিতির সদস্য ছিলেন; কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন উল্লেখযোগ্য কোন কার্য্যই সম্পাদন করিতে পারেন নাই, অথচ কোন কার্য্যই তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত হইত না।

ঐ বৎসর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিষদের কার্য্য করিবেন না বলিয়া পদত্যাগ পত্র প্রদান করেন ; কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের পরামর্শ মত ঐ পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহৃত হয়। বঙ্গের গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল মহোদয় সাহিত্য-পরিষৎ পরিদর্শনের জন্য পরিষৎ মন্দিরে আগমন করেন। ১৩১৯ সালে পরিষৎ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ১২০০৲ বার্ষিক সাহায্য প্রাপ্ত হন।

প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করাইবার জন্য পরিষৎ একটি সব্‌কমিটি গঠিত করেন। রামেন্দ্রসুন্দর ঐ সমিতির সদস্য ছিলেন।

নবনির্ব্বাচিত সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী বলিয়াছিলেন—"শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন পরিষৎ-সম্পাদকের গুরুভার বহনে অসমর্থ হইয়া উহা পরিত্যাগ করায় সম্পাদকের দায়িত্ব আমার দুর্ব্বল স্কন্ধে পড়িয়াছে। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় গত কয়েক বৎসর ধরিয়া পরিষদের সম্পাদকরূপে যে প্রকার অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে পরিষদের নানা কার্য্যের নানা সৌষ্ঠব আনয়ন করিয়াছেন, সে কথা সর্ব্বজনবিদিত। সুতরাং তাহার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। সম্প্রতি তিনি শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন কিছুদিনের জন্য পরিষদের কার্য্য হইতে অবকাশ লইয়াছেন। তাহাতে পরিষদের যে কি প্রকার গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে, তাহা লিখিয়া জানাইবার সাধ্য নাই। তাঁহার ন্যায় নানাবিদ্যা-বিশারদ এবং অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির হস্তে পরিষদের কার্য্যভার ন্যস্ত থাকা সর্ব্বপ্রকারেই সুসঙ্গত। পরিষদের প্রতি একনিষ্ঠ অনুরাগ তাঁহা অপেক্ষা অন্য কাহারও দেখা যায় না। শ্রীভগবানের নিকট আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, যেন তিনি সত্বর সুস্থ হইতে পারেন। তিনি সুস্থ হইয়া পুনরায় পরিষদের কার্য্যভার গ্রহণ করতঃ আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন,

এবং পরিষদের গৌরব দিন দিন বৃদ্ধি করিবেন, এই বলবতী আশা আমরা সর্ব্বদা অন্তঃকরণে পোষণ করিতেছি।”

১৩২০ সালে রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ও পত্রিকা-পরিচালনসমিতির সদস্য ছিলেন। শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া সেবারেও তিনি কোন শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে পারেন নাই। ঐ বৎসর কলিকাতার টাউনহলে সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশন হয়। অধিবেশনে রামেন্দ্র-সুন্দর বিজ্ঞান সভার সভাপতি হন। সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন, কতকটা পড়া হইলে তিনি বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়েন, সুতরাং বাধ্য হইয়া শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয়কে অবশিষ্টাংশ পাঠ করিতে দেন। অভিভাষণটি পাঠ শেষ হইয়া গেলে তিনি সভাস্থল ত্যাগ করেন।

পরিষৎ সে বৎসর তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা ও বিশিষ্ট সভ্যপদে নির্ব্বাচিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

১৩২১ সালে রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি, পত্রিকাপরিচালন সমিতি এবং গণিত ও বিজ্ঞান সমিতির সদস্য ছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ সেই বৎসর তাঁহাকে বিশিষ্ট সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। দ্বাবিংশ বর্ষের সাহিত্য-পরিষৎ পঞ্জিকায় প্রকাশিত সাহিত্য-পরিষদের একবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ হইতে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

“আলোচ্য বর্ষে বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে পরিষদের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত করিতে পারিয়া পরিষৎ নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন। প্রচলিত নিয়মানুসারে সাহিত্য-সংসারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে পরিষৎ নানা উপায়ে সম্মানিত করিতে পারেন এবং এই সমস্ত উপায়ের মধ্যে বিশিষ্ট সদস্য নির্ব্বাচন সর্ব্বপ্রধান।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বিদ্যা ও মনীষা সম্বন্ধে কিছু বলা নিতান্ত অনাবশ্যক। তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব ও বিদ্যার খ্যাতি সর্ব্বজনপরিজ্ঞাত। এই মাতৃপূজার মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ইহার উন্নতিকল্পে তিনি যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন, সে জন্য তিনি দেশীয় সর্ব্বসাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। বিশেষতঃ তিনি অদ্যাপি অসুস্থ শরীরে পরিষদের জন্য যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার নিকট যথোপযুক্ত ভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন অসম্ভব।"

১৩২১ সালের ৫ই ভাদ্র রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের পঞ্চাশত্তমবর্ষ পূর্ণ হয়। তদুপলক্ষে সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য একটি সান্ধ্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠান করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতপ্রমুখ কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তি ঐ সংবর্দ্ধনার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ৫ই ভাদ্র সন্ধ্যার সময় সম্মিলন আরম্ভ হয়। কলিকাতাবাসী বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও নবীন-প্রবীণ অনেক সাহিত্য-সেবী আনন্দের সহিত উক্ত সভায় যোগদান করেন। বোলপুর হইতে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত এনড্রু সাহেব, দিল্লী পরিষৎ-শাখার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য, বরিশাল-শাখার সম্পাদক কবিবর দেবকুমার রায় চৌধুরী প্রভৃতি অনেকেই তথায় উপস্থিত হন। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় রামেন্দ্রসুন্দর পরিষৎ-মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। দ্বারদেশে সভাপতি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সহকারী সভাপতি সারদাচরণ মিত্র, সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং বহু গণ্যমান্য সদস্য তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। সেই খানেই তাঁহার ফটো লওয়া হইল। তৎপরে সকলে রামেন্দ্রসুন্দরকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের রচিত একটি অভ্যর্থনাসূচক গান বিখ্যাত গায়ক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং অন্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে কর্ত্তৃক গীত হইল। তারপর পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় স্বরচিত সংস্কৃত কবিতা পাঠ করিয়া রামেন্দ্রসুন্দরকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কবিতা পাঠের পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন—"করুণাময় বিশ্বনাথের কৃপায় এই পুণ্যময়ী স্বদেশপ্রাণবল্লভা সাহিত্য-পরিষদের বয়ঃক্রম ২০ বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। যে স্বদেশরত্ন মনীষিবরের ঐকান্তিক প্রযত্নে এই সভা অশেষ সুমঙ্গল লাভে ধন্যা, সেই স্বনামধন্য মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহোদয়ের অভিনন্দনার্থ আমি এই শ্লোক কয়টি আশীর্ব্বচনস্বরূপ তাঁহাকে উপহার দিতেছি।"

পণ্ডিতবরের আশীর্ব্বচন শেষ হইলে সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলেন।

অভিনন্দন

"রামেন্দ্রসুন্দর!

অদ্য তোমার বয়স পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইল। অতএব আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভ্যগণ সকলে একত্র মিলিত হইয়া তোমার অভিনন্দন করিতেছি এবং ভগবানের নিকট তোমার মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু কামনা করিতেছি।

যৌবনের প্রারম্ভেই তুমি যেরূপ বিদ্যাবত্তা প্রকাশ করিয়াছিলে, তুমি যে পথেই যাইতে, তাহাতেই প্রভূত ধন-সম্পদ্ ও যশঃ উপার্জ্জন করিতে পারিতে, কিন্তু তুমি সে সকল পদই ত্যাগ করিয়া দারিদ্র্যমণ্ডিত অধ্যাপনা ও মাতৃভাষার সেবাই জীবনের ব্রত করিয়াছ এবং আত্মত্যাগ ও আদর্শ চরিত্রের পরমোজ্জ্বল ও মহিমময় দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছ। তুমি বিজ্ঞানকে স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে নামাইয়া আনিয়াছ এবং যাঁহারা বিজ্ঞান-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের একজন অগ্রণী হইয়াছ।

তুমি একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং সাহিত্যসেবী। অতএব বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের ত্রিধারা তোমাতে সংযুক্ত হইয়া তোমার হৃদয়-ক্ষেত্রকে পুণ্যপ্রয়াগে পরিণত করিয়াছে।

বিশেষতঃ তুমি গত বিংশতি বর্ষাধিককাল যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম, অদম্য উৎসাহ ও ঐকান্তিক অধ্যবসায় সহকারে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিয়াছ, তাহাতে পরিষৎ তোমার নিকট চিরদিন ঋণী ও কৃতজ্ঞ থাকিবে।

তুমি বঙ্গজননীর সুসন্তান, তুমি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অকৃত্রিম সেবক, তোমার সাধনা সিদ্ধ হউক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।"

অভিনন্দন পত্রখানি রৌপ্য ফলকে খোদিত এবং চতুষ্পার্শে স্বর্ণনির্ম্মিত গোলাপপত্রে ভূষিত। মকমলের বাক্সের মধ্যে স্থাপিত করিয়া উহা রামেন্দ্রসুন্দরের হস্তে অর্পণ করা হইল। তিনি নত শিরে উহা গ্রহণ করিলেন।

তার পর সভাপতি মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের অধ্যাপক-সদস্য শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের প্রেরিত একটি আশীর্ব্বচন পাঠ করিয়া রামেন্দ্র-সুন্দরকে ধান দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং একটি বাক্সে করিয়া একটি সোনার কলম, পেন্সিল, একখানি একত্র গ্রথিত সোনার ছুরি ও কাগজ কাটা চেয়াড়ি ও একটি সোনার দোয়াত উপহার দিলেন। ঐ বাক্সের উপর রূপার পাতে লেখা ছিল, "রামেন্দ্রসুন্দর, তোমার সরস, সরল ও সুন্দর রচনায় তোমার মাতৃভাষার সৌন্দর্য্য ও গৌরব বাড়িয়াছে। তোমার সোনার দোয়াত কলম হউক।"

তার পর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রামেন্দ্রসুন্দরের কপালে চন্দন দান করিয়া তাঁহার স্বভাবজাত শ্রুতিসুখকর অমৃতবর্ষী মধুর কণ্ঠে এবং কবিত্ব

পূর্ণ হৃদয়স্পর্শী মধুর ভাষায় নিম্নলিখিত অভিনন্দনখানি পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

"ওঁ

সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

হে মিত্র, পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ণ করিয়া তুমি তোমার জীবনের ও বঙ্গ-সাহিত্যের মধ্য গগনে আরোহণ করিয়াছ, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

যখন নবীন ছিলে, তখনই তোমার ললাটে জ্ঞানের শুভ্র মুকুট পরাইয়া বিধাতা তোমাকে বিদ্বৎসমাজে প্রবীণের অধিকার দান করিয়াছিলেন। আজ তুমি যশে ও বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু তোমার হৃদয়ের মধ্যে নবীনতার অমৃত রস চিরসঞ্চিত। অন্তরে তুমি অজর, কীর্ত্তিতে তুমি অমর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সর্ব্বজনপ্রিয় তুমি মাধুর্য্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্ত সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

পূর্ব্বদিগন্তে তোমার প্রতিভার রশ্মিচ্ছটা স্বদেশের নবপ্রভাতে উদ্বোধন সঞ্চার করিতেছে। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যে চিরদিন তুমি দেশ-মাতার পূজা করিয়াছ। হে মাতৃ-ভূমির প্রিয়পুত্র, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সাহিত্য-পরিষদের সারথি তুমি এই রথটিকে নিরন্তর বিজয়-পথে চালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্য্যে তুমি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্য্যের দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ। আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে
নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে

প্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয় তুমি, তোমাকে আহ্বান করি, নিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি তুমি, তোমাকে আহ্বান করি। তোমাকে দীর্ঘজীবনে আহ্বান করি, দেশের কল্যাণে আহ্বান করি, বন্ধুজনের হৃদয়াসনে আহ্বান করি।

৫ই ভাদ্র ১৩২১ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

অভিনন্দন পত্রখানি রঙ্গীন লতাপাতার ছবিদ্বারা সজ্জিত এবং রচনাটুকু রবীন্দ্রনাথের নিজের হস্তাক্ষরে লিখিত; ইহার অপর পৃষ্ঠাতেও রঙ্গীন আলিম্পনের মধ্যে বেদের একটি আশীর্ব্বচন মন্ত্র উদ্ধৃত আছে। সৌন্দর্য্যে উহা অতীব মনোরম ও সুদৃশ্য।

রবীন্দ্রনাথের পাঠভঙ্গী সকলকে মুগ্ধ করিল এবং রামেন্দ্রসুন্দরের নয়নদ্বয় আনন্দসজল হইল। তাহার পর শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রামেন্দ্রসুন্দরকে সাদরে চন্দনাদি মাথাইয়া পুষ্পমালায় বিভূষিত করিলেন। পরিষদের কার্য্যে যিনি রামেন্দ্রসুন্দরের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন, সেই ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বরণ-মাল্যে রামেন্দ্রসুন্দর ও সভাপতি মহাশয়কে সমাদৃত করিলেন। তাহার পর একে একে কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি সুশীলগোপাল বসু, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্ব স্ব কবিতা পাঠ করিলেন। ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় স্বরচিত একটি সরস কবিতা পাঠ করিয়া রামেন্দ্রসুন্দরের গুণগৌরব ঘোষণা করেন এবং ভগবানের নিকট তাঁহার আরোগ্য প্রার্থনা করেন। অতঃপর রামেন্দ্রসুন্দর উঠিয়া রুদ্ধকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিলেন,—"আমাকে আজ আপনারা যে ভাবে সংবর্দ্ধনা করিলেন, তাহা আমার পক্ষে অভাবনীয় এবং বিশেষ সম্মান ও গৌরবকর। আমি আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। আমি মুখে বেশী

অভিনন্দনপত্র ১৬৪ পৃষ্ঠা

কিছু বলিতে পারিব না। আপনাদের স্নেহের আদরের আশীর্ব্বাদের উপযুক্ত উত্তর দিবার ভাষা ও শক্তি আমার নাই, তবু যৎকিঞ্চিৎ যাহা বলিতে চাই, তাহা লিখিয়া আনিয়াছি, আমার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান্ দুর্গাদাস ত্রিবেদী তাহা আপনাদের পড়িয়া শুনাইবেন।" তার পর দুর্গাদাস বাবু তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের বক্তব্য পাঠ করিলেন।

"নিবেদন—

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-প্রদত্ত সম্মানের জন্য সমুচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষমতা আজি আমার নাই। মনের মধ্যে যাহা উপস্থিত হয়, তাহার জন্য ভাষা পাই না; ভাষা যদি জুটিয়া যায়, বাক্য তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। শুনিয়াছি, পঞ্চাশ বৎসর বয়সে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে ছুটি লইবার প্রথা আমাদের দেশে অনুমোদিত ছিল; আমারও ছুটি লইবার সময় উপস্থিত; ছুটি লইবার সময় সময়োচিত শিষ্টাচার প্রদর্শনেরও আমার শক্তি নাই। বিশেষতঃ আজি আমার প্রতি সাহিত্য-পরিষৎ যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহার ভারে আমার চিত্ত পীড়িত, আমার হৃদয় পূর্ণ; কিন্তু চিত্ত বিক্ষুব্ধ, অবসন্ন দেহ সেই অনুগ্রহের প্রতিদানে যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশেও অসমর্থ।

আমার প্রতি পরিষদের আচরণকে সম্মান বা সংবর্দ্ধনা বলিলে উভয় পক্ষেই অনুচিত হইবে। পরিষদের পক্ষে আমার সেব্যসেবক সম্পর্ক। এতকাল ধরিয়া আমি পরিষদের পরিচর্য্যা করিয়াছি—একান্ত ভক্তের মত 'কায়েন মনসা বাচা' পরিচর্য্যা করিয়াছি। পরিষৎ আমাকে এই অধিকার দিয়াছিলেন; আজি যদি পরিষৎ তজ্জন্য আমাকে পারিতোষিকের যোগ্য মনে করিয়া থাকেন, তাহা আমি শ্লাঘা মনে করিব। পরিষদের প্রসাদ আমি শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার সর্ব্ব-জনমান্য সভাপতির হাত দিয়া আমাকে যে প্রসাদ দান করিলেন, তাহা গ্রহণ করিয়া আমি ধন্য হইলাম।

অধিক আকাঙ্ক্ষা লইয়া আমি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করি নাই। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্ব্বেই আমি যে একটা প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াছিলাম, তাহাতেই আমার জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ হইয়া যায়। তখন হইতেই বিধাতৃ-বিধানের নিকট মস্তক অবনত করিয়া ধরাপৃষ্ঠে সসঙ্কোচে পা ফেলিয়া চলিতেছি। বিধাতৃ-বিধান জয়যুক্ত হউক।

একটা আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে পারি নাই। যথাশক্তি বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবা করিব, এই আকাঙ্ক্ষা বাল্যকাল হইতেই পোষণ করিয়াছিলাম। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তদর্থেই আমার প্রায় সকল শক্তিই নিয়োগ করিয়াছি।

শৈশবেই আমি জননী জন্মভূমিকে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' বলিয়া জানিতে উপদিষ্ট হইয়াছিলাম। সে মন্ত্রে দীক্ষা সে বয়সে সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যিনি দীক্ষা দিয়াছিলেন, তিনি কোথা হইতে আজিও আমার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন; তাঁহার দিব্য দৃষ্টি অতিক্রম করা আমার সাধ্য নহে। আমার শক্তি ছিল না; কিন্তু সেই দিব্য নেত্রের প্রেরণা ছিল; আমার জীবনে যদি কিছু সার্থকতা থাকে, তাহা সেই প্রেরণার ফল।

আমার জীবনে কিছু সার্থকতা আছে, তাহা আমি মনে করি এবং মনে করিয়া গর্ব্ব অনুভব করি। বঙ্গসাহিত্যের পথে আমি বঙ্গজননীর সেবাকর্ম্মে আমার শক্তি অর্পণ করিয়াছি বটে; কিন্তু সে বিষয়ে আমার যোগ্যতা নাই এবং কোনও স্পর্দ্ধাও নাই। সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁহারা অগ্রণী, আমি তাঁহাদের অনুযাত্রী অনুচর মাত্র। তাঁহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইবার আমার অধিকার নাই, তাঁহাদের পশ্চাতে চলিবার অধিকার মাত্র আমি পাইয়াছি।

সাহিত্যসেবা উপলক্ষ্য করিয়া আমি বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদের অতি নিকট সম্পর্কে আসিয়াছিলাম, সেখানেও আমি কোন কৃতিত্বের স্পর্দ্ধা

করি না। সেখানে যাঁহারা আমার নেতা ছিলেন, যাঁহারা আমার সহায় ছিলেন, তাঁহাদের নেতৃত্ব ও সাহায্য ব্যতীত আমি কিছুই করিতে পারিতাম না। সেখানে আমার কর্ম্মের জন্য কোনরূপ স্পর্দ্ধা করিতে পারিব না; কিন্তু পরিষদে আসিয়া আমার একটা পরম লাভ ঘটিয়াছে; তজ্জন্য আমি গর্ব্বিত ও গৌরবান্বিত।

এই সভাস্থলে যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আমার বয়োবৃদ্ধ ও আমার নমস্য। অনেকেই আমার পরমশ্রদ্ধাভাজন বন্ধু। সকলেই আমাকে প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকেন এবং দেখেন। পরিষদের সম্পর্কে আসিয়া আমি তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করিয়াছি; তাঁহাদের প্রীতি পাইয়া আমার জীবন মধুময় হইয়াছে; তাঁহাদের শ্রদ্ধা লাভে আমি ধন্য হইয়াছি। আমি যে তাঁহাদের অনুচর ও সহায় হইবার সুযোগ পাইয়াছি, ইহাই আমার সৌভাগ্য; আমার জীবনের এই পরম লাভ; আমার জীবনের এই পরম সার্থকতা। আজ তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার প্রতি তাঁহাদের প্রীতির পরিচয় দিতেছেন; ইহাতে আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছি। সংসার-বিষবৃক্ষের যে দুইটি মধুর ফল, তার মধ্যে একটি আর একটি অপেক্ষা বহু গুণে মিষ্ট; সজ্জন-সঙ্গমরূপে মধুর ফলের আস্বাদনে আমার প্রাণ পরিতৃপ্ত হইয়াছে।

অবিমিশ্র আনন্দ আমার অদৃষ্টে নাই। পরিষৎ মন্দিরে সমবেত আমার এই বন্ধুসঙ্ঘের মধ্যে আমি একজন বন্ধুকে আজি দেখিতে পাইতেছি না, যাঁহাকে আমি অতি অল্পদিন হইল, বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে নামাইয়াছিলাম, যাঁহার অসামান্য প্রতিভাকে বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবায় নিয়োজিত করিবার নিমিত্ত হইয়া আমি গর্ব্বিত ছিলাম। তাঁহার তিরোভাব আজিকার আনন্দকে পূর্ণ হইতে দিবে না। উহা আমার নিজের কথা, সভার স্থলে প্রকাশযোগ্য নহে; অতএব সে কথা যাক্। বিধাতৃবিধান জয়যুক্ত হউক।

সাহিত্যক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য পরিষদের নিকট আমার প্রাপ্য কিছুই নাই। পরিষদের অনুরক্ত বন্ধুগণের মধ্যে অনেকে আছেন, যাঁহাদের স্থান আমার উপরে; যাঁহাদিগকে সম্মান দেখাইলে এবং সংবর্দ্ধনা করিলে পরিষদ্‌ই গৌরবান্বিত হইবেন। আমি যৎকিঞ্চিৎ পারিতোষিকের দাবী করিতে পারি। বহু বৎসর ধরিয়া পরিষদের ঢোল বাজাইয়াছি; ঢুলিকে শিরোপা দেওয়া এদেশের সামাজিক প্রথা; আমি সেই শিরোপা মাথায় লইয়া পরিষদের নিকট ছুটি পাইবার জন্য এখানে উপস্থিত।

আর আমার বক্তব্য নাই। যাঁহারা সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদের ধুর-বহনকর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রযত্নে সাহিত্য-পরিষৎ দিন দিন উন্নতির সোপানে আরোহণ করিবেন, এ বিষয়ে সংশয় করি না। আমি তাঁহাদের অনুচর হইতে আর বোধ করি পারিব না; দূরে থাকিয়া পরিষদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি দেখিতে পাইলেই আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্ত থাকিবে; আমার জীবনের যাহা আকাঙ্ক্ষা, তাহা পূর্ণ হইবে; আমার জীবন যে নিরর্থক হয় নাই, এই আশ্বাস পাইয়া আমি বিদায় লইতে পারিব।

আমার বন্ধুসঙ্ঘ আমার প্রতি স্নেহবান্; তাঁহারা আমার সকল ত্রুটি ক্ষমা করিবেন। তাঁহাদের প্রীতিলাভে আমি যে সমর্থ হইয়াছি, ইহাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ লাভ। তাঁহাদের কৃপায় এই মহতী সভাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিবার সুযোগ পাইয়া আমি আজ কৃতার্থ হইলাম।”

অতঃপর শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন—“* * * রামেন্দ্র, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তোমার বয়স আজ পঞ্চাশৎ বর্ষ-পূর্ণ হইল,—তুমি যেন আমাদের ফাঁকি দিও না। ভগবান্ তোমায় নিরা-ময় করুন, দীর্ঘজীবী করুন, আমাদের কাছে রাখুন, রামেন্দ্রকে আমি ভালবাসি—ভালবাসি তাহার স্বভাবগুণে, তাহার রচনানৈপুণ্যে, তাহার

আদর্শ চরিত্রগুণে। সাহিত্য-পরিষদের কেরাণীগিরিতে ঢুকিয়া সে নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। * * * সে যদি পরিষদের জন্য এত সময় না দিত তাহা হইলে তাহার 'জিজ্ঞাসার' মত 'প্রকৃতির' মত 'কর্ম্মকথার' মত 'বিচিত্র প্রসঙ্গের' মত তাহার আরও কত বিচিত্র রচনা যে আমাদের মাতৃভাষার দেহ অলঙ্কৃত করিতে পারিত, তাহাতে আর ভুল নাই। তবে, সে না থাকিলে, পরিষদের আজ এই বিপুল অট্টালিকা, এই বৃহৎ পুস্তকাগার, এই মনোহর চিত্রশালা, এই দেশ-বিদেশ-লব্ধ শ্রদ্ধা ও গৌরব হইত না,—হয়ত পরিষদ্ই হইত না। জানি ত, পরিষদ্কে শৈশবে, বাল্যে কত ধাক্কাই না খাইতে হইয়াছে; রামেন্দ্রের ন্যায় পাকা মাঝি হাল ধরিয়াছিল বলিয়া সে সকল বিপদের বিন্দুবিসর্গও তাহার উন্নতির পথে বাধা দিতে পারে নাই। * * *।"

তাহার পর স্যার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভায় আসিয়া যোগদান করিলে সকলে করতালি দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তিনি রামেন্দ্রসুন্দরের গুণ-কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এই সময়ে রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার দুর্ব্বল শরীরে উৎসাহের আবেশ সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি অসুখ বোধ করিলেন; তাড়াতাড়ি তাঁহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তৎপরে ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের যুবকবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের "খ্যাতির বিড়ম্বনা" নামে একটি ক্ষুদ্র রচনার অভিনয় করিয়া সকলের চিত্তবিনোদন করিয়াছিলেন। উপস্থিত সকল ব্যক্তিকেই আতর, পান, গোলাপ ও ফুলের মালা দিয়া সমাদর করা হইয়াছিল। রাত্রি ১০ টার পর সম্মিলন ভঙ্গ হয়।

১৯এ মাঘ গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল মহোদয় সাহিত্য-পরিষৎ পরিদর্শন করিতে আসেন। পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ তাঁহার রাজোচিত সংবর্দ্ধনা করেন। রামেন্দ্রসুন্দর ও আট জন সদস্য

লাটসাহেব ও তাঁহার সহচরদিগকে চিত্রশালার দ্রব্যাদি প্রদর্শন ও তাহাদের পরিচয় প্রদান করেন।

শ্রীমতী কিরণবালা দাসীসঙ্কলিত "ব্রতকথা" নামক গ্রন্থখানি মুরশিদাবাদ জেলার পাঁচথুপী গ্রামের শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ ঘোষ রায় মহাশয়ের ব্যয়ে পরিষৎ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর উহার ভূমিকা লিখিয়াছিলেন।

১৩২২ সালে সাহিত্য-পরিষৎ রামেন্দ্রসুন্দরকে সহকারী সভাপতিপদে নিযুক্ত করিয়া কার্য্যালয় পরিদর্শন করিবার ভার দেন। ঐ বৎসর লর্ড কারমাইকেল পুনরায় পরিষৎ পরিদর্শন করিতে আসেন। রামেন্দ্রসুন্দর ও পাঁচ ছয় জন কর্ম্মী সভ্য তাঁহার সংবর্দ্ধনা করেন। ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় সেই বৎসর পরলোক গমন করেন, এবং সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার একজন অক্লান্ত কর্ম্মী প্রকৃত সেবক হারান; তাঁহার স্মৃতিসভায় রামেন্দ্রসুন্দর 'স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী' প্রবন্ধ পাঠ করেন। স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয়ের জন্য একটি স্মৃতিসমিতি স্থাপিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দর সেই সমিতির অন্যতম সভ্য ছিলেন।

লালগোলার রাজা বাহাদুর সাহিত্য-পরিষদের স্থায়ী ভাণ্ডারে তের হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করেন।

সাহিত্য-সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত ইউরোপীয় ইতিহাসের অনুবাদক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয় উক্ত গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় সাহিত্য-পরিষৎ সভায় পাঠ করেন। রামেন্দ্রসুন্দর ঐ সভার সভাপতি ছিলেন। রামেন্দ্র-সুন্দর ও শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহের চেষ্টায় পাইকপাড়ার রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ মহাশয় পরিষদের কার্য্যে মনোযোগী হন, এবং নানা বিষয়ে অর্থ সাহায্য করেন।

১৩২৩ সালে রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন। সে বৎসর কতিপয় মতভেদের ফলে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত,

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার ; সুরেন্দ্রকুমার ও কালিদাস নাগ প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষগণ পরিষদের কার্য্য ত্যাগ করেন। সেই কারণে পরিষদে যাহাতে দলাদলির সৃষ্টি না হয়, তজ্জন্য ভগ্নস্বাস্থ্য রমেন্দ্রসুন্দরকে অনেক চেষ্টা করিতে হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় ও রামেন্দ্রসুন্দর উভয়ে রমেশভবনের সম্পাদক হইয়াছিলেন। রমেশভবন প্রতিষ্ঠাকল্পে লর্ড কারমাইকেল সে বৎসর পুনরায় পরিষদে আসিয়াছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর গণিত শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব আলোচনার জন্য গণিত সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৩২৪ সালে রামেন্দ্রসুন্দর পত্রিকাধ্যক্ষ হন। ঐ কার্য্যে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয়কে রামেন্দ্র-সুন্দরই পরিষদে আনিয়াছিলেন।

ঐ বৎসর পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সারদাচরণ মিত্র ও সহকারী সভাপতি অক্ষয়চন্দ্র সরকার পরলোক গমন করিলে তাঁহাদের শোকসভায় রামেন্দ্রসুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি সারদাচরণের স্মৃতিসমিতির সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৩২৫ সালে রামেন্দ্রসুন্দর পত্রিকাধ্যক্ষ ছিলেন; ঐ কার্য্যে পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

১৩২৬ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে সাহিত্য-পরিষৎ রামেন্দ্রসুন্দরকে সর্ব্বজনমান্য সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত করিয়া গৌরব বোধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু উহা তাঁহার পরলোকগমনের ছয় দিন মাত্র পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। তিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবার অবসর পান নাই। রামকমল যখন তাঁহার রোগশয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া উক্ত সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন, তাহার পর মুহূর্ত্তেই তিনি চিরদিনের জন্য বাহ্য চৈতন্য হারাইলেন।

মোটামুটি ধরিতে গেলে তিনি ১৩০১ সালে অল্প দিনের জন্য পরিষদের সম্পাদক ছিলেন; ১৩০২ হইতে ১৩০৫ পর্য্যন্ত কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন; ১৩০৬ হইতে ১৩১০ পর্য্যন্ত পত্রিকাসম্পাদক ছিলেন; ১৩১১ হইতে ১৩১৮ পর্য্যন্ত সম্পাদক ছিলেন; ১৩১৯ হইতে ১৩২১ পর্য্যন্ত কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন; ১৩২২ সালে কিছুদিনের জন্য সহকারী সম্পাদক ও পরে সহকারী সভাপতি হইয়াছিলেন; ১৩২৩ সালেও তিনি সহকারী সভাপতি ছিলেন; ১৩২৪ ও ১৩২৫ সালে তিনি পত্রিকাধ্যক্ষ ছিলেন; এবং ১৩২৬ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ হইতে তাঁহার জীবনের শেষ দিন ২৩এ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

পূর্ব্ববর্ণিত সাহিত্য-পরিষৎসংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে সাহিত্য-পরিষদে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রকৃত কৃতিত্বের বিষয়ে ধারণা করা কঠিন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-পরিষৎকে প্রাণের সামগ্রী করিয়াছিলেন। তিনি নিজের প্রাণ দিয়া উহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন নিজের শক্তি দিয়া উহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন; তিনি অহোরাত্র শয়নে স্বপনে জাগরণে সকল অবস্থায় একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় উহার চিন্তায় রত থাকিতেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

সাহিত্য-পরিষদের সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য তাঁহার মনে একটা প্রবল আগ্রহ দেখিতে পাইতাম। তাঁহার আত্মীয় ও পরিচিত সমর্থ ব্যক্তি মাত্রকেই পরিষদের সভ্যতালিকাভুক্ত করিতে তিনি চেষ্টা করিতেন। একবার ডাক্তার ডি, এন, রায় মহাশয় তাঁহার কোন আত্মীয়ের চিকিৎসা করিবার জন্য তাঁহার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। ভিজিটের টাকার মধ্যে কিছু লইয়া অবশিষ্টাংশ ডাক্তার বাবুকে দিয়া তিনি বলিলেন যে তাঁহাকে সাহিত্য-পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিবার জন্য চাঁদাস্বরূপ ঐ টাকা

গ্রহণ করিলাম। নানা উপায়ে তিনি সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিতেন। ১৩০১ সালে প্রথম বর্ষের শেষে পরিষদে ১০৩ জন সদস্য ছিলেন। সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া ১৩২১ সালের বর্ষশেষে ২১৪৮ জনে পরিণত হয়।

রামেন্দ্রসুন্দরেরই উদ্যোগে সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার পরম হিতৈষী বন্ধু লালগোলার রাজাবাহাদুর ও দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমারকে পাইয়াছেন। রাজাবাহাদুর তাঁহার পৌত্রকে দেখিবার জন্য যখন কলিকাতায় রামেন্দ্র-সুন্দরের বাড়ীতে আসেন, রামেন্দ্রসুন্দর তখন তাঁহাকে পরিষদের কথা বলেন, এবং সর্ব্বপ্রকারে পরিষদের সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করেন। রামেন্দ্রসুন্দরের অনুরোধেই উৎসাহিত হইয়া রাজাবাহাদুর উহার গৃহ নির্ম্মাণ, স্থায়ী ভাণ্ডার, গ্রন্থপ্রকাশ, লাইব্রেরীস্থাপন প্রভৃতি নানা কার্য্যের জন্য সত্তর হাজার টাকারও অধিক দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমারও নানাউপায়ে সাহিত্য-পরিষদের উপকার করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন রামেন্দ্রসুন্দর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্তরঞ্জন রায়, বিনয়কুমার সরকার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি বহু উদীয়মান সাহিত্যিকগণকে উৎসাহ দিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন।

সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালার পুষ্টিসাধন রামেন্দ্রসুন্দরের সময়ে হইয়া-ছিল। তিনি চিত্রশালার জন্য নানা জনের নিকট হইতে নানা ভাবে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রমেশভবনের পরিকল্পনা তাঁহার নিজস্ব ছিল। বরেন্দ্রভূমে অনুসন্ধান করিতে ‘বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি’ স্থাপনে তিনি কুমার শরৎকুমারকে উৎসাহিত করেন। সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন কাশিমবাজারে করিবার জন্য মহারাজকে তিনিই বিশেষ-ভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। সম্মিলন যে পরিষদের একটি প্রধান

কর্ত্তব্য হয়, এবং পরিষদের কর্ত্তৃত্বাধীনে উহার পরিচালনা হয়, তাহার জন্য তিনি যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা প্রবর্ত্তন করিবার জন্য ১৩০২ সালে সাহিত্য-পরিষৎ চেষ্টা করেন; তখন ঐ বিষয় বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট উপহাস্য হয়। পরে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের শেষ ভাগে বাঙ্গালা ভাষা বিশ্বলিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় স্থান পাইয়াছিল, সর্ব্বতোভাবে না হউক, তাঁহার চির পোষিত আশা যে কিয়ৎপরিমাণে ফলবতী হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিয়াও তিনি সুখী হইয়াছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৩০৯ সালে সাহিত্য-পরিষদের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করেন। ১৩২০ সালে তিনি 'রসকল্পদ্রুম' নামক সংগৃহীত অতি প্রাচীন একখানি পুঁথি পরিষদের জন্য রামেন্দ্রসুন্দরের হস্তে প্রদান করেন।

ঐ অযাচিত দানেই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহিত্য পরিষদের প্রতি অনুরাগ একবারে লোপ পাইনাই; তিনি লিখিয়াছিলেন— "সেই সময়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহিত্য-পরিষদের প্রতি বৈরাগ্য ছিল। এই অযাচিত দানে আমি বুঝিলাম, ঐ বৈরাগ্যের অন্তরালে তীব্র অনুরাগ ছাই-চাপা আগুনের মত জ্বলিতেছে। আমি সাধ্যমত ফুৎকার প্রয়োগে ছাই উড়াইয়া আগুন জ্বালাইতে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই; সেই আগুনের আলো এবং তৎসঙ্গে হয়ত একটু উত্তাপ সাহিত্য-পরিষৎ এখনও ভোগ করিতেছেন। সাহিত্য-পরিষৎ সমিদ্‌ যোগাইয়া যজ্ঞের আগুনের মত ইহা রক্ষা করিতে পারেন, পরিষদের ভাগ্য।" রামেন্দ্রসুন্দরের চেষ্টায় ও যত্নে সাহিত্য-পরিষৎ আবার শাস্ত্রী মহাশয়কে ফিরিয়া পাইয়াছেন।

১৩২১ সালে সাহিত্য-পরিষৎ রামেন্দ্রসুন্দরের সংবর্দ্ধনার জন্য

এবং তাঁহাকে সভাপতি করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ ঐ দুইটি বিষয়েই আপত্তি করেন, পরে সকলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সংবর্দ্ধনা বিষয়ে সম্মতি দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় প্রস্তাবের উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন—"আমি চিরজীবন পরিষদের সেবকের কার্য্য করিয়া যাইব, ইহাই আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা—পরিষদের নেতৃত্ব গ্রহণ আমার কাজ নহে। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি আমার এই চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষায় বাধা দিবেন কি?" প্রকৃতই তিনি কোন বিষয়েই নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে ভালবাসিতেন না। সাহিত্য-পরিষদের নেতৃত্ব গ্রহণ করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। তিনি সেবকরূপে সাহিত্য-পরিষৎ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেবকরূপেই আত্মপরিচয় প্রদান করিতে শ্লাঘা বোধ করিতেন, এবং সেবকরূপেই তাঁহার কর্ত্তব্য সাধন করিয়া গিয়াছেন; কায়েন মনসা বাচা তিনি সেবকরূপেই তাঁহার সেবা করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষৎ যে দিন তাঁহাকে নেতার পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, সেই দিন হইতেই তাঁহার সাহচর্য্য লাভে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইলেন।

পরিষৎ ঐ পরলোকগত মাহাত্মার স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য স্মৃতিসমিতি স্থাপিত করিয়াছেন। সমিতি তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে নিম্নলিখিত প্রস্তাব করিয়াছেন;—

(১) তাঁহার একটি প্রস্তর মূর্ত্তি পরিষদে রক্ষা করা হইবে। মূর্ত্তির নিম্নদেশে একটি প্রস্তর ফলক থাকিবে।

(২) তাঁহার একখানি তৈলচিত্র পরিষদে রক্ষিত হইবে।

(৩) তাঁহার গ্রন্থাবলী ও প্রবন্ধাবলীর উপযুক্ত সংস্করণ প্রকাশিত হইবে। তাহার সহিত তাঁহার একটি জীবন-চরিত দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জীবন-চরিত স্বতন্ত্রভাবেও প্রকাশিত হইতে পারে।

(৪) তাঁহার নামে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থমালা প্রকাশ করা হইবে।

(৫) গবেষণাপূর্ণ মৌলিক প্রবন্ধের বা পুস্তকের জন্য তাঁহার নামে পুরস্কার দেওয়া হইবে।

(৬) তাঁহার নামে একটি স্মৃতি-ভবন নির্ম্মিত হইবে।

(৭) বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে আচার্য্য ত্রিবেদী মহাশয়ের স্মৃতিজড়িত পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হইবে।

(৮) আচার্য্য ত্রিবেদী মহাশয়ের সম্পূর্ণ জীবনচরিত প্রকাশিত হইবে। স্থির হইয়াছে যে, সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ অনুসারে প্রস্তাবিত মন্তব্যগুলি যথাসম্ভব কার্য্যে পরিণত করা হইবে।

১৩২৯ সালের শেষ পর্য্যন্ত সাহিত্য-পরিষৎ স্মৃতি-সংরক্ষণ বিষয়ে তৈল-চিত্র প্রতিষ্ঠা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ঐ বর্ষে স্মৃতি-সংরক্ষণ তহবিলে মোট ১৮৯৬৷৷০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

সাহিত্যসাধনায়

ছাত্রজীবন হইতেই রামেন্দ্রসুন্দর দেশের ও সমাজের কল্যাণ চিন্তা করিতে শিখিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে তাহাতে ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্য সাধনের পক্ষে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে বিবেচনা করিয়া তিনি ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিতে সাহসী হন নাই। গৌরবের সহিত ছাত্র জীবনের কর্ত্তব্য সাধন করিয়া তিনি তাঁহার অভিলষিত কর্ম্মক্ষেত্রে পূর্ণ উদ্যমের সহিত প্রবেশ করিয়াছিলেন। দেশের পক্ষে যাহা মঙ্গলকর, তাহা সাধন করিতে তিনি কখন পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহার ধারণা ছিল, বাঙ্গালীর অভাব বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায় পূরণ করিবেন; বাঙ্গালার পণ্ডিতগণ বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা করিয়া সার বস্তুর উদ্ধার করিবেন, এবং তাহার সহিত বিদেশের বর্ত্তমান সাহিত্যের সার বস্তু সকলের সমাবেশ করিবেন; বাঙ্গালার বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানশাস্ত্রের অমূল্য রত্নরাজিদ্বারা সেই সম্মিলিত সাহিত্যের অঙ্গ সুশোভিত করিয়া তুলিবেন; বাঙ্গালার লোক সেই সাহিত্যের আলোচনাদ্বারা বহুকালসঞ্চিত অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করিয়া জগতের সভ্য সমাজের নিকট আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন, এবং দেশের ও দশের মঙ্গলকর কার্য্যে তৎপর হইবেন। এই ধারণা মনে পোষণ করিয়া তিনি বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর বলিয়াছিলেন—"বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালী জাতির ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, কিন্তু বাঙ্গালা দেশের অতি পুরাতন সাহিত্য আছে,

সেই সাহিত্য বাঙ্গালীর পক্ষে অগৌরবের বিষয় নহে, এমন কি সেই সাহিত্য বাঙ্গালীর পক্ষে একমাত্র গৌরবের ধন। চণ্ডীদাস মধুর রসের সুধার ধারা ঢালিয়া যে সাহিত্যকে আর্দ্র করিয়াছেন, রামপ্রসাদ তাঁহার মায়ের চরণে আপনাকে নৈবেদ্যস্বরূপে অর্পণ করিয়া যে সাহিত্যে ভক্তির রসের স্নেহ সেচন করিয়াছেন, সেই সাহিত্য শিরে ধরিয়া, ভবের বাজারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার অধিকারে আমাদিগকে বাধা দিতে কেহ সাহস করিবেনা।"

"বাঙ্গালার ইতিহাস নাই বটে, কিন্তু এই সাহিত্য হইতে আমরা প্রাচীন বাঙ্গালীর নাড়ী-নক্ষত্রের পরিচয় পাই। সে কালের বাঙ্গালী কিরূপে কাঁদিত, কিরূপে হাসিত, তাহার অন্তরের মর্ম্মস্থলে কখন কোন্ স্বরে ধ্বনি উঠিত, তাহার আশার কথা, আকাঙ্ক্ষার কথা, তাহার স্বপ্নের কথা, এই প্রাচীন সাহিত্য হইতে আমরা জানিতে পারি। পৃথিবীতে কয়টা জাতি এত দিনের এমন সাহিত্য দেখাইতে পারে ? যাহারা এত দিনের এমন সাহিত্য দেখাইতে পারে, তাহাদিগকে আপনার অস্তিত্বের জন্য লজ্জিত হইতে হইবেনা।"

রামেন্দ্রসুন্দর ঐ ভরসায় বাঙ্গালার জাতীয় সাহিত্য-মন্দির গড়িয়া তুলিবার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর ভিত্তি পত্তন করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালার বাণীপুত্রগণ সেই পুণ্যক্ষেত্রে সেই পবিত্র ভিত্তির উপর আপনাদের সামর্থ্য অনুসারে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আপনাদের জাতীয় সাহিত্যের বিরাট মন্দির গড়িয়া তুলুন, এবং তদভ্যন্তরে আমাদের সেই শ্যামাঙ্গিনী জননীর পবিত্র স্মৃতিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করুন। ঊর্দ্ধলোক হইতে তাহার শোভা নিরীক্ষণ করিয়া তিনি তৃপ্ত হইবেন। "সাহিত্যসেবীর মধ্যে কেহ কবি, কেহ ঔপন্যাসিক, কেহ দার্শনিক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ জ্ঞানপ্রচারে ব্রতী, কেহ ভক্তিপথের উপদেষ্টা, কেহ কর্ম্মমার্গের প্রদর্শক। কিন্তু আজিকার দিনে বঙ্গের সাহিত্যসেবীর এক বই দ্বিতীয়

লক্ষ্য হইতে পারেনা। যিনি যে কামনা করিয়া কর্ম্ম করিবেন, তাঁহাকে সেই শ্যামাঙ্গিনী জননীর চরণে সেই কর্ম্মফল অর্পণ করিতে হইবে। যিনি যে ফুল আহরণ করিবেন, সে সকল ফুলই সেই রাঙা চরণের রক্ত জবার সহিত মিশাইতে হইবে। পত্র, পুষ্প, ফল, তোয় যাহা আহরণ করিবেন, তাহা ভক্তিপূর্ব্বক সেই স্থানেই অর্পণ করিতে হইবে। যজ্জুহোষি, যদশ্নাসি, যৎ করোষি দদাসি যৎ—ভগবতীর আদেশ—সে সমস্তই সেই এক চরণে অর্পণ করিতে হইবে।"

রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার উত্তর ছাত্রজীবন বিজ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি বিজ্ঞান-বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তাই বৈজ্ঞানিক রামেন্দ্রসুন্দর প্রথমে বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ হস্তে লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রকৃতির অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম ও তথ্যসকল নিজে বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি সাধারণের বোধগম্য অতি সরল ভাষায় উহা সকলকে বুঝাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। শুদ্ধ বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া তিনি যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় নাই—পিপাসা মিটে নাই। অনেক সময় নানাপ্রকার সংশয়ের কথা মনোমধ্যে উদিত হইয়া গোলযোগের সৃষ্টি করিত; সেই জন্য বৈজ্ঞানিকপরীক্ষিত ব্যবহারিক সত্যগুলিকে তিনি সার সত্যরূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাই তিনি দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপাদিত সত্যের অনুসন্ধানেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; ফলে দর্শন এবং বিজ্ঞানের সমন্বয়ে উত্তর কালে শাশ্বত সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। সুরেশচন্দ্র সেই কারণে বলিয়াছিলেন—"দর্শনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী ও সাহিত্যের যমুনা—মানবচিন্তার এই ত্রি-ধারা রামেন্দ্রসঙ্গমে যুক্তবেণীতে পরিণত হইয়াছিল।"

১৩২০ সালের সাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞান-শাখার সভাপতিরূপে রামেন্দ্রসুন্দর বলিয়াছিলেন "* * * বাঙ্গালা ভাষা এখনও বিজ্ঞান প্রচারের যোগ্য হইতে বিলম্ব রহিয়াছে; কিন্তু এই বিলম্ব ক্রমেই অসহ্য হইয়া পড়িতেছে। * * * আমাদের বাঙ্গালা ভাষা বর্ত্তমান অবস্থায় যতই দরিদ্র এবং অপুষ্ট হউক, উহাদ্বারা বিজ্ঞানবিদ্যার প্রচার যে একেবারে অসাধ্য, তাহা স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত নহি।" * * *

"জ্ঞান-বিজ্ঞান মনুষ্যজাতির সাধারণ সম্পত্তি; দেশ বিশেষের বা জাতি বিশেষের ইহাতে কোনরূপ বিশিষ্ট অধিকার নাই। গণিতবিদ্যা বা জ্যোতির্ব্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা বা রসায়নবিদ্যা, জীবনবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিদ্যা, কোন বিদ্যাতেই ভারতবর্ষের বা বঙ্গদেশের কোন বিশিষ্ট স্বত্বাধিকার থাকিতে পারেনা। যাঁহারা শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী, তাঁহাদের সকলেরও সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তথাপি ভারতবর্ষের অথবা বাঙ্গালা দেশের সহিত কোন কোন বিজ্ঞানের বিশিষ্ট অঙ্গের বিশিষ্ট সম্পর্ক আবিষ্কার করা যাইতে পারে। * * * বাঙ্গালার জলবায়ুতে, বাঙ্গালার আবহাওয়ার গতিতে যে বিশিষ্টতা আছে, তাহার বিশিষ্ট আলোচনায় বঙ্গের চিকিৎসক হইতে বঙ্গের কৃষক পর্য্যন্ত সকলেই উপকৃত হইবেন। বাঙ্গালা দেশের বাতাবর্ত্ত বা cyclone অন্তরীক্ষবিদ্যায় বা meteorologyতে একটা নূতন পরিচ্ছেদ যোজনা করিয়াছে। এই বিশিষ্ট আলোচনাতে আরও কি কোন নূতন পরিচ্ছেদের যোজনা হইবেনা? বঙ্গের সমতল ভূমিতে একখানা কঠিন পাষাণ পাওয়া যায়না। যে অতি পুরাতন মালভূমির ক্ষুদ্র অংশ আজ পর্য্যন্ত সমুদ্রের জলসীমার উর্দ্ধে থাকিয়া ভারতোপদ্বীপের দাক্ষিণাত্য অংশ গঠন করিয়াছে, গঙ্গাপ্রবাহ যাহার উত্তর ও পূর্ব্ব সীমায় প্রবহমান, সেই মালভূমিতে নাকি একখানা পুরাতন জীবাশ্ম বা fossil পাওয়া যায়না, এই সকল কারণে এদেশের সমতল ভূমি এ

পর্য্যন্ত ভূবিত্মাবিদের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু তথাপি গঙ্গা প্রবাহনিক্ষিপ্ত মৃত্তিকারাশি কত কালে কিরূপে আমাদের বঙ্গভূমিকে নির্ম্মিত করিয়াছে, এ বিষয়ের আলোচনা সমাপ্ত হইয়াছে কি? আমাদের মধ্যে যাঁহারা ইতিহাস লেখেন বা কাব্য লেখেন, তাঁহারা কথায় কথায় বলিয়া থাকেন, এই নিম্নবঙ্গ যেন সেই সেদিন সমুদ্রগর্ভে মগ্ন ছিল; কিন্তু এই কলিকাতা সহরের বহু নিম্নের ভূমি, যাহা এখন সাগরবক্ষের বহু নিম্নে অবস্থিত, তাহাই এক দিন বনমণ্ডিত হইয়া সাগরের উর্দ্ধে অবস্থিত ছিল, এই তথ্যটা তাঁহাদিগের জানা আবশ্যক নহে কি? ভাগীরথীর পশ্চিমে বীরভূমে যে অনুর্ব্বর রাঙ্গামাটির অস্তিত্ব দেখিতে পাই, উত্তরবঙ্গে ও ময়মনসিংহের জঙ্গলে যে রাঙ্গামাটি পুনরায় মাথা তুলিয়াছে, সেই রাঙ্গামাটির সহিত তদুপরি নিক্ষিপ্ত গঙ্গামৃত্তিকানির্ম্মিত নিম্নবঙ্গের সম্পর্কের কথা নিঃসংশয়ে নির্দ্ধারিত হইয়াছে কি? যাঁহারা ভূতত্ত্বে অভিজ্ঞ, তাঁহাদের নিকট এই সকলের এবং এই শ্রেণীর বিবিধ তত্ত্বের সমাধান পথের পথিক প্রত্যাশা করে। বাঙ্গালার মাটিতে এবং বাঙ্গালার জলে, বাঙ্গালার গ্রামে ও বাঙ্গালার বনে, যে সকল পশুপাখী, সাপব্যাঙ, মশামাছি, পোকামাকড় আহার বিহার করিতেছে, তাহাদের বিশিষ্ট বিবরণের জন্য, তাহাদের আহারবিহারের প্রথা জানিবার জন্য, আমরা কি কেবল বিদেশী শিকারীর মুখাপেক্ষা করিয়াই থাকিব? Asiatic Societyর পত্রিকার এবং Indian Museumএর প্রকাশিত monographগুলির উৎকট বৈজ্ঞানিক ভাষার আশ্রয় ভিন্ন আমাদের মত অনভিজ্ঞের পক্ষে স্বদেশের তত্ত্ব জানিবার কোন গত্যন্তর থাকিবেনা? বাঙ্গালা দেশের জীবজন্তু আপন আপন অবস্থানে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিয়া কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, কিরূপে পরস্পরকে জীবনদ্বন্দ্বে হঠাইতে চাহে, কিরূপে বেড়ায় এবং কি খায়, কিরূপে আততায়ীর প্রতি অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করে, কিরূপ আকারে এবং আচারে

অন্য জীবের, এমন কি আততায়ীর অনুকরণ করিয়া, নানা ছদ্মবেশের আবিষ্কার করিয়া, আততায়ীকে ঠকাইয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে, কিরূপে তাহারা সহস্র শত্রুর সন্নিধানে আপন বংশধারা রক্ষা করিবার নানা কৌশল উদ্ভাবন করে, এই সকল তথ্য জানিবার জন্য আমরা উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছি; আমাদের আকাঙ্ক্ষা কি মিটিবেনা? বাঙ্গালার জলে, বাঙ্গালার বায়ুমধ্যে, আমাদের প্রত্যেকের গৃহকোণে, শয্যাতলে, খাদ্যের ভিতর, দেহের ভিতর, যে সকল জীবাণু অলক্ষিতে বাস করিয়া রক্তবীজের মত বর্দ্ধিত হইতেছে, এবং কখনও বা আমাদের দেহরক্ষায় সৈনিকের কার্য্য করিতেছে, কখনও বা মহামারী উৎপাদন করিয়া লোকক্ষয় করিতেছে, তাহাদের আবিষ্কারের জন্য, তাহাদের বিবরণের জন্য, কি আমরা চিরকালই হকারাদি-নামা এবং রকারাদি-নামা বিদেশী পণ্ডিতদেরই মুখের দিকে চাহিয়া রহিব? * * * * আমি কেবল আমার নিবেদন জানাইতে, আমার প্রার্থনা জানাইতে, আমার ভিক্ষা জানাইতে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত। সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া এই বুধমণ্ডলীর নেতৃত্ব গ্রহণে আমার অধিকার নাই। তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্যউপদেশের ধৃষ্টতা আমার নাই। * * * আমার বিনীত প্রার্থনা, আমার বিনীত ভিক্ষা যদি আপনাদের উন্নত হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের হিতসাধনে অবনত করে, তাহা হইলে আমার এই চপলতা সাহিত্য-সম্মিলনের ভবিষ্যৎ ইতিবৃত্তলেখক কর্ত্তৃক মার্জ্জিত হইবে।"

১২৯১ সালের পৌষ মাসে প্রকাশিত "নবজীবন" পত্রের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় রামেন্দ্রসুন্দরের লিখিত "মহাশক্তি"শীর্ষক একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দর তৎকালে বি, এ, পড়িতেছিলেন। ১২৯২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত নবজীবনের পঞ্চম সংখ্যায় "মহাতরঙ্গ" নামক তাঁহার আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; তৎপরে আরও

কতকগুলি প্রবন্ধ উক্ত পত্রে বাহির হইয়াছিল। নবজীবন পত্রের প্রবন্ধ-লেখকদিগের নাম জানা না থাকিলে, কোন্ প্রবন্ধ কাহার লিখিত, সহজে তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইত। লেখকগণের নামের একটি তালিকামাত্র নবজীবনের প্রচ্ছদপত্রে বাহির হইত, তাহা পাঠ করিয়া কোন্ প্রবন্ধটি কাহার লিখিত তাহা জানিবার উপায় ছিলনা; তৎকালে সূচীপত্রে অথবা প্রবন্ধগুলির নামের পার্শ্বে, উর্দ্ধে বা নিম্নভাগে লেখকগণের নাম সন্নিবেশ করিবার রীতি ছিলনা। প্রথম প্রবন্ধসম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর বলিয়াছেন—"বাঙ্গালা সাহিত্যে আমার হাতেখড়ি এই নবজীবনে। প্রথম একটি প্রবন্ধ দিয়াছিলাম—তাহাতে নাম দিতে সাহস হইলনা—বেনামী পাঠাইয়া দিলাম। কিন্তু অক্ষয়বাবু (নবজীবনসম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার) যে রূপেই হউক, প্রবন্ধলেখক যে কে, তাহা ধরিয়া ফেলিলেন;—প্রবন্ধ যখন বাহির হইল, তখন দেখি, আমার নামেই উহা ছাপা হইয়াছে। প্রবন্ধটি যে কি, তাহা আপনাদিগকে বলিবনা, তাহাতে ভাষার উচ্ছ্বাস খুব প্রবল ছিল। অক্ষয়বাবু সেই উচ্ছ্বাসের প্রায় বার আনা বাদ দিয়া ছাপিয়া ছিলেন। তথাপি যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাতে এখনও আমার লজ্জা হয়। পরে আমি নবজীবনে আরও প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলাম—কতক স্বনামে, কতক বেনামে। এই ভাবে অক্ষয়বাবুর নিকটে আমার প্রথম হাতেখড়ি।" স্থানান্তরে তিনি বলিয়াছেন—"প্রথম প্রথম কালীপ্রসন্ন ঘোষের ভাষা আমাকে একবারে অভিভূত ক'রে ফেলেছিল, তাঁর মত গমগমে ভাষা না লিখ্‌লে মনের ভাব ভাল ক'রে প্রকাশ করা যায়না, এই ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হ'য়ে গিয়েছিল; সেই মোহ-পাশ থেকে নিজেকে মুক্ত ক'র্‌তে আমার অনেক সময় লেগেছিল। ক্রমশঃ দেখ্‌লাম যে, আমি যে সকল কথা ব'ল্‌তে চাই, তা, ও ভাষায় চ'ল্‌বেনা; আমার মনের ভাব প্রকাশ কর্‌বার জন্য উপযুক্ত ভাষা গ'ড়ে তু'ল্‌তে হ'ল।

আমি নবজীবনে একটা প্রবন্ধ পাঠিয়ে দিই; ভয়ে ও লজ্জায় তা'তে নিজের নাম দিইনি। অক্ষয় সরকার কেমন ক'রে আমার নাম জা'নতে পারলেন, আমাকে উৎসাহিত কর্‌বার জন্য প্রবন্ধটি একটু মার্জ্জিত ক'রে কাগজে বা'র করলেন। আমার উৎসাহ বে'ড়ে গেল। সাহিত্যক্ষেত্রে লোক চেন্‌বার ক্ষমতা অক্ষয় সরকারের আশ্চর্য্য রকমের ছিল।"

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ১২৯৮ সালে "সাধনা" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করেন; উক্ত পত্রিকার প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় খণ্ডে জ্যৈষ্ঠ মাসে "আকাশতরঙ্গ" নামে একটী বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রামেন্দ্রসুন্দর প্রকাশ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় খণ্ডে মাঘ মাসে প্রকাশিত পত্রিকায় "সুখ না দুঃখ" নামক, এবং ঐ বর্ষের বৈশাখ মাসের পত্রিকায় "স্বার্থ ও পরার্থ" নামক দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বর্ষে দ্বিতীয় খণ্ডে আষাঢ় মাসের সাধনায় "জগতের অস্তিত্ব" এবং ভাদ্র মাসের পত্রিকায় "সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব" শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ বাহির হয়। তৎপরে "মুক্তির পথ," "বৈরাগ্য", "প্রকৃতি-পূজা" প্রভৃতি আরও কয়েকটি প্রবন্ধ সাধনা পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল।

বঙ্গবাসী আফিস হইতে "জন্মভূমি" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির হইত, রামেন্দ্রসুন্দর তাহাতে "ফটোগ্রাফি" নামক একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক কালে "দাসী" নামক একখানি পত্রিকা সম্পাদন করিতেন; রামেন্দ্রসুন্দরের লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ ঐ দাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

কলিকাতায় "Associaton for the Higher Training of Young Men" ("যুবকগণের উচ্চ শিক্ষাসমিতি") নামক ছাত্রদের একটি সভা ছিল, বর্ত্তমান সময়ে উহা "য়ুনিভারসিটী ইনষ্টিটিউট"। ঐ সভা "য়ুনিভারসিটী ম্যাগাজিন" নামক একখানি পত্রিকা ইংরাজী

ভাষায় প্রচার করিতেন। রামেন্দ্রসুন্দর ঐ ম্যাগাজিনে "John Tyndal" নামক একটি সুন্দর প্রবন্ধ ইংরাজী ভাষায় লিখিয়াছিলেন।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের সম্পাদিত সুপ্রসিদ্ধ "সাহিত্য" পত্রে রামেন্দ্রসুন্দর ১৩০১ সাল হইতে নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি উক্ত পত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হর্ম্মান হেলমহোলৎজ, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, রজনীকান্ত গুপ্ত, আনি বেসাণ্ট প্রভৃতির চরিতকথা, "সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার" নামক সামাজিক প্রবন্ধ, "একটি পুরাতন বিষয়", "বৈজ্ঞানিক সংবাদ", "প্রাকৃতসৃষ্টি", "জীবন ও ধর্ম্ম", "ধর্ম্মপ্রবৃত্তি", "ধর্ম্মের প্রমাণ", "ধর্ম্মের জয়", "সত্য", "আত্মার অবিনাশিতা", "মাধ্যাকর্ষণ", "অমঙ্গলের উৎপত্তি", "প্রতীত্য-সমুৎপাদ", "মায়াপুরী" প্রভৃতি অনেকগুলি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য সকল প্রবন্ধই সুচিন্তিত এবং সুলিখিত। ঐ পত্রিকায় তাঁহার শেষ লিখিত যজ্ঞসম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলিও প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তিনি মানসী, বঙ্গদর্শন, আর্য্যাবর্ত্ত, মুকুল, উপাসনা, প্রদীপ, পুণ্য, ভারতবর্ষ ও সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; তন্মধ্যে দুই চারিটি প্রবন্ধের নাম আমরা এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি, ভারতী পত্রিকায় "কে বড় ?", "এক না দুই ?", "বর্ণ-তত্ত্ব", "উত্তাপের অপচয়", "নিয়মের রাজত্ব", "আচার ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান"; বঙ্গদর্শনে "অতিপ্রাকৃত", "মুক্তি"; আর্য্যাবর্ত্তে "বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা" এবং আরও কয়েকটি প্রবন্ধ; "প্রদীপে", "ফলিত জ্যোতিষ", "সৌন্দর্য্যবুদ্ধি" নামে কতিপয় প্রবন্ধ; পুণ্য পত্রে "পঞ্চভূত" প্রভৃতি এবং ভারতবর্ষে অনেকগুলি প্রবন্ধ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধগুলি একত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে বঙ্গ-সাহিত্যভাণ্ডার অমূল্য সম্পদে পূর্ণ হইবে, এ কথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি।

রামেন্দ্রসুন্দর স্বয়ং কতকগুলি প্রবন্ধ কতকগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কতকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া তিনি ১৩০৩ সালে "প্রকৃতি" নামক একখানি গ্রন্থ প্রচার করেন। এই গ্রন্থে তিনি সৌরজগতের উৎপত্তি, আকাশতরঙ্গ, পৃথিবীর বয়স, জ্ঞানের সীমানা, প্রাকৃতসৃষ্টি, প্রকৃতির মূর্ত্তি, হর্ম্মান হেলম্‌হোল্‌ৎজ, ক্লীফোর্ডের কীট, প্রাচীন জ্যোতিষ, মৃত্যু, আর্য্যজাতি ও প্রলয় নামে কতকগুলি প্রবন্ধের সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। গ্রন্থখানির পরবর্ত্তী সংস্করণে হর্ম্মান হেলম্‌হোল্‌ৎজ নামক প্রবন্ধটির পরিবর্ত্তে আলোক-তত্ত্ব ও পরমাণু নামে দুইটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হয়। গ্রন্থখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় অন্যতম পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন।

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বংশীবদন নামক এক ব্রাহ্মণ কবি 'পুণ্ডরীক-কুল-কীর্ত্তি-পঞ্জিকা' নামে একখানি সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। উহা বাঙ্গালা দেশের ফত্তেসিংহ জমিদারবংশের ইতিবৃত্ত। রামেন্দ্রসুন্দর উক্ত জমিদারবংশের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। ১৩০৪ সালের ভূ-কম্পের পর ভগ্ন অট্টালিকার স্তূপমধ্য হইতে তিনি সেই হস্তলিখিত অর্দ্ধছিন্ন কুলপঞ্জিকাখানির উদ্ধার করেন। উহাতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ-গণের এবং জিঝৌতিয়া ব্রাহ্মণগণের বাঙ্গালা দেশে উপনিবেশ স্থাপন সম্বন্ধে অনেক বিবরণ আছে। পরিশিষ্ট অংশে পরবর্ত্তী কালের ঘটনাসংযোগে উহার পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া রামেন্দ্রসুন্দর পুস্তকখানি মুদ্রিত করেন।

১৩১০ সালে রামেন্দ্রসুন্দর "জিজ্ঞাসা" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থে সুখ না দুঃখ ?, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড় ?, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই ?,

অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্যবুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা নামক দার্শনিক-প্রবন্ধগুলির সমাবেশ করা হইয়াছে। প্রবন্ধ-গৌরবে পুস্তকখানি সুধীসমাজে উচ্চতম স্থান লাভ করিয়াছে।

জিজ্ঞাসাসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্র—

শান্তিনিকেতন, ১০ অগ্রহায়ণ।

(১)

সাহিত্য-পরিষদের ঝুঁটা রত্নাবলীর শিরস্থানীয় একমাত্র সাররত্ন—

বহুমানাস্পদ ত্রিবেদী মহাশয়,

আপনার দুইখানি নূতন পুস্তক পাইয়া পরম লাভ মনে করিলাম। জিজ্ঞাসার প্রথম অধ্যায় পাঠে যেরূপ আনন্দরস অনুভব করিলাম, তাহাতে কৌতূহল জাগিয়া উঠিয়াছে আত্যন্তিক—পরবর্ত্তী অধ্যায়ের আরো কয়েকটা পাতা অতিবাহন করিলাম—ইচ্ছা এক দৌড়ে শেষ পৃষ্ঠার কূলে উপনীত হই—কোমর বাঁধিলাম পর্য্যন্ত, কিন্তু আর পারিয়া উঠি না, মনের খেদে পুস্তকখানি বন্ধ করিলাম। আপনার দুইখানি পুস্তক আমার মাস দুই তিনের অতি উপাদেয় খোরাক হইবে ; ভূরি ভোজন করিয়া স্বাস্থ্য মাটি করিব না। যতখানি পড়িলাম সবই অকৃত্রিম সত্য বলিয়া মনে হইল ; সমস্তই মর্ম্মস্পর্শী। পাঠ সমাপ্ত হইলে আমার যাহা বলিবার কথা তাহা কোনমত প্রকারে বলিতে চেষ্টা করিব। * * *

স্বাক্ষর—আপনার গুণানুরক্ত শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শান্তিনিকেতন, ১ পৌষ।

(২)

প্রিয় ত্রিবেদী মহাশয়,

জিজ্ঞাসার আমি হদ্দ চারি পাঁচ অধ্যায় পড়িয়াছি। আপনার গ্রন্থখানি জিনিষটা খুব ভাল—বিশেষতঃ আমার ন্যায় অকেজো লোকের পক্ষে। কিন্তু সকল পাঠকের পক্ষে তাহা যে ভাল, তাহা আমি বলিতে পারি না। কেননা বিদ্যালয়ের অবোধ ছাত্রেরা তাহা পড়িলে খুব সংশয়ের আবর্ত্তে হাবুডুবু খাইয়া তাহাদের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইবে। "চন্দ্রের ওপিঠ কেহ চক্ষে দেখে নাই—অতএব চন্দ্রের ওপিঠের সঙ্গে এ পিঠের সম্বন্ধ কিরূপ, তাহা মনুষ্যের জ্ঞানাতীত", এ কথাটি আপনি খুব জোরের সহিত প্রতিপাদন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে একটি কথা আপনার প্রতি আমার বক্তব্য আছে, আপনার গ্রন্থগুলি আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিয়া তাহা আমি আপনার নিকট ভাঙ্গিব—এখন না। * * * কিন্তু আপনার শরীরটার আরোগ্য আশু প্রয়োজনীয়, তাহার পরে অন্য কথা। আপনি ভাল আছেন শুনিলে আপনাকে আমি আরো আমার মনের কথা জানাইব।

স্বাক্ষর—আপনার গুণানুরক্ত শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৺ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র—

২৭।৫।০৪

রাম,

তোমার জিজ্ঞাসার ১৮৭ পৃষ্ঠা তক পড়িলাম। পড়িয়া বিস্মিত হইলাম। স্বভাবসুন্দর গোলাপের বর্ণনা করিতে ব্রতী হইয়া দক্ষ কবি যতটা পাঠককে সুখী করিতে পারে, তুমি অতি ভীষণ বেদান্তের শ্মশানে জনশূন্য মরুভূমিকে কি জানি কি মন্ত্রপূত শব্দরাশিদ্বারা ততোধিক মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া বৃদ্ধগণের আশীর্ব্বাদপাত্র হইয়াছ। * * *

ইমার্সন বলেন, কোন এক সময়ে জগতে শতাধিক Platoর পাঠক থাকে না, বেদান্তের ত পাঠক হয়ই না ; দ্বিতীয় ব্যক্তিও নাই, যে পাঠক হবে। বেদান্ত একটা হ্যামলেটের "স্বগত" মত ব্যাপার। তথাপি তুমি কল্পিত অল্পসংখ্যক বেদান্তপাঠকদিগকে কল্পিত জীবন দিয়া স্বর্ণাক্ষরে ছাপা বেদান্ত কল্পনায় পাঠ করাইয়া ভূরিপ্রমাণ কল্পিত আনন্দ দিয়াছ। * * *

স্বাক্ষর—ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৩১৭ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সাধারণের বোধগম্য করিবার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানবিষয়ের স্থূল কথাগুলি বক্তৃতার আকারে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতামালা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রস্তাবনাস্বরূপ রামেন্দ্রসুন্দর যে প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাই মায়াপুরী নামে অভিহিত হইয়া সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত হয়। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বহুবিধ বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের লীলাক্ষেত্ররূপে কেমন সুন্দর মায়াপুরীর সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা অতি সুন্দররূপে উহাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রবন্ধটি তিনি তাঁহার পরবর্ত্তী সংস্করণের জিজ্ঞাসা গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। বিজ্ঞানবিষয়ের আলোচনায় তিনি যে আনন্দের সন্ধান পাইয়াছিলেন, উক্ত প্রবন্ধের শেষ ভাগে তাহা বিবৃত হইয়াছে ; পাঠকগণের গোচরার্থে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"জগতে যাহা আমাদের অনিষ্টকর, তাহাই আমাদের হেয়, তাহার বর্জ্জনে আমরা সুখ লাভ করি ; আর যাহা আমাদের হিতকর, তাহাই আমাদের উপাদেয়, তাহার গ্রহণেও আমরা সুখ লাভ করি। জীবের মধ্যে যাহারা সুখভোগের অধিকারী, তাহারা সকলেই তাহা করে, এবং করে বলিয়াই তাহারা জীবনরক্ষায় এমন সমর্থ হয়। আমরা মনুষ্য হইয়াও জীব ; অতএব আমরাও অন্য জীবের ন্যায় জীবনরক্ষার্থ সুখান্বেষী হইয়া

হেয় বর্জ্জনে ও উপাদেয় গ্রহণে তৎপর আছি; তাই আমাদের জীবনরক্ষার্থ ও জীবন-সমৃদ্ধির অনুকূল যাবতীয় চেষ্টা এই সুখান্বেষণের অভিমুখে। আমরা যে স্বভাবতঃ সুখান্বেষণ করি, তাহার এই নিগূঢ় উদ্দেশ্য। কিন্তু মনুষ্যের একটা বিশেষ অধিকার আছে, ইতর জীবের হয়ত তাহা নাই। মনুষ্য অনেক সময় বিনা উদ্দেশ্যে সুখ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। এই সুখে তাহার কোন লাভ নাই, জীবন-রক্ষায় এতদ্দ্বারা তাহার কোন আনুকূল্য হয় না; ইহা উদ্দেশ্যহীন সুখ;—ইহা অতি বিশুদ্ধ নির্ম্মল বস্তু, ইহাকে সুখ না বলিয়া আনন্দ বলা উচিত। মনুষ্য এই বিশুদ্ধ আনন্দের অধিকারী। এই আনন্দে মনুষ্যের কোন হিত ঘটে কি না, এই প্রশ্ন তুলিতে গেলে সেই আনন্দের নির্ম্মলতা নষ্ট হয়। মনুষ্যগণ গান গাহিয়া যে আনন্দ পায়, মনুষ্য কবিতা শুনিয়া যে আনন্দ পায়, নদীতীরে বসিয়া নদীস্রোতের ধ্বনি শুনিয়া যে আনন্দ পায়, সে আনন্দ এই আনন্দের পর্য্যায়ভুক্ত। উহার উচ্চতর সোপানে উঠিয়া প্রকৃতির মূর্ত্তির দিকে কেবল চাহিয়া চাহিয়া যে আনন্দ পাওয়া যায়, প্রকৃতির মূর্ত্তিতে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের শ্রী আবিষ্কার করিয়া যে আনন্দ পাওয়া যায়, উহাও সেই পর্য্যায়ের আনন্দ; তাহাতেও জীবন-রক্ষার কোন সুবিধা ঘটিবে না, সে প্রশ্ন তোলাই চলে না। তুলিতে গেলে সেই আনন্দের বিশুদ্ধি ও নির্ম্মলতা নষ্ট হয়। বৈজ্ঞানিক জড় জগৎকে স্বার্থসাধনে নিয়োগ করিয়া জীবনযুদ্ধে সাহায্য লাভ করিতেছেন বটে; কিন্তু এই জগতের প্রতি চাহিয়া, এই জগতের নিয়মশৃঙ্খলার আবিষ্কার করিয়া, এই জগতের আঁধারে আলোক আনিয়া, এই জগতের অজ্ঞানাধিকৃত অংশে জ্ঞানের অধিকার প্রসার করিয়া, বৈজ্ঞানিক যে পরম আনন্দ লাভ করেন, তাহার নিকট এই টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন, ডাইনেমো ও মোটর, বৈদ্যুতিক ট্রাম ও বৈদ্যুতিক আলো, ষ্টিমশিপ ও এরোপ্লেন, অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। মানবসমাজে মারামারি, কাটাকাটি রক্তা-

রিক্তির মধ্যে বণিকের পণ্যশালা বা বিলাসীর আরামনিকেতন কিছুতেই শান্তি আনয়ন করিতে পারে না। মানবজাতীর অতীত ইতিহাস পূর্ণ করিয়া জীবন-যুদ্ধের যে ভীষণ কোলাহল আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় বধির করিতেছে, বাহ্য জগতের উপর বিজ্ঞানের এই প্রভুত্বলাভের জয়জয়কার সেই কোলাহলের মধ্যে লীন হইয়া গিয়াছে। এই বৈজ্ঞানিকতা-স্পর্দ্ধি-মানব-সভ্যতার মধ্যস্থলেও যখন সবল মানব ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় দুর্ব্বল মানবের শোণিতপানে কুণ্ঠিত হইতেছে না, তখন জীবন-যুদ্ধের ভীষণতা যে বৈজ্ঞানিকতার প্রভাবে মৃদুতা ধারণ করিবে, মানবসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার কোন আশ্বাসই নাই। এই সংগ্রামের অশান্তির মধ্যে যদি কিছুতে চিত্তক্ষেত্রে শান্তিবারি বর্ষণ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে উপরে যে আনন্দের কথা উল্লেখ করিতেছি, সেই আনন্দ কতকটা সমর্থ হইবে। বৈজ্ঞানিকের গর্ব্ব এই, ও গৌরব এই যে, তিনি ধরাধামে এই আনন্দের উৎস খুলিয়া দিয়াছেন, আমরা অঞ্জলি ভরিয়া উহার ধারাপানে তৃপ্ত হইতেছি। জীবনের সমরক্ষেত্রে পরস্পর যুধ্যমান কোটিমানবের পাদ-পীড়নে যে ধূলিরাশি উত্থিত হইতেছে, সেই ধূলিবিক্ষেপে এই বিশুদ্ধ আনন্দ-ধারাকে কলুষিত করিও না। ঋষি উচ্চকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন—বিজ্ঞানই আনন্দ ও বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। এই কল্পিত মায়াপুরীতে বদ্ধ জীব যদি ব্যবহারিক জগতের সম্পর্কে থাকিয়াও পূর্ণ ভূমানন্দের পূর্ব্বাস্বাদ লাভে অধিকারী হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞানের উৎস হইতে যে আনন্দপ্রবাহ বিগলিত হইতেছে, তাহাকে ব্যবহারিক জীবনের সুখ-দুঃখের কর্দ্দমলিপ্ত করিয়া পঙ্কিল করিও না।"

১৩১৮ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ভারত-শাস্ত্র-পিটক নামে বৈদিক গ্রন্থমালা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। পরিষৎ ঐ কার্য্য সম্পাদনের ভার রামেন্দ্রসুন্দরকে অর্পণ করেন। উহার প্রথম গ্রন্থ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বঙ্গানুবাদ। রামেন্দ্রসুন্দর "ঐতরেয় ব্রাহ্মণ" নামক বৈদিক গ্রন্থখানি বঙ্গ-

ভাষায় ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন। ইহার অনুবাদ করিতে গিয়া তাঁহাকে লুপ্ত বৈদিক ক্রিয়াকলাপের যথার্থ প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থ * প্রকাশসম্বন্ধে আমরা রামেন্দ্রসুন্দরের ভক্ত শিষ্য দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার মহাশয়কে ধন্যবাদ করিতেছি। তাঁহারই অনুরোধ এবং উৎসাহে গ্রন্থকার নিজে অনধিকারী বলিয়া সাহসী না হইয়াও প্রথমটা ভয়ে ভয়ে ঐ গুরু কার্য্যভার নিজের স্কন্ধে বহন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। সেই কারণে তিনি বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ প্রভৃতি প্রাচীন অমূল্য গ্রন্থরাজির আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন, এবং তাহার ফলে তিনি যাহা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, তাহা মাতৃভাষায় প্রকাশ করিয়া তাঁহার দেশবাসীকে বুঝাইবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা কার্য্যপ্রারম্ভে অকালে তাঁহাকে হারাইলাম—আমাদের আশা অপূর্ণ রহিয়া গেল।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্র—

প্রীতিভাজনেষু :—

আপনার ঐতরেয় ব্রাহ্মণটিকে পাইয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। এ যাহা বলিলাম ইহার গোড়ায় "বিচক্ষণ" শব্দ বসান আবশ্যক। ব্রাহ্মণটির শরীরের আয়তন দেখিয়া আমার মনে হইল যে, ব্রাহ্মণভোজন বৈদিক-যুগের যাগযজ্ঞের মুখ্যতম উদ্দেশ্য ছিল ;—দ্যুদেবগণের তুষ্টিসাধনের সঙ্গে ভূদেবগণের পুষ্টিসাধন অবিচ্ছেদ্য সৌহার্দ্দ-সূত্রে বাঁধা ছিল। ব্রহ্মবাদীরা

---

* মার্টিন হাউগ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রথম অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ বৈদিক যজ্ঞকাণ্ডের সম্বন্ধে জগতে অনেক ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করিয়াছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সটিক অনুবাদ করিয়া সেই ভ্রান্ত মত খণ্ডনপূর্ব্বক ঐ দুর্জ্ঞেয় বিষয়ের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

মাঝে মাঝে আসিয়া detective officer-দিগের ন্যায় খানাতল্লাসী করিতেছেন—আর ব্রাহ্মণটি চট্ পট্ তাহার একটা সদুত্তর দিয়া আপনাকে সাফাই করিতেছেন—ইহার ন্যায় সরস সামগ্রী কোথাও আমি দেখি নাই, অতি চমৎকার ব্যাপার! * * * যাহা হ'ক—আপনাকে—আপনার পরিশ্রমক্ষমতাকে—আপনার ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়কে—আপনার সদিচ্ছাকে ধন্য! তা ছাড়া ঐ ব্রাহ্মণটিকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতে যে আপনি কাতর হন নাই [দশরথ রাজা রামচন্দ্রকে বিশ্বামিত্রের হস্তে (বা কোন্ মুনির হস্তে আমার মনে হইতেছে না) সমর্পণ করিতে যেমন ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন] আপনি সেরূপ করেন নাই, ইহার জন্য আপনাকে কত যে ধন্যবাদ দিব তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। ঐ এক বড় অক্ষরের ধন্যের মধ্যে শসার বীজের ন্যায় অসংখ্য ধন্যবাদ সন্তুক্ত রহিয়াছে—জানিবেন।

স্বাক্ষর—গুণানুরক্ত শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কিছুকাল পরে রামেন্দ্রসুন্দর কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়েন ; সেই সময় হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, এবং পরিশ্রম করিবার সামর্থ্য এক কালে লোপ পায় ; সেই জন্য তিনি গ্রন্থপ্রকাশরূপ শ্রমসাধ্য কার্য্যে আশানুরূপ পরিশ্রম করিতে পারেন নাই বলিয়া সময়ে সময়ে বড় দুঃখ প্রকাশ করিতেন।

১৩২০ সালে "চরিত-কথা' নামক একখানি গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন ; উক্ত গ্রন্থে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, হর্ম্মান হেলম্‌হোল্‌ৎজ, আচার্য্য মোক্ষমূলর, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, রজনীকান্ত গুপ্ত ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি পরলোকগত মনীষিগণের চরিত-কথার উল্লেখ আছে। রামেন্দ্রসুন্দর বিভিন্ন সভায় পরলোকগত মহাত্মগণের সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন,

তিনি চরিত-কথায় তাহা সন্নিবেশিত করিয়া প্রকাশ করেন। বড়কে বড় করিয়া দেখিবার মত, ভাবিবার মত ক্ষমতা তাঁহার কিরূপ ছিল, তিনি তাহা উক্ত গ্রন্থে কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিয়াছেন। 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"রত্নাকরের রামনাম উচ্চারণে অধিকার ছিল না। অগত্যা মরা মরা বলিয়া তাঁহাকে উদ্ধার লাভ করিতে হইয়াছিল। ঐ পুরাতন পৌরাণিক নজীরের দোহাই দিয়া আমাদিগকেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগরের নাম কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। নতুবা ঐ নাম গ্রহণ করিতে আমাদের কোনরূপ অধিকার আছে কি না, এ বিষয়ে ঘোর সংশয় আরম্ভেই উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। বস্তুতই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা যে, তাঁহার নাম গ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম স্পর্দ্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বাঙ্গালী-জাতির প্রাচীন ইতিহাস কেমন ছিল, ঠিক্ স্পষ্ট জানিবার উপায় নাই। লক্ষ্মণসেনঘটিত প্রাচীন কিংবদন্তীটা অনৈতিহাসিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু পলাশীর লড়াইয়ের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর চরিত্র ইতিহাসে যে স্থান লাভ করিয়া আসিয়াছে, বিদ্যাসাগরের চরিত্র তাহা অপেক্ষা এত উচ্চে অবস্থিত যে, তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতেই অনেক সময়ে কুণ্ঠিত হইতে হয়। বাগ্‌যত কর্ম্মনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও আমাদের মত বাক্‌সর্ব্বস্ব সাধারণ বাঙ্গালী, উভয়ের মধ্যে এত ব্যবধান যে, স্বজাতীয় পরিচয়ে তাঁহার গুণ-কীর্ত্তনদ্বারা প্রকারান্তরে আত্মগৌরব খ্যাপন করিতে গেলে, বোধ হয় আমাদের পাপের মাত্রা আরও বাড়িয়া যাইতে পারে। আমাদের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে সহৃদয়তার এত অভাব ও মৌখিকতার এত প্রভাব যে, অদ্য যে তাঁহার স্মৃতির উপাসনার জন্য একত্র হইয়াছি, এই উপাসনার ব্যাপারটাই একটা ভণ্ডামি নহে, তাহা প্রমাণ করা দুষ্কর।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাংবৎসরিক উপাসনাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন— "ইহা বর্ষে বর্ষে অনুষ্ঠিত হইয়া আমাদের জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ক ক্রমশঃ ধৌত করিবে, এই আমাদের একমাত্র ভরসা। পূজিতের প্রীতি-উৎপাদন, বোধ হয় আমাদের শাস্ত্রবিহিত শ্রাদ্ধতর্পণাদি ব্যাপারের উদ্দেশ্য নহে; পূজক আত্মোন্নতি বিধানের জন্য ঐ সকল অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য। বিদ্যাসাগরের প্রেতপুরুষের প্রীতিজনন আমাদের অসাধ্য হইলেও আমরা স্বার্থের অনুরোধে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি।

কিন্তু প্রথমেই বিদ্যাসাগরকে আমাদের বলিয়া পরিচয় দিব কি না, সেই ঘোর সমস্যা আসিয়া দাঁড়ায়। সেই প্রকাণ্ড মানবতাকে সঙ্কীর্ণ বাঙ্গালীত্বের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে যাওয়া নিতান্ত ধৃষ্টতা বলিয়া মনে হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশাতে তাঁহার স্বজাতি তাঁহার নিকট আপনার যে মূর্ত্তি দেখাইয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবনকাহিনী পাঠে কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহার আত্মীয়বন্ধুগণের সম্পর্কে আসিয়া তাঁহাকে পদে পদে লজ্জিত ও প্রতারিত হইতে হইয়াছে, ইহার ভূরি উদাহরণ তাঁহার জীবনের আখ্যায়িকার মধ্যে সঙ্কলিত আছে। যদি কোন বৈদেশিক আমাদের জাতীয় চরিত্রের ছবি আঁকিতে প্রয়াসী হয়েন, তাঁহাকে মসীবর্ণ সংগ্রহ করিবার জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিতলেখকগণ প্রচুর পরিমাণে ঐ সকল সামগ্রী একাধারে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন।"

'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধের শেষ অংশে তিনি বলিয়াছেন—"ধর্ম্মতত্ত্বের অনুসন্ধানে বিদেশপর্য্যটন অনাবশ্যক হইলেও আমরা ঐ অনাবশ্যক পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; এমন সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে আপন ঘরে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ডাক দিলেন। শিক্ষিত বাঙ্গালী সেই আহ্বান শুনিল ও মাতৃমন্দিরে আনন্দমঠে ফিরিয়া আসিতে সঙ্কোচ বোধ করিল না।

আজি আমরা যে আপন ঘরে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছি, বিশ বৎসর পূর্ব্বেই সেই প্রত্যাবর্ত্তনের ডাক পড়িয়াছিল; এবং বঙ্কিমচন্দ্রের পথ-ভ্রষ্ট স্বদেশবাসী সেই ডাকে সারা দিতে ঔদাসীন্য দেখায় নাই। আজ সেই ডাক আরও উচ্চৈঃস্বরে পড়িয়াছে, এবং তপস্বী বঙ্কিমচন্দ্র মর্ত্ত্য-লোকের তপস্যার সমাধান করিয়া অদৃশ্য গোলক হইতে আমাদিগকে সেই পরিচিত স্বরে আবার ডাকিতেছেন।

"গীতাশাস্ত্র ধর্ম্মের কেবল সার্ব্বভৌমিক সনাতন অংশের উপদেশ দিয়া নিরস্ত হন নাই, প্রাদেশিক ধর্ম্ম ও যুগধর্ম্মের তত্ত্বও ঐ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। কয়েক সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতবাসী গীতাশাস্ত্রে যে সহস্র-শীর্ষ পুরুষের মুখনিঃসৃত অভয়বাণী শুনিয়া আসিতেছে, তাঁহার সহস্র অক্ষি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ও ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রতম অংশে নিবদ্ধ আছে। অতএব ঐ শাস্ত্রের উক্তির মধ্যে প্রাদেশিক ধর্ম্মের ও যুগধর্ম্মের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত হইতে হইবে না।

যুগধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যিনি যুগে যুগে সম্ভূত হন, তিনি ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের মহাহবের যুগে কোন্ মূর্ত্তিতে সম্ভূত হইয়াছিলেন, মহাভারতের মহাসাগর মন্থন করিয়া ভারতবাসীর নিকট লুপ্তপ্রায় সেই মূর্ত্তির উদ্ধারের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র যত্নপর হইয়াছিলেন। লুপ্তপ্রায় বলিলাম, তাহার একটু তাৎপর্য্য আছে। ভারতবর্ষের বৈষ্ণবসম্প্রদায় ভগবানের যে মূর্ত্তিকে পূজার জন্য আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা কুরুক্ষেত্রে সংশপ্তক সেনার সম্মুখীন পার্থ-সারথির মূর্ত্তি নহে, তাহা বৃন্দাবনবিহারী গোপীজন-বল্লভ বংশীবদনের মূর্ত্তি, তাহা নবনীতচোর উদূখলবদ্ধ বালগোপালের মূর্ত্তি;—যে মূর্ত্তিতে ভগবান্ শ্রীকরধৃত মোহনমুরলীর প্রত্যেক রন্ধ্র, শ্রীমুখ-মারুতে পূর্ণ করিয়া তদ্‌গত স্বরস্রোতে বিশ্বপ্রকৃতির মর্ম্মস্থলে আনন্দের ধারা সঞ্চার করেন, উহা সেই মূর্ত্তি। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত মূর্ত্তি ভারত-

বর্ষের উপাসকসম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ তৃপ্তি জন্মাইতে পারে নাই ; ভারতবাসী ঐশ্বর্য্যের অপেক্ষা মাধুর্য্যের উপাসনায় পক্ষপাতিতা দেখাইবে, ইহাতেও বিস্মিত হইব না। বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতসাগর মন্থন করিয়া যে মূর্ত্তিকে স্বদেশবাসীর সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের মূর্ত্তি ; তাহা ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপকের মূর্ত্তি—ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া তিনি সম্ভূত হন, উহা সেই মূর্ত্তি ; রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করিয়া যিনি রাষ্ট্র রক্ষা করেন, উহা তাঁহার মূর্ত্তি ; জীবনসংগ্রামে জীবন ধ্বংস করিয়া যিনি জীবনরক্ষা করেন, উহা তাঁহার মূর্ত্তি ; লোকস্থিতির অনুরোধে যিনি নির্ব্বিকার ও নিষ্করুণ হইয়া বসুন্ধরাকে শোণিত ক্লিন্ন দেখিয়া থাকেন, উহা তাঁহারই মূর্ত্তি। যিনি বিশ্বজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চারিত করুণাপ্রবাহের একমাত্র উৎস, তিনি যে কি কারণে ও কি উদ্দেশ্যে এই নিষ্করুণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জীবরক্তে বসুধা সিক্ত দেখিতে বাধ্য হন, তাহা তিনিই জানেন ; মনুষ্যের শাস্ত্র এখানে মূক ; অথবা এই মূর্ত্তিগ্রহণ সেই সনাতনী মায়ার সহিত অভিন্ন,—যাহা হইতে এই বিশ্বজগতের জন্মাদি, যাহা হইতে জীবের জীবন, যাহা হইতে জীবনে বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির নিরন্তর সামঞ্জস্যস্থাপনের চেষ্টা ঘটিতেছে, যাহা হইতে মানবের সকল দুঃখের নিদান সেই খৃষ্টানকথিত পাপপ্রবণতার উৎপত্তি হইয়াছে ; অথবা কবির ভাষায় বলিতে পারি,—ইহা সেই আধ সত্য, জ্ঞানী যখন তাঁহার আত্মার মধ্যে জগৎকারণের সন্ধান পাইবেন, যখন তিনি আপনাকেই এই এই জগদ্ভ্রান্তির কারণ বলিয়া জানিতে পারিবেন, যখন তাঁহার অপূর্ণ জগৎস্বপ্ন উদ্বোধনে বিলীন হইবে, তখন সেই মহাস্বপ্ন ভাঙ্গা দিনে যে আধ সত্য—

সত্যের সমুদ্র মাঝে হ'য়ে যাবে লীন।

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে আর বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রে আমরা এই যুগধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার বিশিষ্ট চেষ্টা দেখিতে পাই। তাঁহার জীবনের শেষভাগের প্রত্যেক কার্য্যই বোধ করি এই উদ্দেশ্যের অভিমুখ। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে আমাদিগের নিকট যুগধর্ম্মের আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবং যুগধর্ম্মের সংস্থাপনের জন্য যিনি যুগে যুগে সম্ভূত হন, তাঁহার মহৈশ্বর্য্যমণ্ডিত মূর্ত্তি আমাদের হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বঙ্গজননীর প্রত্যেক সন্তানের হৃদয়ভূমি মাতৃভক্তির জাহ্নবীজলে মর্জ্জিত করিয়া তাহাকে তাঁহার সিংহাসনস্থাপনের উপযোগী করিতে হইবে। তিনি যে পবিত্র আসনে উপবিষ্ট হইবেন, তাহা পুণ্যতোয়ে অভিষিক্ত করা আবশ্যক।”

‘মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ’ প্রসঙ্গে তিনি সাহিত্য ও ধর্ম্মসম্বন্ধে বলিয়াছেন—“সাহিত্যকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। অন্য দেশে ধর্ম্মের পারিভাষিক সংজ্ঞা যাহাই হউক, আমাদের এই ভারতবর্ষে ধর্ম্মের সংজ্ঞা আয়ত ও প্রশস্ত। যাহা ধরিয়া আছে, তাহাই ধর্ম্ম; যাহা মানবের ব্যক্তিগত জীবনকে ধরিয়া আছে, যাহা মানবের সামাজিক জীবনকে ধরিয়া আছে ও আরও ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধরিয়া আছে, আমাদের শাস্ত্রের নির্দ্দেশক্রমে তাহারই নাম ধর্ম্ম। সাহিত্য তাহার অঙ্গীভূত। ধর্ম্মরূপ সনাতন অশ্বত্থের মূল রহিয়াছে ঊর্দ্ধে দেবলোকে; ইহার শাখাপ্রশাখা অবাঙ্মুখে প্রসারিত হইয়া মানবসমাজে কর্ম্মরূপ ফুল-ফলে ও পত্রপল্লবে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। মানবজীবনের যাহাতে স্ফূর্ত্তি, ধর্ম্মের তথায় অধিকার, সাহিত্যে মানবজীবনের স্ফূর্ত্তি, অতএব সাহিত্য ধর্ম্মের অধিকারবহির্ভূত নহে। লোকস্থিতি ধর্ম্মের অভিপ্রায়—সাহিত্য লোকস্থিতির সহায়—অতএব সাহিত্যকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই। মানুষের সহিত মানুষের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, অতীতের সহিত ভবিষ্যতের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, মানুষকে মানুষের

সহিত করিয়া, ভবিষ্যৎকে অতীতের সহিত করিয়া লোকস্থিতির আনুকূল্য করাই সাহিত্যের একমাত্র ব্যবসায়। অতএব সাহিত্যকে ধর্ম্মের সহিত বিচ্ছিন্ন করিবার প্রয়োজন নাই। যে চতুষ্টয়ী বাণী বিশ্ববিধাতার চতুর্ম্মুখ হইতে সমীরিত হইয়া আমাদের পূর্ব্বপিতামহ মহর্ষিগণের দৃষ্টিপথে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল ও তাঁহাদের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাই ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য ভারতসমাজে আদর্শ সাহিত্যরূপে গৃহীত হইয়াছে; আমাদের ব্যবহারিক জীবনের ব্যবহারসম্পাদনার্থ যে কিছু লৌকিক সাহিত্য বর্ত্তমান আছে বা ভবিষ্যতে আবির্ভূত হইবে, তাহা সেই অপৌরুষেয় বাণীর স্মৃতি ও অনুস্মৃতি ও প্রতিধ্বনি বলিয়া আমরা ভারতবাসী যুগ-ব্যাপিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছি; পুরাতনী বাগ্বাদিনীর বীণার তন্ত্রীতে তাহাই বিবিধ মূর্চ্ছনায় যুগ ব্যাপিয়া ঝঙ্কৃত হইয়া আসিতেছে; তাঁহার কর-ধৃত পুস্তকমধ্যে তাহাই মসীলেখে অঙ্কিত ও নিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রলয়-কালে মহাবরাহের দংষ্ট্রার উপর যখন বসুন্ধরা অবস্থান করেন, ধর্ম্ম তখন মূর্ত্তিমান হইয়া সেই সনাতন সাহিত্যকে উদ্ধার করিয়া রক্ষা করেন। সুতরাং সাহিত্যকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই।"

১৩২০ সালে 'কর্ম্মকথা' নামক আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থে গ্রন্থকার বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কর্ম্মপরিত্যাগে মনুষ্যের ক্ষমতাও নাই, অধিকারও নাই। "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমা" এই বচন ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তিনি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। যজ্ঞ নামক শেষ প্রবন্ধে তিনি ইহা স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বেদের কর্ম্মকাণ্ডের সহিত জ্ঞানকাণ্ডের সমন্বয়ে একটা ক্ষুদ্র চেষ্টাও ঐ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। একের ভিত্তি Legality এবং অপরের ভিত্তি Morality; এই উভয়ের মধ্যে বিরোধ, তাহার সামঞ্জস্য হইতে পারে না। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, কর্ম্মকাণ্ডের সহিত জ্ঞান-

কাণ্ডের যে বিরোধ দেখা যায়, সেই বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্যস্থাপন ভগবদ্‌গীতার উদ্দেশ্য—Legality ও Morality এই উভয়বিধ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের ঐক্যসংস্থাপনে ও সমন্বয়সাধনে গীতার মাহাত্ম্য। উহার সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। পাপ ও পুণ্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, Legality ও Moralityর চিন্তায় পড়িয়া দিশাহারা হইয়া অবশেষে তিনি উপনিষদের আশ্রয় পাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—'উপনিষদঃ গাবঃ দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ; এক দিন আমি ঐটে অবলম্বন ক'রে Legality ও Moralityর মূলসূত্রে পৌঁছিবার চেষ্টা ক'রব। বেশ ক'রে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখ্‌তে হবে।' বড়ই দুঃখের বিষয়, প্রবন্ধ লিখিবার সময় আর তাঁহার জীবনে হইল না।

আমাদের দেশের সামান্য ভিক্ষুক হইতে আরম্ভ করিয়া অতিবড় প্রত্যেক গৃহস্থ পরিবার সকলেই সংসার কিছুই নহে, অনিত্য, অসার, এই ভাব কার্য্যতঃ না হউক অন্তরে পোষণ করিয়া বৈরাগ্যধর্ম্মেরই প্রাধান্য স্বীকার করেন। এরূপ অবস্থায় বৈরাগ্যধর্ম্মের প্রতি উক্ত গ্রন্থে একটু কটাক্ষপাত করা হইয়াছে বলিয়া অনেকের মনে একটু খট্‌কা লাগিতে পারে। গ্রন্থকার তাহার উত্তরে বলিয়াছেন—"যদ্দ্বারা মানুষে জীবনের কর্ম্মভারগ্রহণে কুণ্ঠিত হয়, স্বার্থপর শান্তির আশায় পরার্থপর অশান্তি স্বীকারে কুণ্ঠিত হয়; সেই বৈরাগ্যই আমার কটাক্ষের বিষয়; আমার বিশ্বাস, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে এই বৈরাগ্যের কখনই প্রশ্রয় দেয় নাই, এবং সেই জন্য গৃহস্থাশ্রমকে সকল আশ্রমের উচ্চে স্থান দিয়াছেন।

জীবনসমরে ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট মানব শান্তিপ্রয়াসী হইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালনে বিমুখ হয়, এবং সেই জন্য দারাসুতপরিবারকে বিধাতার কৃপায় অর্পণ করিয়া গৃহ হইতে পলায়নের প্রবৃত্তি সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে অনেকের পক্ষে দেখা যায়। বস্তুতই সারা জীবন লড়াই করিয়া এক সময়ে যদি

কাহারও যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ছুটি লইবার ইচ্ছা হয়, সে সময়ে ছুটি না দিলে কতকটা নিষ্ঠুরতা হয়। কিন্তু যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময়ে এইরূপ ছুটি চাহিতে গেলে সমাজ থাকে না।

কর্ম্মকাণ্ডের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ও তাহার জটিল বন্ধন দেখিয়া মুক্তি-প্রয়াসী বহু সাধু ব্যক্তি ধৈর্য্যরক্ষা করিতে পারেন না। অথচ সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে মানবসমাজ এই কর্ম্মকাণ্ডকেই আঁকড়াইয়া জড়াইয়া থাকিতে যায়; সময়ে সময়ে কোন মহাপুরুষ আসিয়া প্রাচীর বেড়া ভাঙ্গিয়া মনুষ্যকে স্বাধীনতা দিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহার স্থলে হয় স্বেচ্ছাচারিতা আসিয়া সমাজধর্ম্মকে নষ্ট করিবার উপক্রম করে, অথবা নূতন একটা প্রাচীর উঠিয়া নূতন বেষ্টনের সৃষ্টি করে। যে সকল আচার অনুষ্ঠান লইয়া এই কর্ম্মকাণ্ড, কোন সমাজই কোনরূপে তাহাদের একেবারে বর্জ্জন করিতে পারে না; উহারা কেবল মূর্ত্তি বদল করিয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চায়। মানবের ইতিহাস তাহার সাক্ষী।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধ-সঙ্ঘের এবং য়ুরোপে সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের ইতিহাস অবহিত হইয়া পর্য্যালোচনা করিলে, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইবে যে, এই শ্রেণির সন্ন্যাসীর দল শেষ পর্য্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল সমাজশত্রুর দলে পরিণত হইয়া পড়ে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র সংসারতাপদগ্ধ মানবকে যথাসময়ে ছুটি দিতে আপত্তি করিতেন না; বার্দ্ধক্যে যখন সেবা করিবার ক্ষমতা যায়, এবং সেবা লইবার সময় আইসে, সেই সময়কেই প্রব্রজ্যাগ্রহণের কাল বলিয়া ধর্ম্ম-শাস্ত্র সাধারণের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন; এবং গৃহধর্ম্মত্যাগের পর ও যতিধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে বানপ্রস্থের অতি কঠোর ব্রতের ও দুষ্কর তপস্যার ব্যবস্থা করিয়া অনধিকারী ব্যক্তি যাহাতে প্রব্রজ্যা গ্রহণে সঙ্কুচিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। বেদপন্থী সমাজের সমাজবন্ধনের একটা নিগূঢ় তত্ত্ব এইখানে পাওয়া যায়। বস্তুতই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে

কেহ কোন কালেই পারে না। * * * ভগবান্ তথাগত, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, বা শ্রীচৈতন্য এবং তাঁহাদের অনুবর্ত্তী অনেক মাহাত্মা অকালে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কর্ম্মত্যাগ করেন নাই; বরং তাঁহারা ক্ষুদ্র কর্ম্মের স্থলে বৃহৎ কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলেন; তাঁহাদের কৃত কর্ম্মের ফল সমস্ত মানবজাতি অদ্যাপি ভোগ করিতেছে এবং চিরকাল করিবে। বস্তুতঃ শাস্ত্রানুমোদিত বিশুদ্ধ বৈরাগ্য নিষ্কাম কর্ম্মপরতা হইতে অভিন্ন। সেই বৈরাগ্যের প্রতি কোনরূপ কটাক্ষপাত আমার পক্ষে সাধ্য নহে।

'দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগকে রক্ষা করুন, জননীসমা নদী ও নির্ঝরবান্ পর্ব্বত আমাদিগকে রক্ষা করুন, সূর্য্য ও উষা দেবী আমাদের অপরাধ লইবেন না'—আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা জীবনে আসক্ত হইয়া এইরূপে দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন। যাহাতে ভূতগণের পীড়া না হয়, একান্ত পক্ষে অল্পমাত্র পীড়া জন্মে, এইরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকার্জ্জন করিবে। যেমন বায়ু আশ্রয় করিয়া সর্ব্বজন্তু বাস করে, সেইরূপ গৃহকে আশ্রয় করিয়া সমুদয় আশ্রম বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, ভূতগণ, অতিথিগণ সকলেই গৃহস্থের প্রত্যাশী, গৃহস্থাশ্রমের পর আশ্রম নাই—এইরূপ আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান। কর্ম্মে তোমার অধিকার হউক, ফলকামনায় তোমার রতি না থাকে, ফলকামনা তোমার প্রবৃত্তির হেতু না হয়, কর্ম্মপরিত্যাগে তোমার আসক্তি না জন্মে—এইরূপ আমাদের ভগবদ্ভক্তি।

সংসারের শোণিতকর্দ্দমময় পিচ্ছিল ক্ষেত্রে সহস্রবার স্খলিতপদ হইয়া, আততায়ীনিক্ষিপ্ত অস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত হইয়া, জীবনদ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকাতেই মনুষ্যের গৌরব, এবং এই জীবনদ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকিয়া যে শিক্ষা লাভ হয়, তাহার চরম ফল দুঃখমুক্তি। এই শিক্ষার ফলে মনুষ্যের এমন অবস্থা এক সময়ে উপস্থিত হইবে, যখন সে কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ত্তব্যসাধনই

তাহার জীবনের স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান করিবে; তোমরা যাহাকে দুঃখ বল, সেই দুঃখের স্বীকারই জীবের উন্নতির ও অভিব্যক্তির প্রধান লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিবে; দুঃখভোগশক্তিই মনুষ্যের প্রকৃত গৌরব বলিয়া মানিয়া লইবে; এবং আপনার প্রতি, পুত্রকলত্রের প্রতি, স্বজনবান্ধবের প্রতি, বিশ্বের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠানকেই এমন এক পরম প্রীতি, এমন এক অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি, এমন এক অকৃত্রিম আনন্দরূপে অনুভব করিবে, জড়োচিত শান্তি সেই আনন্দের নিকট ম্লান হইয়া প্রতীয়মান হইতে থাকিবে।

ইহাই প্রকৃত বৈরাগ্য। আমাদের শ্রেষ্ঠ ইতিহাসে এই বৈরাগ্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে; আমাদের শ্রেষ্ঠ কাব্যে কবিকুলগুরু এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের মহামহিম আদর্শ অঙ্কিত করিয়া আমাদের গন্তব্য পথ দেখাইয়াছেন। সে পথ আমরা অনুসরণ না করি, সে আমাদেরই দুর্ভাগ্য।"

কর্ম্মকথা অমূল্য গ্রন্থ; ইহার সহিত তুলনার উপযুক্ত গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় ইতোপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। এই গ্রন্থে মুক্তির পথ, বৈরাগ্য, জীবন ও ধর্ম্ম, স্বার্থ ও পরার্থ, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, আচার, ধর্ম্মের প্রমাণ, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, প্রকৃতি-পূজা, ধর্ম্মের জয় এবং যজ্ঞ নামক একাদশটি প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে।

১৩২১ সালে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত ভারতীয় ইতিহাসের ধারাসম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া "বিচিত্র প্রসঙ্গ" নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। বিপিনবাবু বলিয়াছেন—"ভারতবর্ষের" পুরাতন "ফাইল" যাঁহারা নাড়া চাড়া করেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, কেমন করিয়া তিনি সভ্য মানবসমাজের অতীত ইতিহাসের গুপ্ত মর্ম্মটুকু বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। জীবতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মিসর, হিব্রু, গ্রীক্, রোমের ইতিহাসের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িতে

হইবে, এই বাসনা তাঁহার ছিল, কিন্তু মধ্যপথে হঠাৎ তিনি থামিয়া পড়িলেন। এ ভাবে ইতিহাস অনুশীলনের ধারা ভারতবর্ষে এই প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।" "বিচিত্র প্রসঙ্গ" সম্বন্ধে ৺স্যার-গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র—

শ্রীহরি শরণম্

নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা।
10, Charakdanga Road,
Calcutta.

কল্যাণবরেষু—

"বিচিত্র প্রসঙ্গ" পুস্তকে আপনার কথাগুলি পাঠ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। কথাগুলি নিরভিমান পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং নিশ্চল চিন্তাশীলতাব্যঞ্জক। তাহার মধ্যে নূতন কথা অনেক আছে, কিন্তু তাহা নূতনত্বের চাক্‌চিক্যরঞ্জিত নহে। * * * রামায়ণ ও মহাভারতের সমালোচনায় রামচরিত, কৃষ্ণচরিত, ভীষ্মচরিত ও অর্জ্জুনচরিতের বিশ্লেষণে স্বল্প কথায় সুন্দরভাবে আপনি যাহা বলিয়াছেন, অনেক কথাতেও অমন বিশদভাবে তাহা ব্যক্ত করিতে পারা যায় বলিয়া মনে হয় না। বৈদিক যুগে হিন্দুসমাজে উচ্চ শিক্ষা প্রচারের সম্বন্ধে আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা নূতন কথা ও আর্য্যজাতির অসাধারণ গৌরবের কথা। আর সেই উপলক্ষে প্রাসঙ্গিক ভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও সম্পূর্ণ শাস্ত্র এবং যুক্তিসঙ্গত। ঐ সমস্ত কথা হিন্দুসমাজসংস্কারক ও হিন্দুসমাজসংরক্ষক উভয় পক্ষেরই বিশেষ প্রণিধান করিবার বিষয়। বিচিত্র প্রসঙ্গ যথার্থই একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ * * *।

শুভানুধ্যায়ী

স্বাক্ষর—শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকায় বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দ-তত্ত্ব এবং বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষাসম্পর্কে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা হইতে সেই প্রবন্ধগুলি সঙ্কলন করিয়া তিনি ১৩২৪ সালে "শব্দকথা" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থে "ধ্বনিবিচার", "কারকপ্রকরণ", "না", "বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত", "বাঙ্গালা ব্যাকরণ", "বৈজ্ঞানিক পরিভাষা", "শরীরবিজ্ঞান পরিভাষা", "বৈদ্যক পরিভাষা", "রাসায়নিক পরিভাষা" ও "বাঙ্গালার প্রথম রসায়ন গ্রন্থ" নামক দশটি প্রবন্ধ নিবদ্ধ আছে। সকল প্রবন্ধগুলিই বিশেষ সাবধানতার সহিত বিবেচনাপূর্ব্বক লিখিত হইয়াছে। ধ্বনিবিচার প্রবন্ধটির প্রতি গ্রন্থকারের মমত্ব ছিল; উঁহাতে তিনি কিছু নূতন কথা বলিয়াছেন; এইরূপে বাঙ্গালা ভাষার শব্দতত্ত্ব আর কেহ আলোচনা করিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না। গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"পাশ্চাত্য জাতির উপার্জ্জিত জ্ঞানরাশি আত্মসাৎ করিবার জন্য আমাদিগকে পাশ্চাত্য ভাষার অনুশীলন করিতে হইবে। কিন্তু ঐ বিজাতীয় ভাষা কখন আমাদের আপনার ভাষা হইবে না, কখন আমরা অন্তরের কথা ঐ ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিব না। যদি আমাদের স্বজাতিকে ও আমাদের আত্মীয়বর্গকে পাশ্চাত্য জাতির উপার্জ্জিত জ্ঞানসম্পত্তির অধিকারী করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের মাতৃভাষাকে এইরূপে সংস্কৃত মার্জ্জিত পরিণত করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে সেই মাতৃভাষা এই জ্ঞানবিস্তারকর্ম্মের ও জ্ঞান-প্রচার কর্ম্মের যোগ্য হয়। এই বঙ্গভাষারই অঙ্গে নূতন রক্ত সঞ্চালিত করিয়া তাহাকে পুষ্ট, সমর্থ, পরিণত করিয়া তুলিতে হইবে। এই কার্য্য সম্পাদন এখন কৃতী বাঙ্গালীর অন্যতম কার্য্য।"

ভবিষ্যতে যখন বাঙ্গালা ভাষা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, পণ্ডিতগণ যখন ঐ ভাষার ব্যাকরণ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন ভাষার মূলতত্ত্ব

বিশ্লেষণ করিবার কালে তাঁহারা ঐ শব্দকথা গ্রন্থ হইতে বিশেষ সাহায্য পাইবেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। গ্রন্থখানি বাঙ্গালার সুধীসমাজে বিশেষভাবে আদর লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় অধুনা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে এম্, এ, পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষগণ শব্দ-কথা গ্রন্থখানি উক্ত পরীক্ষায় পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচন করিয়া গ্রন্থকারের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। "ধ্বনিবিচার" প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় গ্রন্থকারকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার অনুরূপ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

শিলাইদহ।

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

* * * *

"ধ্বনিবিচার পড়িয়া আপনাকে পত্র লিখিব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু পাপ আলস্য আসিয়া বাধা দিল। আমিও এই বিষয়টা এইভাবে আলোচনা করিব বলিয়া এক দিন স্থির করিয়াছিলাম, সেই জন্য আপনার প্রবন্ধের আরম্ভ-ভাগ পড়িয়া মনে মনে আপনার সঙ্গে ঝগড়া করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, তাহার পরে সমস্তটা পড়িয়া দেখিলাম, আমি এতটা পরিষ্কার করিয়া এবং এমন বিজ্ঞানসম্মত শৃঙ্খলার সহিত কখনই বলিতে পারিতাম না। আমি কেবল একটা আভাস মাত্র দিতে পারিতাম। আপনার এই প্রবন্ধ পড়িয়া ধন্যাত্মক শব্দতত্ত্ব গভীরতর ও নূতনতর করিয়া দেখিতে পাইলাম। এক্ষণে এই পন্থা ধরিয়া আলোচনাটিকে আরও অনেক শাখাপ্রশাখায় বাহিত করিয়া লইয়া যাইতে পারা যাইবে বলিয়া মনে করি। * * * প্রত্যেক ধ্বনিরই একটা বিশেষ মূর্ত্তি আছে, এবং সেই জন্য এই সকল ধ্বনির সমবায়ে

অনুভূতিমূলক ধন্যাত্মক শব্দ অন্ততঃ বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইয়াছে, এ তত্ত্বটি আপনার প্রবন্ধে সুন্দর করিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। * * * ১১ই ফাল্গুন ১৩১৪।

ভবদীয়

স্বাক্ষর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রামেন্দ্রসুন্দরের পরলোকগমনের পর "বিচিত্র জগৎ" ও "যজ্ঞ কথা" নামক দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৩২৩ ও ১৩২৪ সালে "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রে তিনি অনেকগুলি দার্শনিক প্রবন্ধের আলোচনা করিয়াছিলেন, সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া "বিচিত্র জগৎ" নাম দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানি ভারতবর্ষ হইতে পুণর্মুদ্রিত বলিতে হইবে। ভারতবর্ষের সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে উহা মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ পুস্তকে বিজ্ঞান-বিদ্যায় বাহ্যজগৎ, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎ, বাঙ্‌ময় জগৎ, জড়জগৎ, বৈজ্ঞানিকের আকাশ, প্রাণময় জগৎ, প্রাণের কাহিনী, প্রজ্ঞার জয় ও চঞ্চল জগৎ নামে নয়টি সন্দর্ভ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গভীর জ্ঞান ও উচ্চ চিন্তার ফলস্বরূপ ঐ প্রবন্ধগুলি লিখিত হইয়াছিল। সহজ বোধগম্য ভাষায় কিরূপে দুরূহ বিষয়ের আলোচনা করা চলে, বিচিত্র জগৎ তাহার একটা দৃষ্টান্তস্থল।

জীবনের শেষ সময়ে রামেন্দ্রসুন্দর বৈদিক যজ্ঞসম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস্ চেন্সলর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের নির্দ্দেশক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাগৃহে তিনি উহা পাঠ করেন। পাঠান্তে 'সাহিত্য' পত্রে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। যজ্ঞের সম্বন্ধে তাঁহার আরও অনেক নূতন কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল; বিধাতা সে আশা পূর্ণ করিতে দিলেন না।

যজ্ঞ-কথা গ্রন্থে অগ্ন্যাধান ও অগ্নিহোত্র, ইষ্টিযাগ ও পশুযাগ, সোম-যাগ, খ্রীষ্ট-যাগ ও পুরুষ-যজ্ঞ নামে পাঁচটি প্রসঙ্গ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; ঐ গ্রন্থের বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিয়াছেন—"প্রত্যেক প্রবন্ধে তিনি যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, কেবল বঙ্গদেশে নহে, অন্যদেশের সাহিত্যেও তাহা বিরল। বৈদিক যজ্ঞসমূহের উদ্দেশ্য ও অনুষ্ঠানপদ্ধতি যে এমন সরল ভাষায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না।" রিপন কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার রচনাপাঠে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—"রামেন্দ্রবাবু কেমন করিয়া বৈদিক যুগের কথা, বিশেষতঃ যজ্ঞের দার্শনিক তত্ত্ব এমন সুন্দরভাবে বলিতে পারিতেছেন? আমি যখন কলেজে কাজ করিতাম, তখন তাঁহাকে প্রায় নাস্তিক বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, এখন তিনি হার্ব্বাট স্পেন্সার হইতে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছেন।"

রামেন্দ্রসুন্দর যজ্ঞের দার্শনিক তত্ত্ব ও বেদের বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস-চর্চ্চায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। আরও কিছু দিন বাঁচিয়া থাকিলে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যকে যে অমূল্য সম্পদ দান করিতেন, তাহার সহিত জগতের অন্য কোন সাহিত্যের তুলনা হইত না। ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন এবং বেদান্তসাগর একে একে পার হইয়া তিনি অবশেষে বেদের কর্ম্ম এবং জ্ঞানকাণ্ডে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। বেদের প্রতিপাদিত বিষয়গুলি বেশ ভালরূপে আয়ত্ত করিয়া, তাঁহার চিত্ত একবারে তৎপ্রতি নিবিষ্ট হইয়াছিল। তিনি বেদকে খুব বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন, এবং বড় করিয়া দেখাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তাঁহার লেখার মধ্যে পাশ্চাত্য দর্শনের ও বিজ্ঞানের ভাবসকল স্থানে স্থানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; কিন্তু তিনি যে চিরপুরাতন ভাবটিকে

অন্তরের মধ্যে পোষণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই ভাবটির মূল অংশ আমরা সেই পুরাতন বেদান্তশাস্ত্রের মধ্যেই দেখিতে পাই ; নবীন বিজ্ঞান ও দর্শনের জ্ঞানের মধ্যে তাহা পাই না। সেই চিন্তা—সেই ভাবটিকে তিনি এত বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তাহার সহিত অন্য কিছুর গড়মিল তিনি একবারে দেখিতে পারিতেন না।

যজ্ঞের কথা বলিতে গিয়া রামেন্দ্রসুন্দর যজ্ঞের উদ্দেশ্যসম্বন্ধে তিনটা মতের উল্লেখ করিয়াছেন। সমাজের অভিব্যক্তির তিনটা স্তরে তিনটা মত। তিনি বলিয়াছেন—"প্রথম স্তরে দেবতার স্বার্থসাধন করিয়া দেবতার খোরাক যোগাইয়া তাঁহার প্রীতিসাধন এবং তদ্দ্বারা নিজের স্বার্থ-সাধন। দ্বিতীয় স্তরের উদ্দেশ্য কোনও কিছু অর্পণ করিয়া দেবতার নিকট বশ্যতাস্বীকার। এখানে দেবতার লাভালাভ দেখার দরকার হয় না। কেজো জিনিষের বদলে অকেজো জিনিষ দিলেও বিশেষ হানি নাই ; নিষ্ক্রয়স্বরূপে অল্প মূল্যের জিনিষ দিলেও চলিতে পারে। মাংসের পরিবর্ত্তে রুটী দিলেও চলিবে। আরো উন্নত তৃতীয় স্তরে স্বার্থ অন্বেষণের স্থানে একবারে স্বার্থত্যাগ আসিয়া পড়ে। ত্যাগটাই তখন মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে এই অভিপ্রায়টা খুব স্পষ্ট হইয়াছিল দেখা যায়। বেদপন্থীরা এই ত্যাগটাকেই প্রাধান্য দিয়াছিলেন। যাজ্ঞিকের পরিভাষামতে কোন দ্রব্যত্যাগেরই নাম যজ্ঞ। অগ্নি, সোম, ইন্দ্র প্রভৃতির উদ্দেশে কোন যাগে অধ্বর্য্যু যজমানের পক্ষ হইতে আহুতি দিতেন ; যজমান তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া থাকিতেন, এবং আহুতির পর ত্যাগমন্ত্র বলিতেন। ত্যাগমন্ত্র ইদম্ অগ্নয়ে—ন মম, ইদং সোমায়—ন মম, ইদম্ ইন্দ্রায়—ন মম, এইরূপ আকারের। তাৎপর্য্য এই যে, দেবতাকে সর্ব্বস্ব দিতে হইবে ; যাহা কিছু প্রিয়তম, তাহাই দিতে হইবে। সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না। তবে

মানুষে সর্ব্বস্ব দিতে পারে না; আপনাকে দিতে পারে না; কাজেই নিষ্ক্রয়রূপে অন্য কিছু দিতে হয়। * * * *”

বেদপন্থীর মতে “ঈশ্বর আত্মাহুতি দিয়া বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছেন;—এই সৃষ্টিব্যাপারে তিনি নিজেই যজ্ঞের পশু হইয়াছিলেন। যিনি মুক্ত, তিনি বদ্ধ হইয়াছেন; যিনি বড়, তিনি ছোট হইয়াছেন; যিনি অমৃত, তিনি মৃত্যু স্বীকার করিয়াছেন। ইতর জীব জানে না যে, সে নিজে সেই ঈশ্বর হইতে অভিন্ন; সে নিজেই ঈশ্বর—তাহার বাহিরে আর কোন ঈশ্বর নাই; অতএব সে চিরমুক্ত; অথচ তাহাকে বদ্ধ সাজিয়া সংসারযাত্রা চালাইতে হইতেছে, অমৃত হইয়াও মৃত্যু স্বীকার করিতে হইতেছে; সেও জীবন ব্যাপিয়া পশুর মত যূপবদ্ধ থাকিয়া পুরুষযাগে আত্মাহুতির জন্য নিযুক্ত আছে। ফলে মানুষের জীবনযাত্রাটাই যজ্ঞানুষ্ঠান। ছান্দোগ্য উপনিষৎ এই তত্ত্বটি অতি স্পষ্ট ভাষায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন—পুরুষো বাব যজ্ঞস্তস্য যানি চতুর্বিংশতি বর্ষাণি তৎ প্রাতঃসবনম্, যানি চতুশ্চত্বারিংশৎ বর্ষাণি তৎ মাধ্যন্দিনং সবনম্, অথ যানি অষ্টাচত্বারিংশদ্ বর্ষাণি তৎ তৃতীয় সবনম্,— মানুষের সমস্ত জীবনটাই যজ্ঞ; তাহার চরম পরমায়ু একশত ষোল বৎসর ধরিলে প্রথম চব্বিশ বৎসর সেই যজ্ঞের প্রাতঃসবন, মনুষ্যের চুয়াল্লিশ বৎসর মাধ্যন্দিন সবন, এবং শেষের আটচল্লিশ বৎসর তৃতীয় সবন মনে করা যাইতে পারে। আবার বলা হইতেছে, মানুষ শৈশবে যে পান ভোজন করে, তাহাই এই যজ্ঞের দীক্ষা, বাল্যে যে খেলাধুলা করে, তাহাই উপসদ্; যৌবনে যে সংসারধর্ম্ম করে, তাহাই স্তোত্রগান ও শস্ত্রপাঠ; বার্দ্ধক্যে যে তপস্যাদি করে, তাহাই দক্ষিণা; পরিশেষে মৃত্যুই তাহার অবভৃথ স্নান। ছান্দোগ্য বলেন, ঘোর আঙ্গিরস ঋষি তাঁহার শিষ্য দেবকী-নন্দন কৃষ্ণকে মানবজীবনসম্বন্ধে এই উপদেশ দিয়া অবশেষে বলিয়াছিলেন—‘অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণসংশিতমসি’—অহে সূক্ষ্ম

প্রাণধারী মানুষ, তুমি অচ্যুত, তুমি অক্ষয়। উত্তরকালে সমস্ত ভারতবর্ষ এই দেবকী-নন্দন কৃষ্ণটিকে অচ্যুত এবং অক্ষয় পুরুষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ঘোর আঙ্গিরসের উপদেশকেই পল্লবিত করিয়া গীতা-শাস্ত্ররূপে তাঁহারই মুখ দিয়া প্রচার করা হইয়াছে। একালের অনেক পণ্ডিত বলেন, যজ্ঞকে নিন্দা করিবার জন্যই গীতাশাস্ত্রের প্রচার হইয়াছিল; বেদের কর্ম্মকাণ্ডকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্যই আধুনিক কালে উপনিষদের এবং গীতাশাস্ত্রের জ্ঞানকাণ্ডের প্রচার হইয়াছিল। এ সব বাজে কথায় আপনারা কাণ দিবেন না। কর্ম্মকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডে কোন মর্ম্মগত বিরোধ নাই, আপনারা আশ্বস্ত হইবেন।"

"এই দেবকী-নন্দন কৃষ্ণ গীতামধ্যেই বলিয়াছেন—'সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টাঃ পুরোবাচ প্রজাপতিঃ, অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্ এষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্'—স্বয়ং প্রজাপতি যজ্ঞের সহিতই প্রজা সৃষ্টি করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, এই যজ্ঞ দ্বারাই তোমরা বৃদ্ধি পাইবে, ইহাতেই তোমাদের কামনার পূরণ হইবে। 'যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ'—যাহারা যজ্ঞের হবিঃশেষরূপে সকল ভোগ্য ভোগ করে, তাহারা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। 'যজ্ঞ-শিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্'—যজ্ঞের যাহা হবিঃশেষ, তাহাই অমৃত; সেই অমৃতভোজনে সনাতন ব্রহ্মলাভ হয়। অধিক কি বলিব, 'তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্'—নিত্য সর্ব্বগত ব্রহ্ম যজ্ঞেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। এ যজ্ঞ কোন্ যজ্ঞ? এক পক্ষে ইহা বিশ্বকর্ম্মার পুরুষ-যজ্ঞ, অন্য পক্ষে ইহা ইতর মানবের জীবন-যজ্ঞ; একটা অন্যটারই প্রকারভেদ। জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মকেই যজ্ঞের কর্ম্মাঙ্গরূপে দেখিতে হইবে। ব্রাহ্মণ ঘোর আঙ্গিরসেরও এই উপদেশ। দেবকী-নন্দন বলি-তেছেন, 'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ, যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্বমদর্পণম্'—যে কর্ম্ম তুমি করিবে, তোমার দান, তোমার তপস্যা,

তোমার পূজা, তোমার পানভোজন পর্য্যন্ত তুমি যজ্ঞরূপে আমার উদ্দেশ্যে অর্পণ করিবে; আমি অচ্যুতই সেই যজ্ঞের দেবতা। তন্ত্রপন্থীও ঐ বাক্যকে ঘুরাইয়া বলিয়াছেন,—'যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্।' মনে রাখিবেন যজ্ঞ ও পূজা উভয়েরই তাৎপর্য্য সমান। যজ্ঞ নানাবিধ—'দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে, স্বাধ্যায়-জ্ঞান-যজ্ঞাশ্চ'—কাহারও নিকট দ্রব্যত্যাগই যজ্ঞ, কাহারও বা তপস্যা যজ্ঞ, কাহারও যোগ যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও জ্ঞানোপার্জ্জনই কাহারও নিকট যজ্ঞ। কেহ বা যাবতীয় ইন্দ্রিয়কে সংযমাগ্নিতে আহুতি দেন, কেহ বা রূপরসাদি ভোগ্য দ্রব্যকে ইন্দ্রিয়াগ্নিতে আহুতি দেন; আবার কেহ বা সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম্ম ও প্রাণকর্ম্মকে আত্মসংযম-যোগাগ্নিতে আহুতি দেন। ফলে কর্ম্মমাত্রই যজ্ঞ—ত্যাগাত্মক কর্ম্মমাত্রই যজ্ঞ; যজ্ঞ দেবতার উদ্দেশে সম্পাদিত যজ্ঞ। কে কাহার উদ্দেশে কোন্ দ্রব্য আহুতি দেয়? ইহার উত্তরে আঙ্গিরস-শিষ্য কৃষ্ণ গীতার মধ্যেই যজ্ঞতত্ত্বের চরম কথা বলিতেছেন—'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্, ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা'—এই জীবনযজ্ঞ ব্রহ্মকর্ম্ম, ব্রহ্মই এখানে যজমান বা ঋত্বিক্ সাজিয়া আহুতি দিতেছেন, ব্রহ্মই এখানে অগ্নি, ব্রহ্মই এখানে হোমদ্রব্য, ব্রহ্মই এখানে দেবতা; এই ব্রহ্মকর্ম্মসম্পাদনে ব্রহ্মলাভই ঘটে।"

"জীবনের কর্ম্মমাত্রই যজ্ঞ। যজ্ঞের মূল অর্থ ত্যাগ, ত্যাগের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই ভোগ কর্ত্তব্য—ইহাই হবিঃশেষভোজন, অতএব অমৃতভোজন; 'যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্'। জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মকে এই যজ্ঞরূপে দেখিলে জীবনটাই উচু হইয়া পড়ে—নীচের পরদা হইতে উঠিয়া অত্যন্ত উচু পরদায় উপনীত হয়; জীবনের অর্থ পর্য্যন্ত বদলাইয়া যায়। অতি প্রাচীন কাল হইতেই—বেদপন্থী সমাজে কর্ম্মকাণ্ড যখন অত্যন্ত জটিল ও যন্ত্রবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময় হইতেই—

এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। এখনও যে আমরা জীবনযজ্ঞের সেই তত্ত্বটি ধরিয়া আছি, তুই একটা দৃষ্টান্ত দিলে বুঝিতে পারিবেন।

"আপনারা গৃহস্থের নিত্যকর্ত্তব্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের কথা জানেন। মনুষ্য জন্মমাত্রেই কয়েকটা ঋণে বদ্ধ হইয়া জন্মে, ইহা মানবজন্ম-সম্বন্ধে অতি প্রাচীন থিয়োরি। 'জায়মানোবৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঃ ঋণবান্ জায়তে।' উত্তর কালে এই তিন ঋণ পাঁচ ঋণে দাঁড়াইয়াছে। দেবগণ মানুষের ভাগ্য-বিধাতা, পিতৃগণ তাঁহাকে মানবজন্ম দিয়াছেন; ঋষিগণ যে বিদ্যা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সেই বিদ্যায় তাঁহাকে উৎকৃষ্ট দ্বিতীয় জন্মের অধিকারী করিয়াছে; বন্ধু প্রতিবেশী হইতে সমাজের যাবতীয় ব্যক্তি তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে; পশু পক্ষী কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত কোন না কোনরূপে তাহার জীবনরক্ষা করিতেছে। অতএব ইহাদের সকলের নিকট ঋণ আছে। এই পাঁচটি ঋণ লইয়া মানুষকে জন্মিতে হয়। ঋণের বোঝা টানিয়া রাখিয়া জীবন যাত্রাটা দুষ্কর্ম্ম। জীবন ব্যাপিয়া এই ঋণ-শোধের চেষ্টা করিতে হইবে। এক একটা ঋণ-শোধের চেষ্টার অভ্যাস এক একটা যজ্ঞ। প্রত্যেক যজ্ঞেই কিছু না কিছু ত্যাগস্বীকার করিতে হয়। তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলিতেছেন, 'যদগ্নৌ জুহোতি অপি সমিধং, তৎ দেবযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে'— দেবতার উদ্দেশে আগুনে অন্ততঃ একখানা সমিৎ ফেলিয়া দিলেও দেবযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। 'যৎ পিতৃভ্যঃ স্বধা করোতি অপি অপঃ, তৎ পিতৃযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে'—পিতৃগণের উদ্দেশে অন্ততঃ এক গণ্ডূষ জল দিলেও পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। 'যদ্ ভূতেভ্যো বলিং হরতি, তদ্ ভূতযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে'— ভূতগণের অর্থাৎ পশুপক্ষীর উদ্দেশে কিঞ্চিৎ অন্ন দিলেই ভূতযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। 'যদ্ ব্রাহ্মণেভ্যো অন্নং দদাতি, তন্মনুষ্যযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে'—ব্রাহ্মণ অতিথিকে কিছু অন্ন দিলেই মনুষ্যযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। 'যৎ স্বাধ্যায়ং অধীয়ীত একামপি ঋচং, যজুঃ, সাম বা তদ্ ব্রহ্মযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে'—বেদাধ্যয়ন করিলে

অন্ততঃ একটি ঋক্, একটি যজুঃ বা একটি সাম অধ্যয়ন করিলে, ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। গৃহস্থের এই নিত্য যজ্ঞানুষ্ঠানে কোনরূপ জটিলতা নাই ; কার্য্যতঃ বেদপন্থী সমাজের অধিকাংশ গৃহস্থ অদ্যাপি এই পাঁচটি যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া থাকেন।"

"গৃহস্থমাত্রেরই এই যজ্ঞকয়টি কর্ত্তব্য কর্ম্ম। জগতে তিনি একাকী আসেন নাই, একা যাইবেন না, সমস্ত জগতের সহিত তাঁহার সম্পর্ক বাঁধা আছে, সমস্ত জগৎ যে একযোগে তাঁহাকে স্থিরপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, এইটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া জগতের যাবতীয় প্রাণীর নিকটে ঋণস্বীকারে তিনি বাধ্য আছেন, এবং প্রত্যহ কোন না কোন অনুষ্ঠান শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করিয়া, আমি যে ঋণী, এইটি সর্ব্বদা মনে রাখিতে বাধ্য আছেন। বস্তুতঃ এই ঋণ কেহই শুধিতে পারে না ; তবে এই ঋণটা স্বীকার না করিলে জগদ্ব্যবস্থার প্রতি, বিশ্বব্যাপারের প্রতি, ঔদ্ধত্য ও অবজ্ঞা দেখান হয়। মানব, বিশ্বব্যাপারকে তুমি প্রণাম কর ; এবং এই অভিপ্রায়ে প্রত্যহ কিছু না কিছু ত্যাগস্বীকার অভ্যাস কর। ব্যাপক অর্থে ত্যাগেরই নামান্তর যজ্ঞ। এ স্থলে সমস্ত জগৎটাই দেবতা। জগতে যাহা কিছু আছে, সবই দেবতা। প্রত্যেকের নিকট মানুষ ঋণী এবং সেই ঋণ স্বীকারার্থ প্রত্যেকের উদ্দেশে কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করিয়া যজ্ঞ করিতে হইবে। শাস্ত্রে এই পাঁচটি যজ্ঞকে মহাযজ্ঞ বলা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলেন, 'পঞ্চ বা এতে মহাযজ্ঞাঃ সততি প্রতায়ন্তে, সততি সন্তিষ্ঠন্তে'—এই পাঁচটি মহাযজ্ঞ সতত অর্থাৎ দিনে দিনে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, সতত অর্থাৎ দিনে দিনে সমাপ্ত করিতে হইবে। কৌতুক এই যে, ঋষিযজ্ঞকে সকল যজ্ঞের উপরে, এমন কি দেবযজ্ঞের উপরেও স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই ঋষিযজ্ঞ বেদাধ্যয়ন বা বিদ্যার্জ্জন ; ইহার নামান্তর ব্রহ্মযজ্ঞ। এই বিদ্যার যাঁহারা প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহারাই ঋষি,

তাঁহারাই বেদপন্থী সমাজের বিশিষ্ট culture-এর প্রতিষ্ঠাতা; ঐ সমাজের যাহা প্রাণ, তাহারই প্রতিষ্ঠাতা। তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলিতেছেন, 'সমাজের সেই আদিম প্রতিষ্ঠাতার তপস্যা করিলে স্বয়ং স্বয়ম্ভু তাঁহাদের সম্মুখে আসিলেন, এবং তাঁহাদিগকে ব্রহ্মযজ্ঞের উপদেশ দিলেন। তদবধি তাঁহারা ঋষি হইলেন।' বেদপন্থী সমাজের প্রত্যেক গৃহস্থ সেই ঋষিগণের নিকট হইতে সেই বেদবিদ্যাকে পাইয়াছেন, এবং তাহাকে রক্ষা করিতে বাধ্য আছেন। রক্ষার জন্য প্রত্যহ অধ্যয়ন আবশ্যক এবং এই অধ্যয়নই ব্রহ্মযজ্ঞ। যজ্ঞ-সম্পাদনে নানা সরঞ্জাম আবশ্যক, নানা অনুষ্ঠান আবশ্যক। শতপথ ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, 'এই যে ব্রহ্মযজ্ঞ, বাক্যই এই যজ্ঞের জুহূ, মন ইহার উপভৃৎ, চক্ষু ইহার ধ্রুবা, মেধা ইহার স্রুব, সত্যই ইহার অবভৃথ স্নান, স্বর্গলোক ইহার উদান বা সমাপ্তি। ঋগ্মন্ত্র এই যজ্ঞের ক্ষীরাহুতি, যজুর্মন্ত্র ইহার আজ্যাহুতি, সামমন্ত্র ইহার সোমাহুতি, অথর্বাঙ্গিরস মন্ত্র ইহার মেদাহুতি, পুরাণ-ইতিহাসাদি ইহার মধু আহুতি। জল চলিতেছে, আদিত্য চলিতেছেন, চন্দ্রমা চলিতেছেন, নক্ষত্রেরা চলিতেছে। ইহাদের গতিক্রিয়া ক্ষান্ত হইলে জগদ্‌যন্ত্রের যে অবস্থা হয়, গৃহস্থ যে দিন অধ্যয়ন না করেন, তাঁহার গৃহেরও সেই অবস্থা ঘটে।"

গ্রন্থকার যজ্ঞ-কথার শেষ ভাগে দেশমাতৃকার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"আপনারা পুরাণে ঋষিদিগের বহুবর্ষব্যাপী সত্রানুষ্ঠানের কথা শুনিয়াছেন। ভারতবর্ষের বেদপন্থী সমাজের ইতিহাসকে আমি একটা বহুসহস্রব্যাপী সত্রানুষ্ঠানের কাহিনী বলিয়া জানি। এই ধারণা আমার জীবনযাত্রার ধ্রুবতারা। ভারতবর্ষের যজ্ঞভূমি জুড়িয়া একটা প্রকাণ্ড চিতি নির্ম্মিত রহিয়াছে; বেদপন্থী সমাজের যাঁহারা প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহারা সেখানে বৈশ্বানর অগ্নির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—সেই অগ্নির প্রভায় অর্দ্ধপৃথিবী প্রভাম্বিত হইয়াছে। সিংহল হইতে সাইবিরিয়া পর্য্যন্ত, যবদ্বীপ হইতে আলেক-

আল্‌জিরিয়া পর্য্যন্ত, জাপান হইতে কাস্পীয় তটপর্য্যন্ত, অর্দ্ধপৃথিবী সেই অগ্নির প্রভায় প্রভান্বিত হইয়াছে। ভারতমাতা সেই যজ্ঞাগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়াছেন ;—মা আমার ভোগ্য অন্নরূপে বুভুক্ষিত পৃথিবীতে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন। বিশ্বভূতের জন্য আত্মোৎসর্গে মায়ের ব্যথা হয় নাই। বরং, যথেহ ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসতে—ক্ষুধার্ত্ত শিশু যেমন মাতার সমীপে উপস্থিত হয়,—সেইরূপ পৃথিবীর যে কেহ অন্নার্থী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছে, তিনি তাহাকে কোলে লইয়া স্নেহের সহিত স্তন্য দান করিয়াছেন। চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশবিদেশে বিতড়িছ অন্ন—স্থূল দেহের স্থূল অন্ন বিলাইয়া তিনি তৃপ্ত হন নাই, যখনই তিনি আপনার যজ্ঞভূমির বাহিরে গিয়াছেন, তখনই তিনি ইড়ারূপিণী ব্রহ্মবিদ্যার জ্ঞানান্ন লইয়া দেশবিদেশে বিচরণ করিয়াছেন। জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত করুণার ধারায় ধৌত করিবার জন্য বাহিরে গিয়াছেন। পৃথিবীতে ত্যাগের প্রতিষ্ঠার জন্য, নিবৃত্তির পথ দেখাইবার জন্য, তিনি আপনার পায়ে সংযমের শিকল পরাইয়া আপনাকে বদ্ধ করিয়াছেন ; পরপীড়নের আশঙ্কায় আপনার সন্তানদের পায়েও নিগড় পড়াইয়া বিদ্যালাভের বা লক্ষ্মীলাভের ব্যপদেশে পরদেশ আক্রমণ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। মা আমার স্বয়ং ইড়াদেবী—মনুকন্যা মানবীরূপে তিনি স্বয়ং মনুকর্ত্তৃক যজ্ঞার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, স্বরস্বতীরূপে তিনি ব্রহ্মবর্ত্তে বেদপন্থী সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভারতীরূপে তিনি ভারতবর্ষের কুলদেবতা, বাগ্‌দেবীরূপে তিনি ব্রহ্মরূপিণী। তিনি গায়ত্রীরূপে মর্ত্ত্যলোকে অমৃত আনিয়াছিলেন, সাবিত্রীরূপে আমাদের ধী-শক্তির অদ্যাপি প্রচোদনা করিতেছেন। অগ্নি-পত্নী স্বাহারূপে তিনি আমাদের জীবনযজ্ঞের যাবতীয় কর্ম্মকে আহুতিরূপে গ্রহণ করিতেছেন, ইন্দ্রপত্নী শচীরূপে তিনি সেই যজ্ঞক্রতুর পরিচালনা করিতেছেন। তিনিই দেবমাতা অদিতি—স্বয়ং প্রজাপতি দক্ষ তাহাকে

জন্ম দিয়াছেন। 'অদিতির্হি অজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব, তাং দেবা অন্বজায়ন্ত ভদ্রা অমৃতবন্ধবঃ'—অদিতিই দক্ষ প্রজাপতির দুহিতা হইয়া জন্মিয়াছিলেন ; সেই অদিতি হইতেই ভদ্র ও অমৃতবন্ধু দেবগণ জন্মিয়াছেন। তাঁহারই নামান্তর দক্ষকন্যা সতী—যিনি প্রজাপতির যজ্ঞে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন ; তাঁহার যজ্ঞোৎসৃষ্ট দেহ নারায়ণচক্রে শতখণ্ডে খণ্ডিত হইয়া কামরূপ হইতে হিঙ্গলাজ, জালন্ধর হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত ভারতভূমির দেহে পরিণত হইয়াছে। অশ্বক্রান্তা, রথক্রান্তা, বিষ্ণুক্রান্তা সেই ভূমি মহাবিষ্ণুর ত্রিপাদচ্ছায়ায় আক্রান্ত রহিয়াছে। ভারতভূমির প্রত্যেক ধূলিকণায় চক্রচ্ছিন্ন সতীদেহের বা হিমবৎকন্যা পার্ব্বতীর দেহের পরমাণু প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সেই ধূলি হইতে উৎপন্ন প্রত্যেক ধান্যশীর্ষে ও যবশীর্ষে ইড়ারূপ পরমান্নের অমৃতরস সঞ্চিত আছে। বিষ্ণুরূপী যজ্ঞপুরুষে অর্পণের পর, পঞ্চ মহাযজ্ঞে যাবতীয় ভূতে অর্পণের পর, হবিঃশেষরূপে ইড়াভোজনমাত্রে আমরা অধিকারী রহিয়াছি। এই সর্ব্বদেবময়ী মহতী দেবতাকে সম্বোধন করিয়া আমরা অকুতোভয়ে বলিতে পারি—

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাম্—
বন্দেমাতরম্।"

রামেন্দ্রসুন্দর কেবল বেদবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই ; তিনি তন্ত্রশাস্ত্রও চর্চ্চা করিয়াছিলেন। তিনি তন্ত্র সম্বন্ধে বড় বড় প্রবন্ধ লিখিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন ; কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। হাই কোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ উড্রফ্ সাহেব তন্ত্রশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং তাহার ফলে তিনি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট

গ্রন্থও প্রচার করিয়াছিলেন। শাস্ত্র আলোচনাকালে সাহেবের সহিত রামেন্দ্রসুন্দরের যথেষ্ট আলাপ হইয়াছিল। সাহেব উক্ত শাস্ত্রসম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্র লইয়া যে আলোচনা হইয়াছিল, আমরা তৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অবগত হইতে পারি নাই।

রামেন্দ্রসুন্দরের উত্তরাধিকারিগণ তাঁহার উত্তর কালের লিখিত প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়া "জগৎ-কথা" ও "নানাকথা" নামক দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গ্রন্থ দুইখানি এখন যন্ত্রস্থ।

বালকবালিকাগণের পাঠোপযোগী চারিখানি গ্রন্থ রামেন্দ্রসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন—নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণির বালকবালিকাগণের জন্য 'বিজ্ঞান পাঠ', এবং উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষার্থিগণের জন্য 'বিজ্ঞান-কথা'। ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর শিক্ষার্থী ছাত্রদিগের জন্য তিনি একখানি পদার্থবিদ্যা ও একখানি ভূগোল গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।

বারাণসীর ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের পণ্ডিতগণ রামেন্দ্রসুন্দরের স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও গভীর ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া এবং তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে একরূপ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ভাবিয়াই বিদ্যাসাগর অভিধানে ভূষিত করিয়াছিলেন। আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য সেই প্রতিষ্ঠাপত্রের অনুরূপ নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

॥ শ্রীঃ ॥

মহতস্তমসঃ পারে পুরুষং হ্যতিতেজসম্।
যং জ্ঞাত্বা মৃত্যুমত্যেতি তস্মৈ জ্ঞেয়াত্মনে নমঃ॥

বিদ্যামানপত্রম্

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এম, এ,

কলকত্তা

জ্ঞানস্য জননী বিদ্যা। অবিদ্যারূপং তমো যয়া নিরস্যতে সা বিদ্যা। পরমার্থিকং চ তস্যা বিদ্যায়াঃ স্বরূপং সংস্কৃতাং দেবগিরং দ্বারীকৃত্যৈব জগতি প্রাকাশ্যত। সাম্প্রতমধঃপতিতায়মার্য্যজাতৌ সদ্বিদ্যাং পুনঃ প্রচার্য্য জ্ঞানোদ্যমরাহিত্যাদিদোষজাতং চ দূরীকৃত্য যাবদস্যাং ধর্ম্মশক্তির্ন পুনরাবির্ভাব্যতে তাবদস্যা জীবনরক্ষাং কর্ত্তুং ন শক্যতে। আদি শিক্ষিতায়মাদি মননশীলায়মাদি বিজ্ঞানবিদি জগদ্গুরুত্বেনাভিমতায়ামার্য্যজাতৌ সদ্বিদ্যায়াঃ পুণর্বিকাশার্থং সনাতনধর্ম্মস্য পুনরভ্যুদয়সাধনপুরঃসরং জগৎ-কল্যাণকারিণ্যাঃ ধর্ম্মশক্তেরাবির্ভাবার্থং চ সকলধর্ম্মসভাধর্ম্মালয়ানাং সমষ্টিরূপায়াঃ শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলাখ্যায়া বিরাড্ ধর্ম্মসভায়াঃ স্থাপনমভূৎ।

অত্র যে কেচিৎ শ্রীসরস্বতীদেব্যাঃ কৃপাস্পদীভূতা বিদ্বাংসো বিদ্যোন্নতৌরতাস্তে সর্ব্বেঽপ্যস্যাঃ স্বজাতীয়বিরাডধর্ম্মসভায়াঃ প্রেমভাজনানীতি ভবতঃ বিবিধবিদ্যাযোগ্যতয়া প্রসন্নেয়ং স্বজাতীয়ধর্ম্মমহাসভা সদ্বিদ্যায়াঃ সম্মানবৃদ্ধ্যর্থং ভবন্তং বিদ্যাসাগরবিদ্যোপাধিরূপাঽলঙ্কারেণাঽলঙ্কৃত্য পরমং প্রমোদমশ্নুতে। সর্ব্বজ্ঞানময়স্য সর্ব্বশক্তিমতঃ পরমেশ্বরচরণকমলয়োঃ সবিনয়ং প্রার্থয়তে চ ভবত আধ্যাত্মিকুন্নতির্ভূয়াদিতি শম্।

শ্রীকাশীধাম্নি শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলপ্রধান- কার্য্যালয়ঃ—সপ্তমীতিথৌ কৃষ্ণে পক্ষে পৌষমাসে ১৯৭২ বর্ষে রামচন্দ্রনায়ককালিজ- প্রধানাধ্যক্ষঃ	স্বাক্ষর—রাবণেশ্বরপ্রসাদ সিংহ গিধৌরাধিপতি মহারাজ বাহাদুর কে, সি, আই, ই সভাপতিঃ শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলস্য ষষ্ঠমহাধিবেশনস্য

বঙ্গের বাণীপুত্রগণ প্রাণ খুলিয়া পরস্পর মিশিবার সুযোগ পাইবেন এই উদ্দেশ্যে কোন কোন সাহিত্যরথী সময়ে সময়ে পূর্ণিমা তিথিতে বঙ্গের সাহিত্যসেবীদিগকে আহ্বান করিয়া সন্ধ্যার সময় পূর্ণিমাসম্মিলনের

অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহাদের চিত্তরঞ্জনের জন্য হাসিতামাসা, গানবাজনা, নানাবিধ আমোদ-প্রমোদ ও অভিনয়াদি হইত। সাহিত্যসেবকগণ তথায় পরস্পর আলাপ করিবারও সুবিধা পাইতেন। কলিকাতার প্রায় সকল বিখ্যাত সাহিত্যসেবী-ই উহাতে যোগদান করিতেন। রামেন্দ্রসুন্দর ঐ সম্মিলনের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন; তিনি সাধ্যমত সকল পূর্ণিমাসম্মিলনে আনন্দের সহিত উপস্থিত হইতেন।

১৩১১ সালে চৈত্রপূর্ণিমায় ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের গৃহে প্রথম সম্মিলনের অধিবেশন হয়। তারপর মাধবী পূর্ণিমায় ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের ভবনে, জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় ফুলদোলের দিন ডাক্তার কৈলাশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাড়ীতে, আষাঢ়পূর্ণিমায় ৺দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আবাসে, রাখী পূর্ণিমায় ষ্টার রঙ্গমঞ্চে, ভাদ্রপূর্ণিমায় ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে, কোজাগরী পূর্ণিমায় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের গৃহে, রাস পূর্ণিমায় ৺দ্বিজেন্দ্রলালের গৃহে, হৈমন্তিকী পূর্ণিমায় ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীতে, পৌষপূর্ণিমায় ৺ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের গৃহে, মাঘী পূর্ণিমায় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের এবং দোলপূর্ণিমায় নন্দলাল দে মহাশয়ের গৃহে সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়।

রামেন্দ্রসুন্দর মাধবী পূর্ণিমা, জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা এবং কোজাগরী পূর্ণিমায় কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন না; পূজার ছুটি এবং গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে তাঁহার জেমোর বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন বলিয়া সম্মিলনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তদ্ব্যতীত সকল সম্মিলনেই তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর কেবল সাহিত্যসাধনা করিয়া জীবন অতিবাহিত করেন নাই, গণিত এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রও আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি কেবল গণিত জ্যোতিষ (Astronomy) শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, প্রাচীন ফলিত জ্যোতিষ বা হোরাবিজ্ঞান

(Astrology) সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাচীন কাল হইতে আমাদের দেশের লোক যে ফলিত জ্যোতিঃ শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে, তাহার মূলে কতখানি সত্য বিদ্যমান আছে তাহাই জানিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ ছিল। ব্রহ্মা, সূর্য্য, বেদব্যাস, বশিষ্ঠ, অত্রি, পরাশর, কশ্যপ, নারদ, গর্গ, মরীচি, মনু, অঙ্গিরা, লোমশ, পৌনিশ, ভৃগু, বৃহস্পতি, শৌনিক ও যবন এই অষ্টাদশ মুনি জ্যোতিষসংহিতার রচক। মুসলমানআমলে রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় অধিকাংশ গ্রন্থ বিনষ্ট হয়। পরাশর, ভৃগু ও নারদ মুনি প্রণীত কয়েকখানি সংহিতা, যবনজাতক ও তাজিক নামক দুইখানি জ্যোতিষগ্রন্থ এবং হায়নরত্ন ও নীলকণ্ঠতাজক নামক জ্যোতিঃশাস্ত্র বিষয়ক যে কয়খানি গ্রন্থ অধুনা প্রচলিত আছে, রামেন্দ্রসুন্দর সেইগুলি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

যে গণনাদ্বারা মানবজীবনে কোন্ সময়ে কিরূপ শুভাশুভ ঘটনা সংঘটিত হইবে জানিতে পারা যায়, তাহার নাম দশাফল-গণনা। জ্যোতিঃ শাস্ত্রে দশাফল-গণনা করিবার মোট বিয়াল্লিশ প্রকার নিয়ম প্রচলিত আছে; তন্মধ্যে অষ্টোত্তরী, ষোড়শোত্তরী, এবং বিংশোত্তরী এই ত্রিবিধ গণনাকৌশল সর্ব্বোত্তম এবং প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বলিয়া গৃহীত হয়। রামেন্দ্রসুন্দর ঐ তিন প্রকার পদ্ধতির আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, সর্ব্বত্র এক জাতীয় সমস্যাগুলি বিজ্ঞান-সম্মত একই নিয়মের অধীনে থাকিয়া একইরূপ ফল প্রদান করে না; অনেক স্থলে ফলাফলের গড়মিল ঘটে; সুতরাং বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে সমস্যাগুলির সমাধান করিলে, সিদ্ধান্তগুলি নির্ভুল প্রত্যক্ষফলপ্রদ বলিয়া গ্রহণ করিতে অনেক স্থলে সংশয় হয়। সেইজন্য প্রচলিত দশাফল-গণনাবিষয়ক বিধিগুলিকে তিনি নির্ভুল ও সম্পূর্ণ বিধি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই; এবং অসম্পূর্ণ শাস্ত্র আলোচনায় সময়ক্ষেপ

না করিয়া তিনি একরূপ হতাশ ভাবেই উক্ত শাস্ত্রের আলোচনা হইতে বিরত হন।

কলিকাতার বৌবাজারনিবাসী ৺হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রামেন্দ্রসুন্দরের সতীর্থ ছিলেন। তিনি এক কালে ফলিত জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। বোম্বাই, কাশ্মীর প্রভৃতি দূরদেশ হইতে ফলিত জ্যোতিষসম্বন্ধে অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি দীর্ঘকাল উহার আলোচনা করেন, এবং একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তাঁহার ক্ষুদ্র বাসভবনটি ভাগ্যফলশুশ্রূষু নানাজাতীয় লোকে সর্ব্বদা পূর্ণ থাকিত। বহু বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মারোয়ারী, গুজরাটী, পারসী, ইহুদী, আর্ম্মেণী, চীনা, ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি নানাজাতীয় লোক ভাগ্যফল জানিবার আশায় প্রতিদিন তাঁহার দ্বারস্থ হইত। হরিমোহন তাঁহার বিদ্যাকে ব্যবসায়ে পরিণত করেন নাই; বিদ্যালাভ করা তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, অন্য উদ্দেশ্য ছিল না।

হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বন্ধু রামেন্দ্রসুন্দরের বাড়ীতে প্রায় যাতায়াত করিতেন। তথায় ফলিত জ্যোতিষসম্বন্ধে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা চলিত। তিনি যখন যে সকল দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিতেন, তাহা রামেন্দ্রসুন্দরের নিকট লইয়া যাইতেন। রামেন্দ্রসুন্দর নূতন তথ্য অবগত হইবার বাসনায় অভিনিবেশসহকারে গ্রন্থগুলি পাঠ করিতেন। শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পর একদিন মনে পড়ে, রামেন্দ্রসুন্দর ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে নিজের অভিমত বন্ধুসমীপে ব্যক্ত করেন। বন্ধু হরিমোহন তাঁহার যুক্তি ও কথাগুলির ভাব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না; কিন্তু তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার সহিত একমত হইতে পারেন নাই। কোন কোন বিষয়ে নিজের বিরুদ্ধ মতও প্রকাশ করিয়াছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার সহিত আর কোনরূপ তর্কবিতর্ক না

করিয়া বলিয়াছিলেন—"তুমি ভালরূপে প্রবেশ কর, তারপর বুঝিতে পারিবে।"

ঐ ঘটনার প্রায় দশ বৎসর পরে এক দিন হরিমোহন রামেন্দ্রসুন্দরের নিকট উপস্থিত হইয়া ফলিত জ্যোতিঃশাস্ত্রসংক্রান্ত প্রসঙ্গের অবতারণা করেন, এবং বড় দুঃখের সহিত বলেন, "আমি অনেক পরিশ্রম করিয়াছি, কিন্তু আশানুরূপ ফললাভ করি নাই ; অন্য বিদ্যা উপার্জ্জনে মনোনিবেশ করিলে বোধ হয় এমন সংশয়ে পড়িতে হইত না।" রামেন্দ্রসুন্দর তাহা শুনিয়া মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিলেন—"এতদিনে প্রবেশ করিয়াছ এবং বুঝিতে পারিয়াছ ইহাই যথেষ্ট ; আমি অনেক দিন পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম, কাজেই নিরস্ত হইয়াছি। তোমার আক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই ; শাস্ত্র সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ হউক, জ্ঞানলাভ করিবার প্রয়োজন সবেতেই আছে। এতকাল ধরিয়া লোকে যে শাস্ত্রের প্রতি মর্য্যাদা করিয়া আসিতেছে, নিশ্চয় তাহা কোন কালে সম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। একেবারে টানিয়া ফেলিয়া দিলে চলিবে না। ভবিষ্যতে কোন মহাপুরুষ উহার সম্পূর্ণতা সাধন করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু উহা আমার অধিকার বহির্ভূত কার্য্য বলিয়া নিরস্ত হইয়াছি। বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনায় পদে পদে মতপরিবর্ত্তন ঘটে বলিয়া ঐ শাস্ত্রের প্রতি কাহার শ্রদ্ধাহীন হওয়া উচিত নহে। পুনঃ পুনঃ মতপরিবর্ত্তন দেখিয়া অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি বিজ্ঞানকে উপহাস করিয়া থাকেন ; কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, বিজ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের এই খানেই প্রভেদ। বিজ্ঞান দিন দিন আপনাকে সংশোধিত ও উন্নত করিয়া থাকে, কিন্তু অজ্ঞানের মূর্ত্তি চিরকালই একরূপ ; তথায় কোনরূপ বিকারের সম্ভাবনা নাই। আলোকেরই নীল, পীত, হরিৎ উজ্জল ও তীব্র ইত্যাদি বিবিধ বিশেষণ আছে, কিন্তু অন্ধকার চিরকালই আঁধার, তাহার অন্য বিশেষণ নাই। তোমার ঐরূপ আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তির উদ্বোধনই

এখন প্রয়োজন। আমাদের অলস, জড় ও লুপ্ত চিত্তবৃত্তিসকলকে জাগাইয়া তুলিতে ঐরূপ আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তির উদ্বোধনই এখন প্রয়োজন।”

ফলিত জ্যোতিষে যাঁহারা বিশ্বাস করেন, কিংবা না করেন, তাঁহাদের উভয় দলকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন—“এই বিষয় লইয়া বিশ্বাস-কারী ও অবিশ্বাসকারী উভয় দলের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল হইতে বিবাদ চলিয়া আসিতেছে, তাহার মীমাংসা আজ পর্য্যন্ত হইল না; ফলিত জ্যোতিষে যাঁহারা বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা প্রতিপক্ষকে বলিয়া থাকেন, মহাশয়গণ ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন; আপনারা যে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে আপনাদের তৃপ্তি হইয়াছে; আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই প্রমাণগুলি আমাদের নিকট উপস্থিত করুন, আমাদের তৃপ্তি জন্মে বিশ্বাস করিব, নতুবা করিব না। আপনাদের সংগৃহীত প্রমাণে যদি আমাদের তৃপ্তি না জন্মে, তজ্জন্য আমাদিগকে নির্ব্বোধ বা ভাগ্যহীন মনে করিতে পারেন, কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া গালি দিবেন না; কেন না এই শেষোক্ত অধিকার আপনাদেরও যেমন আছে, আমাদেরও তেমনি আছে। পাল্‌টা গালি দিতে আমাদিগকে বাধ্য করিবেন না।

“একালে যাঁহারা বিজ্ঞানবিদ্যার আলোচনা করেন, তাঁহাদের একটা ভয়ানক দুর্নাম আছে যে, তাঁহারা ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন না। এজন্য যথেষ্ট তিরস্কারভাগী হইয়া থাকেন। সম্যক্ প্রমাণ পাইয়াও তাঁহারা যদি তৃপ্ত না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে গালি দিলে বিশেষ পরিতাপের হেতু ঘটিত না; কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, যাঁহারা গালি দিবার সময় অত্যন্ত পরিশ্রম করেন, প্রমাণ উপস্থিত করিবার সময় তাঁহাদিগকে একেবারে নিশ্চেষ্ট দেখা যায়, এবং যখনই তাঁহাদিগকে প্রমাণ আনিতে বলা হয়, তখনই তাঁহারা প্রমাণের বদলে তত্ত্বকথা ও নীতিকথা শোনাইতে প্রবৃত্ত হন।

"তাঁহারা তর্ক করিতে বসিবেন, রামচন্দ্র খাঁয়ের পুত্রের জন্মকালে বুধগ্রহ যখন কর্কটরাশিতে প্রবেশ করিয়াছে, তখন সেই পুত্র ভাবী কালে ফিলিপাইন পুঞ্জের রাজা হইবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কথা কি? ইহা অসম্ভব কিরূপে? বিশেষতঃ যখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যহ সূর্য্যোদয় হইবামাত্র পাখীসব রব করিতে থাকে, কাননে কুসুমকলি ফুটিয়া উঠে, এবং গোপাল গরুর পাল লইয়া মাঠে যায়। আমরা বৎসর বৎসর দেখিয়া আসিতেছি যে, সূর্য্যদেব বিষুবসংক্রমণ করিবামাত্র দিনরাত্রি অমনি সমান হইয়া যায়; তখন শনিশুক্রসঙ্গম ঘটিলে সাইবিরিয়াতে ভূমিকম্প ঘটিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? আবার চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে, ইহা যখন কবি কালিদাস হইতে বৈজ্ঞানিক কেলবিন পর্য্যন্ত সকলেই নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিয়াছেন, তখন সেই চন্দ্র বৃহস্পতির সমীপস্থ হইলে লুই নেপোলিয়নের দৌহিত্রের শিরঃপীড়া কেন না ঘটিবে? একটা যদি সম্ভব হয়, আর একটা অসম্ভব কিসে হইল? স্বর্গে মর্ত্তে এমন কত কি আছে, যাহা মানবের জ্ঞানাতীত।

"বিজ্ঞানবিস্থার আলোচকগণ যে তাহা না জানেন, এমনও নয়। * * * ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পৃথিবীরই সকল সংবাদ যখন অদ্যাপি জ্ঞানগোচর হইল না, পরন্তু নিত্য নূতন ঘটনা মনুষ্যের বিজ্ঞানবিস্থাকে এক একটা ধাক্কা দিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিতেছে, তখন এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথায় কি সম্ভব কি অসম্ভব, তাহার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে যাওয়া বাতুলতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তোমাদের বিজ্ঞানই বলে ঐ সূর্য্যটার আয়তন বার লক্ষ পৃথিবীর সমান, ঐ নক্ষত্র হইতে আলোক আসিতে বার বৎসর পনর দিন সময় লাগে, আলো আবার সেকেণ্ডে নয় লক্ষ ক্রোশ বেগে চলে ইত্যাদি। ইতরের পক্ষে ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন কঠিন। এত বড় ব্রহ্মাণ্ডটার সম্বন্ধে এটা সম্ভব ওটা অসম্ভব, এরূপ

চূড়ান্ত নিষ্পত্তি বালকের পক্ষেই শোভা পায়, বিজ্ঞানবাদীদের পক্ষে নহে।

"লোকে বলে বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির নিয়মের যে ব্যভিচার ব্যতিক্রম বা লঙ্ঘন হইতে পারে, ইহা তিনি বিশ্বাস করেন না। কিন্তু ইহা মিথ্যা কথা। এ পর্য্যন্ত আমি একখানি খাঁটি গ্রন্থ দেখি নাই, যাহাতে প্রতিপন্ন করা হইতেছে, কাঁঠাল ফল বৃন্তচ্যুত হইলে ভূমিতে পড়িতে বাধ্য, অথবা সূর্য্যদেব পৃথিবীকে চতুষ্পার্শ্বে ঘুরাইতে বাধ্য। বস্তুতঃ জগতে এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নাই। এ পর্য্যন্ত কাঁঠাল বৃন্তচ্যুত হইলেই ভূমিতে পড়িয়া আসিতেছে, কাহারও ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরে নির্ভর করে নাই; তাই পদার্থবিদ্যাবিদেরা বলেন, কাঁঠাল ফলের ঐরূপ স্বভাব, সে ভূমিতে পড়ে, আকাশে উঠে না; এতকাল তাহাই করিতেছে সম্ভবতঃ কাল পরশুও তাহাই করিবে। কিন্তু কাল হইতে যদি কাঁঠাল ফল আর ভূমিতে পতন অনুচিত ভাবিয়া আকাশে আরোহণই কর্ত্তব্য বিবেচনা করে, সমস্ত বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী নিতান্ত নির্ব্বিকার চিত্তে আপন আপন খাতার মধ্যে তখন লিখিতে থাকিবেন, কাঁঠাল ফলের স্বভাবের অমুক দিন হইতে পরিবর্ত্তন হইয়াছে,—অমুক তারিখ পর্য্যন্ত সে ভূমিতে পড়িত, এখন সে আকাশে উঠে। এবং কাঁঠালের দেখাদেখি সকল দ্রব্যই যদি সেই পন্থা অবলম্বন করে, তাহা হইলে পদার্থবিদ্যা গ্রন্থগুলির ভবিষ্যৎ সংস্করণে দেখা যাইবে, পৃথিবী এখন আর আকর্ষণ করেন না, দূরে ঠেলেন। প্রকৃতির নিয়মটা যদি বদলাইয়া যায়, কেন বদলাইল, তাহা প্রকৃতি দেবীই বলিতে পারেন, বৈজ্ঞানিকের তজ্জন্য মাথাব্যথার কোনই প্রয়োজন হয় না, এবং প্রকৃতির নিকট তাহার কৈফিয়ৎ চাহিবার উপায় নাই।

"ফলতঃ আমকাঁঠালের ভূতলপাতে সর্ব্বসাধারণের প্রচুর স্বার্থ আছে, বিশেষতঃ ঐ ঐ দ্রব্য যখন সুপক্ক অবস্থায় থাকে; কিন্তু বৈজ্ঞানিকের

তাহাতে বিশেষ স্বার্থ কিছু নাই। দলিলের ভিতর যাহাই থাকুক, রেজিষ্ট্রার বাবু তাহা রেজিষ্টারি করিয়া যান, দাতা ও গ্রহীতার অভিসন্ধি জানা তাঁহার আবশ্যক হয় না; বৈজ্ঞানিক সেইরূপ প্রাকৃতিক ঘটনা শুনিলে কেবল রেজিষ্টারি করিয়া যান; ঘটনাটা এমন কেন হইল, তাহা ভাবিয়া দেখা তাঁহার পক্ষে আবশ্যক হয় না। অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত এমন কোন বিজ্ঞানবিদের নাম শুনি নাই, যিনি কোন প্রাকৃতিক ঘটনার মূল কারণ অনুসন্ধানে সমর্থ হইয়াছেন বা তজ্জন্য বিশেষ প্রয়াসের প্রয়োজন দেখিয়াছেন।

"তবে কোন একটা ঘটনার খবর পাইলে সেই খবরটা প্রকৃত কি না, তাহা রেজিষ্টারির পূর্ব্বে জানিবার অধিকার বিজ্ঞানবিদের প্রচুর পরিমাণে আছে। সেই অনুসন্ধানকর্ম্মই বোধ করি তাঁহার প্রধান কার্য্য। প্রকৃত তথ্যের জন্য তাঁহাকে প্রচুর পরিশ্রম করিতে হয়। বরং তজ্জন্য তাঁহার বুদ্ধি নানা সংশয়ের উদ্ভাবন ও সেই সংশয় অপনোদের বিবিধ উপায় আবিষ্কার করে। আমাদের মত অবৈজ্ঞানিকের সহিত বিজ্ঞানবিদের এইখানে পার্থক্য।

"ফলিত জ্যোতিষে যাঁহারা অবিশ্বাসী, তাঁহাদের সংশয়ের মূল কারণ এই, তাঁহারা যতটুকু প্রমাণ চান, ততটুকু তাঁহারা পান না। তার বদলে বিস্তর কুযুক্তি। কালকার ঝড়ে আমবাগানের কাঁঠাল গাছ ভাঙ্গিয়াছে, অতএব হরিচরণের কলেরা কেন না হইবে, এরূপ যুক্তির অবতারণায় বিশেষ লাভ নাই। গ্রহগুলা কি অকারণে এ রাশি ও রাশি ছুটিয়া বেড়াইতেছে, যদি উহাদের গতিবিধির সহিত আমার শুভাশুভের কোন সম্পর্কই না থাকিবে, এরূপ যুক্তিও কুযুক্তি। নেপোলিয়নের ও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কোষ্ঠী ছাপানর পরিশ্রমও অনাবশ্যক। একটা ঘটনা গণনার সহিত মিলিলেই দুন্দুভি বাজাইব, আর সহস্র গণনায় যাহা না

মিলিবে, তাহা চাপিয়া যাইব, অথবা গণক ঠাকুরের অজ্ঞতার দোহাই দিয়া উড়াইয়া দিব, এরূপ ব্যবসায়ও প্রশংসনীয় নহে।

"একটা সোজা কথা বলি। ফলিত জ্যোতিষকে যাঁহারা বিজ্ঞান বিদ্যার পদে উন্নীত করিতে চাহেন, তাঁহারা এইরূপ করুন। প্রথমে তাঁহাদের প্রতিপাদ্য নিয়মটা খুলিয়া বলুন। মানুষের জন্মকালে গ্রহ নক্ষত্রের স্থিতি দেখিয়া মানুষের ভবিষ্যৎ কোন্ নিয়মে গণনা হইতেছে, তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলিতে হইবে। কোন্ গ্রহ কোথায় থাকিলে কি ফল হইবে, তাহা খোলসা করিয়া বলিতে হইবে। বলিবার ভাষা যেন স্পষ্ট হয়—ধরি মাছ না ছুঁই পানি হইলে চলিবে না। তার পর হাজার খানেক শিশুর জন্মকাল ঘড়ি ধরিয়া দেখিয়া প্রকাশ করিতে হইবে; এবং পূর্ব্বের প্রদত্ত নিয়ম অনুসারে গণনা করিয়া তাহার ফলাফল স্পষ্ট ভাষায় নির্দ্দেশ করিতে হইবে। শিশুদের নামধাম পরিচয় স্পষ্ট দেওয়া চায়, যেন যাহার ইচ্ছা সে পরীক্ষা করিয়া জন্মকালসম্বন্ধে সংশয় নাশ করিতে পারে। গণনার নিয়ম পূর্ব্ব হইতে বলা থাকিলে যে কোন ব্যক্তি গণনা করিয়া কোষ্ঠীর বিশুদ্ধি পরীক্ষা করিতে পারিবে। যতদূর জানি, এই গণনায় পাটীগণিতের অধিক বিদ্যা আবশ্যক হয় না। পূর্ব্বে প্রচারিত ফলাফলের সহিত প্রত্যক্ষ ফলাফল মিলিয়া গেলেই ঘোর অবিশ্বাসীও ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসে বাধ্য হইবে; যতটুকু মিলিবে ততটুকু বাধ্য হইবে। হাজারখানা কোষ্ঠীর মধ্যে যদি নয় শত মিলিয়া যায়, মনে করিতে হইবে ফলিত জ্যোতিষে অবশ্য কিছু আছে; যদি পঞ্চাশখানা মাত্র মেলে, মনে করিতে হইবে, তেমন কিছু নাই। হাজারের স্থানে যদি লক্ষটা মিলাইতে পার, আরও ভাল। বৈজ্ঞানিকেরা সহস্র পরীক্ষাগারে ও মানমন্দিরে যে রীতিতে ফলাফল গণনা ও প্রকাশ করিতেছেন, সেই রীতি আশ্রয় করিতে হইবে। কেবল নেপোলিয়ন ও বিদ্যাসাগরের কোষ্ঠী বাহির

করিলে অবিশ্বাসীর বিশ্বাস জন্মিবে না। চন্দ্রের আকর্ষণে গঙ্গার জোয়ার হয়, তবে রামকান্তের জজিয়তি কেন হইবে না, এরূপ যুক্তিও চলিবে না।”

রামেন্দ্রসুন্দরের দেহের স্বাস্থ্য নষ্ট হইলেও তাঁহার মনের স্বাস্থ্য শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। রোগজীর্ণ দেহ লইয়া তিনি কখন কর্ম্মসাধনে উদ্যমহীন হন নাই। মানবের জীবনসন্ধ্যায় যখন তাহার কর্ম্মসাধনের ক্ষমতা লোপ পায়, তদবস্থায় উপনীত হইয়াও তিনি সাধারণের গোচরীভূত করিবার অভিপ্রায়ে সরল বাঙ্গালা ভাষায় বৈদিক তথ্য সঙ্কলন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অতীব দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি আরব্ধ কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিখানি দেখিলে মনে হয় তাহাতে একখানিমাত্র গ্রন্থ সম্পাদিত হইতে পারে। গ্রন্থকারের উত্তরাধিকারিগণের ভবিষ্যতে গ্রন্থখানি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শিক্ষাসংস্কারে

প্রাচীন কালে আমাদের দেশের লোক অর্থোপার্জ্জনের আশায় বিদ্যার চর্চ্চা করিত না। তৎকালে জ্ঞানলাভই বিদ্যাচর্চ্চার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। শত বর্ষ পূর্ব্বে আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষা কেবল উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; ব্যাপক ভাবে সাধারণ লোকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ বা অবসর পাইত না। বিদ্যা অর্থকরী না হইলে তাহার প্রসার বৃদ্ধি হয় না। তৎকালে বিদ্যা অর্থকরী ছিল না বলিয়া উচ্চ বর্ণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকই উচ্চ বিদ্যালাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিত।

ইংরাজরাজ সমগ্র ভারতবর্ষকে করতলগত করিয়া এই প্রকাণ্ড দেশটাকে আয়ত্ত রাখিবার জন্য উন্নততর শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তন করিবার বাসনা করিলেন। সেই শাসন-যন্ত্র পরিচালন করিবার জন্য তাঁহারা এতদ্দেশে শিক্ষিত রাজকর্ম্মচারীর অভাব অনুভব করিলেন, এবং সেই অসুবিধা দূরীকরণমানসে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভারতবাসীকে উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে এদেশে ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময়ে সিদ্ধান্ত হয়, প্রাচ্য দেশের বীণাপুস্তকধারিণী শতদলবাসিনী বাগ্‌দেবীকে ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসন দিয়া ঈজি চেয়ার-শায়িনী গাউনবুটপরিহিতা পাউডারপরিলিপ্তা বিলাতী সরস্বতীকে এদেশে আমদানী করিতে হইবে। প্রাচীন কল্পনাপ্রধান প্রাচ্য বিদ্যাকে বিসর্জ্জন দিয়া, তাহার স্থানে বিজ্ঞানপ্রধান প্রতীচ্য বিদ্যাকে স্থাপিত

করিতে হইবে। লর্ড মেকলের ন্যায় ইংরাজ পুরুষেরা মোহোৎপাদিনী ভাষায় প্রতীচ্য শিক্ষানীতির সমর্থন করিয়াছিলেন; এবং কবে সেই শুভদিন আসিবে, যখন প্রাচ্য বর্ব্বরগণ প্রতীচ্য শিক্ষার সহিত প্রতীচ্য সভ্যতা লাভ করিয়া প্রতীচ্য রাজনৈতিক অধিকারলাভের জন্য লালায়িত হইবে, সেই সুখস্বপ্নের আশায় তাঁহারা পুলকিত হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের রাজধানীতে ইংরাজপরিচালিত ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। ইংরাজ অধ্যাপকের পদপ্রান্তে বসিয়া বঙ্গীয় যুবকগণ বেকনের Essay ও মিলটনের Areopagitica অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, আরিষ্টটলের সমাজনীতি ও হবসের রাজনীতিসম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন, Paleyর Evidence ও Reid এর মনস্তত্ব হইতে নূতন তত্ব সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, বার্কের অনুকরণে প্রকাশ্য সভায় রাজনৈতিক বক্তৃতায় গলা সাধিতে আরম্ভ করিলেন। হিন্দু কলেজ হইতে প্রতীচ্য সভ্যতার ধ্বজা ধরিয়া যে সকল মহারথিগণ বহির্গত হইলেন, তাঁহাদের আস্ফালনে ভূমিকম্পের সূচনা হইল। বাঙ্গালীর ক্ষীণবল জাতীয় জীবনে এমন উৎসাহের আবেগ পূর্ব্বে আর কখনও বুঝি দেখা যায় নাই। বহুকাল পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে সুগ্রীবপরিচালিত সেনা স্বর্ণলঙ্কার বেলাভূমিতে পদার্পণ করিয়া যে মহোৎসাহ দেখাইয়াছিল, বোধ হয়, তাহারই সহিত এই নবীন উৎসাহের কতকটা তুলনা হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে সীতার উদ্ধারবিষয়ে সংশয় সকলের মন হইতে গিয়াছিল কিনা, জানি না; কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে হিন্দুয়ানিরূপ বিকট দশাননের কবল হইতে ভারতমাতার উদ্ধার যে অবিলম্বেই সাধিত হইবে, সে বিষয়ে কাহারও দ্বিধা রহিল না। কিছুদিন মধ্যেই ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল; নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল; প্রতীচ্য শিক্ষা ও প্রতীচ্য

সভ্যতার আলোক নিভৃত পল্লীমধ্যেও কুসংস্কারের অন্ধকার দূরীকরণে প্রবৃত্ত হইল; ইংরাজী লেখকে ও ইংরাজী বুলিতে অচির কাল মধ্যেই "ছাইল সকল ঘাটবাট"। স্থির হইয়া গেল, ভারতের মুখচন্দ্রমার মালিন্য অচিরেই অপসৃত হইবে।

প্রথমতঃ উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পক্ষে উচ্চতর বেতনে রাজপদ প্রাপ্তি সুলভ হইয়া উঠিল। তাঁহারা রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন, এবং স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতে লাগিলেন। ইংরাজের শাসনগুণে জীবনযাত্রা দিন দিন কঠিনতর হইয়া উঠিতে লাগিল। সম্মুখে প্রলোভনের পথ উন্মুক্ত দেখিয়া দলে দলে লোক সেই পথে ধাবিত হইতে লাগিল।

কিন্তু হায় চল্লিশ বৎসর গত না হইতেই ইংরাজের চাকরী ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল, এবং উচ্চ শিক্ষাও দিন দিন বহুব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িল। এ দেশের লোক কিন্তু আশা ছাড়িতে পারিল না, তাহারা ঘটি, বাটি, যথাসর্ব্বস্ব বন্ধক দিয়াও ভবিষ্যতের অনির্দ্দিষ্ট আশায় বহ্নিমুখ পতঙ্গের ন্যায় অনলের মুখে দলে দলে আত্মাহুতি দিবার জন্য ছুটিয়া চলিতেছে। আশাহত দেশবাসিগণের চক্ষু ফুটিয়াও ফুটিতেছে না।

ফলতঃ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বিশ্বজগৎ ভারত উদ্ধারের জন্য যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখের প্রতি চাহিয়াছিল, এখন এক রকম সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে, সেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মত অকর্ম্মণ্য, মনুষ্য-সম্প্রদায় আর কোথাও নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী, যাহা এ পর্য্যন্ত এদেশে প্রচলিত ছিল, তাহা আর কোন সুফল প্রসব করিতে পারিবে না; ইহা এক রকম নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। বড় বড় রাজপুরুষ তাঁহাদের উচ্চ আসন হইতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি ভ্রূভঙ্গী করিতেছেন। ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি ও

শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি নিয়ত হলাহল উদ্গীরণ করিতেছেন। কেহ বলেন, ইহারা মিল আর বার্ক পড়িয়া রাজনীতির ঝঙ্কার দিতে শিখিয়াছে মাত্র; কেহ বলেন, ইহারা ইতিহাস পড়িয়া কেবল রাজদ্রোহ শিক্ষা করিতেছে।

প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায় এখন কতকটা ধরার ভার স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের অস্তিত্বের আবশ্যকতা নিতান্ত প্রমাণ সাপেক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। কেন এইরূপ হইল? ইহার উত্তরে অনেকে বলেন, ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সময়ে প্রাচ্য শিক্ষার বিরুদ্ধে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল, ইংরাজী শিক্ষাপ্রণালীর বিরুদ্ধেও অধুনা সেই যুক্তি প্রযুক্ত হইতেছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়টা কিছুদিন পূর্ব্বে নিতান্ত লিটারারি ছিল, কেরাণীগড়া বিদ্যা ভিন্ন হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ইহাতে কিছু ছিল না; পরবর্ত্তী কালে হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার উন্নততর ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়াও আশানুরূপ ফললাভ হইল না দেখিয়া এদেশবাসীর মস্তিষ্কের নিতান্ত অভাব, এইরূপ একটা দোষ দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহিলে চলিবে না। যে দেশে জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রশীল ও রামেন্দ্রসুন্দরের ন্যায় প্রতিভাবান্ মনীষিগণের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, সে দেশের লোক মস্তিষ্ক বিহীন এইরূপ কল্পনা কেবল কষ্টকল্পনা। বীজ এবং কৃষাণ সংগ্রহ করিতে পারিলেই উৎকৃষ্ট শস্য জন্মেনা; শস্য উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত উর্ব্বর ক্ষেত্রেরও আবশ্যক। অভিজ্ঞ কৃষাণ প্রস্তুত করিয়া ছাড়িয়া দিলে কি হইবে? কৃষাণ যতই উপযুক্ত হউক না কেন, ক্ষেত্র না থাকিলে তাহাদ্বারা কিরূপে শস্য পাইবার আশা করা যায়? রাজা এবং ধনী লোকের সাহায্য ব্যতীত কোন দেশই এ বিষয়ে কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং প্রতীচ্য উচ্চ শিক্ষা প্রতীচ্য স্বাধীন

দেশসমূহে যেরূপ সুফল প্রসব করিয়াছে, আমাদের এই পরাধীন দেশে স্বাধীন দেশের অনুকরণে সেরূপ সুফল প্রসব করিতে পারে না।

ফলে আমরা এতদিন যে পথ অবলম্বন করিয়া চলিতেছিলাম, সে পথ যেন ঠিক্ পথ নহে; এখন কোন্ নূতন পথ আমাদের অবলম্বনীয়, তাহার নির্ণয়ই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পথভ্রান্ত পথিক যেমন দিশাহারা হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে, আকাশের ধ্রুব তারাও তখন তাহার সংশয়াকুল চিত্তে বিশ্বাস স্থাপনে সমর্থ হয় না। আমরাও সেইরূপ দিশাহারা হইয়া গন্তব্য পথনির্ণয়ে অসমর্থ ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। কোন্ অনির্দ্দেশ্য স্থান হইতে কাল মেঘ আসিয়া আমাদের সেই ক্ষীণপ্রভ ধ্রুবতারাটিকেও ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য দুই প্রকার—জ্ঞান, ধর্ম্ম এবং নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন। শিক্ষালব্ধ জ্ঞান এবং নৈতিক উন্নতিদ্বারা লোকসমাজকে উন্নতির পথে পরিচালিত করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। প্রাচীন কালে আমাদের দেশে উহাই উচ্চ বিদ্যাশিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এবং বিদ্যাশিক্ষাদ্বারা কৃষিবাণিজ্য ও শিল্প প্রভৃতির উন্নতিসাধন করিয়া দেশের দারিদ্র্য দূর করাটা গৌণ উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই কঠিন জীবন সংগ্রামের দিনে গৌণ উদ্দেশ্যটা মুখ্য উদ্দেশ্যে পরিণত হইয়াছে। জ্ঞান, ধর্ম্ম এবং নীতি শিক্ষার অভাবে সমাজদেহে নানাবিধ ব্যাধির উৎপত্তি ঘটিতেছে, সেই ব্যাধির নিরাকরণের জন্য কোন ব্যবস্থারও উদ্যোগ হইতেছে না; ফলতঃ বর্ত্তমান প্রণালীর প্রতীচ্য শিক্ষা আমাদের জাতীয় উন্নতি-কল্পে কোন কাজেই লাগিতেছে না।

অনেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই জন্য ভাবিয়া চিন্তিয়া উপদেশ দেন নীতি-পুস্তকের সংখ্যা পাঠ্যমধ্যে বাড়াইয়া দিলেই ছাত্রগণের নৈতিক উন্নতি হইবে। গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগ হুজুকে পড়িয়া নিয়ম করি,

লেন ছাত্রগণের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে অন্ততঃ এত পাতা নীতি-কথা থাকা চায়। গ্রন্থপাঠ করিয়া সন্নীতির উৎকর্ষবিধানের যাঁহারা আশা করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভেলা বাহিয়া সাগরসন্তরণে প্রবৃত্ত হন। রামেন্দ্রসুন্দর বলিয়াছেন, "শিক্ষকের কেবল নীতিসম্বন্ধে লেকচার দিলে চলিবে না; তাঁহাকে আপন গৃহস্বরূপ ও সমাজস্বরূপ লাবরেটরিতে দাঁড়াইয়া সন্নীতির দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে। ছাত্রেরা সেই দৃষ্টান্ত দেখিবে ও তাহার ফলভোগ করিবে; শিক্ষক স্বয়ং ভাল কাজ করিয়া তজ্জাত আনন্দ উপভোগ করিবেন ও ছাত্রদের দ্বারা ভাল কাজ করাইয়া তাহাদিগকে তাহার আনন্দ উপভোগ করাইবেন। শিক্ষক স্বয়ং মিথ্যাচার ও অসদাচার হইতে দূরবর্ত্তী থাকিবেন, ও আপনার ছাত্রগণকে মিথ্যাচার ও অসদাচার হইতে দূরে রাখিবেন; পরন্তু সহানুভূতির ও স্নেহের ও প্রীতির বন্ধনে ছাত্রদিগকে আবদ্ধ রাখিয়া বেত্রের শাসন ও জরিমানার শাসন ও Percentageএর শাসন অপেক্ষা এই বন্ধন যে কত অধিক ফলদায়ক, তাহা ছাত্রদিগকে আত্মজীবনে অনুভব করিবার শক্তি দিবেন। শিক্ষাদ্বারা যদি নীতির উৎকর্ষসাধন সম্ভবপর হয়, তাহা এইরূপ শিক্ষার ফলে; কেবল পাঠ্যপুস্তক মধ্যে নৈতিক উপদেশ কণ্ঠস্থ করিবার ফলে নহে।

"সে এক কাল ছিল; তখন গুরুশিষ্যের মধ্যে দোকানদারী সম্বন্ধ প্রচলিত ছিল না; তখন বেতনের পরিবর্ত্তে বিদ্যাবিক্রয় নিতান্ত হেয় প্রণালী বলিয়া বিবেচিত হইত। তখন গুরুশিষ্যের মধ্যে অন্যবিধ বিনিময়ের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল; এক পক্ষে স্নেহ ও প্রীতি, অন্য পক্ষে শ্রদ্ধা ও ভক্তি। উপনয়ন-সংস্কারের পর ধৃতব্রত মানব যখন ব্রহ্মচারীর ইউনিফরম্ পরিয়া দেবতাগণের ও আত্মীয়জনের আশীর্ব্বচন মস্তকে লইয়া পিতৃভবন হইতে গুরুগৃহে উপস্থিত হইত, তখন সেই কুটীরবাসী গম্ভীরমূর্ত্তি অপরিচিত পুরুষ সেই নবীন আগন্তুককে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিদ্বারা অভিষিক্ত করিয়া সম্ভাষণ করিয়া

দেশসমূহে যেরূপ সুফল প্রসব করিয়াছে, আমাদের এই পরাধীন দেশে স্বাধীন দেশের অনুকরণে সেরূপ সুফল প্রসব করিতে পারে না।

ফলে আমরা এতদিন যে পথ অবলম্বন করিয়া চলিতেছিলাম, সে পথ যেন ঠিক্ পথ নহে; এখন কোন্ নূতন পথ আমাদের অবলম্বনীয়, তাহার নির্ণয়ই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পথভ্রান্ত পথিক যেমন দিশাহারা হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে, আকাশের ধ্রুব তারাও তখন তাহার সংশয়াকুল চিত্তে বিশ্বাস স্থাপনে সমর্থ হয় না। আমরা ও সেইরূপ দিশাহারা হইয়া গন্তব্য পথনির্ণয়ে অসমর্থ ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। কোন্ অনির্দ্দেশ্য স্থান হইতে কাল মেঘ আসিয়া আমাদের সেই ক্ষীণপ্রভ ধ্রুবতারাটিকেও ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য দুই প্রকার—জ্ঞান, ধর্ম্ম এবং নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন। শিক্ষালব্ধ জ্ঞান এবং নৈতিক উন্নতিদ্বারা লোকসমাজকে উন্নতির পথে পরিচালিত করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। প্রাচীন কালে আমাদের দেশে উহাই উচ্চ বিদ্যাশিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এবং বিদ্যাশিক্ষাদ্বারা কৃষিবাণিজ্য ও শিল্প প্রভৃতির উন্নতিসাধন করিয়া দেশের দারিদ্র্য দূর করাটা গৌণ উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই কঠিন জীবন সংগ্রামের দিনে গৌণ উদ্দেশ্যটা মুখ্য উদ্দেশ্যে পরিণত হইয়াছে। জ্ঞান, ধর্ম্ম এবং নীতি শিক্ষার অভাবে সমাজদেহে নানাবিধ ব্যাধির উৎপত্তি ঘটিতেছে, সেই ব্যাধির নিরাকরণের জন্য কোন ব্যবস্থারও উদ্যোগ হইতেছে না; ফলতঃ বর্ত্তমান প্রণালীর প্রতীচ্য শিক্ষা আমাদের জাতীয় উন্নতি-কল্পে কোন কাজেই লাগিতেছে না।

অনেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই জন্য ভাবিয়া চিন্তিয়া উপদেশ দেন নীতি-পুস্তকের সংখ্যা পাঠ্যমধ্যে বাড়াইয়া দিলেই ছাত্রগণের নৈতিক উন্নতি হইবে। গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগ হুজুকে পড়িয়া নিয়ম করি,

লেন ছাত্রগণের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে অন্ততঃ এত পাতা নীতি-কথা থাকা চায়। গ্রন্থপাঠ করিয়া সন্নীতির উৎকর্ষবিধানের যাঁহারা আশা করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভেলা বাহিয়া সাগরসন্তরণে প্রবৃত্ত হন। রামেন্দ্রসুন্দর বলিয়াছেন, "শিক্ষকের কেবল নীতিসম্বন্ধে লেকচার দিলে চলিবে না; তাঁহাকে আপন গৃহস্বরূপ ও সমাজস্বরূপ লাবরেটরিতে দাঁড়াইয়া সন্নীতির দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে। ছাত্রেরা সেই দৃষ্টান্ত দেখিবে ও তাহার ফলভোগ করিবে; শিক্ষক স্বয়ং ভাল কাজ করিয়া তজ্জাত আনন্দ উপভোগ করিবেন ও ছাত্রদের দ্বারা ভাল কাজ করাইয়া তাহাদিগকে তাহার আনন্দ উপভোগ করাইবেন। শিক্ষক স্বয়ং মিথ্যাচার ও অসদাচার হইতে দূরবর্ত্তী থাকিবেন, ও আপনার ছাত্রগণকে মিথ্যাচার ও অসদাচার হইতে দূরে রাখিবেন; পরন্তু সহানুভূতির ও স্নেহের ও প্রীতির বন্ধনে ছাত্রদিগকে আবদ্ধ রাখিয়া বেত্রের শাসন ও জরিমানার শাসন ও Percentageএর শাসন অপেক্ষা এই বন্ধন যে কত অধিক ফলদায়ক, তাহা ছাত্রদিগকে আত্মজীবনে অনুভব করিবার শক্তি দিবেন। শিক্ষাদ্বারা যদি নীতির উৎকর্ষসাধন সম্ভবপর হয়, তাহা এইরূপ শিক্ষার ফলে; কেবল পাঠ্যপুস্তক মধ্যে নৈতিক উপদেশ কণ্ঠস্থ করিবার ফলে নহে।

"সে এক কাল ছিল; তখন গুরুশিষ্যের মধ্যে দোকানদারী সম্বন্ধ প্রচলিত ছিল না; তখন বেতনের পরিবর্ত্তে বিদ্যাবিক্রয় নিতান্ত হেয় প্রণালী বলিয়া বিবেচিত হইত। তখন গুরুশিষ্যের মধ্যে অন্যবিধ বিনিময়ের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল; এক পক্ষে স্নেহ ও প্রীতি, অন্য পক্ষে শ্রদ্ধা ও ভক্তি। উপনয়ন-সংস্কারের পর ধৃতব্রত মানব যখন ব্রহ্মচারীর ইউনিফরম্ পরিয়া দেবতাগণের ও আত্মীয়জনের আশীর্ব্বচন মস্তকে লইয়া পিতৃভবন হইতে গুরুগৃহে উপস্থিত হইত, তখন সেই কুটীরবাসী গম্ভীরমূর্ত্তি অপরিচিত পুরুষ সেই নবীন আগন্তুককে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিদ্বারা অভিষিক্ত করিয়া সম্ভাষণ করিয়া

লইতেন; গুরুগৃহ তখন তাহার পিতৃগৃহে পরিণত হইত; শিক্ষাদাতা তখন জন্মদাতার স্থান পরিগ্রহ করিতেন, গুরুপত্নী তখন জননীর স্থান গ্রহণ করিতেন, গুরুপুত্রগণ বয়স্যের স্থান ও ভ্রাতার স্থান গ্রহণ করিত। গুরুগৃহে বাসকালে যে সকল জ্ঞানোপদেশ প্রদত্ত হইত, তখন যে সকল শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত, তাহার সহিত আধুনিক শিক্ষার ও আধুনিক শাস্ত্রের তুলনায় কোন প্রয়োজন নাই; সেই পুরাকালের ভারতভূমির বেদ-ধ্বনিমুখরিত ঋষিপরিষৎ, সেই মৃগশিশুর বিচরণভূমি, সেই হোমধেনুসমূহের বিহারস্থলী, সেই ঋষিকন্যাসেবিত লতাবিতান, সেই নীবারকণাকীর্ণ উটজাঙ্গন, সেই শুকমুখভ্রষ্ট ইঙ্গুদীফলচিহ্নিত শ্যামল শষ্পক্ষেত্র, সেই সমিৎকুশফলাহরণপ্রত্যাগত ঋষিমণ্ডলী যখন মানসক্ষেত্রে প্রতিভাত হয়, তখন সেকালের শিক্ষাপ্রণালীর সহিত একালের বিদ্যাবিপণিসমূহে শিক্ষাবিক্রয়প্রথার তুলনা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস আপনা হইতে বহির্গত হয়।

"বেতন গ্রহণ করিয়া বিদ্যাদান যে একবারে অবৈধ ব্যাপার, তাহা আমি বলিতে চাহি না। অধ্যাপকেরও জীবনধারণ আবশ্যক, এবং অধ্যাপনাই যাঁহার একমাত্র জীবিকা, তাঁহাকে সেই উপলক্ষেই জীবনোপায় সংগ্রহ করিতে হইবে। একালে আর অধ্যাপকের জন্য ভূমিদানের তাম্রশাসন ক্ষোদিত হয় না; ধনীর অনুগ্রহের উপর জীবিকার জন্য নির্ভর করিয়া থাকিতে হইলে অনেকটা আত্মমর্য্যাদার হ্রাস হয়, ক্রমশঃ চাটুবৃত্তি শিক্ষা অভ্যস্ত হইয়া আসে। আমাদের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মধ্যেও এমন উদাহরণ বিরল নহে, যাঁহারা সামান্য অর্থের জন্য অসার অকর্ম্মণ্য জমিদার সন্তানকেও 'রাজন্ তব যশোভাতি দধিবৎ' বলিয়া চাটুকীর্ত্তনে কুণ্ঠিত হয়েন না। উচ্চ শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে আমাদের গবর্ণমেণ্ট বড় রাজি নহেন; সেই ভারটার অংশ নিজের পক্ষে লাঘব করিয়া দেশের লোকের উপর ফেলিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ব্যাকুল; দেশের ধনিসম্প্রদায়েরও তেমন

অবস্থা নহে যে, বর্ত্তমান প্রণালীর উচ্চ শিক্ষার গুরুভার তাঁহারা সম্যগ্রূপে বহন করেন। কাজেই শিক্ষার্থিগণের উপর সেই ভারটা একবারে চাপিয়া পড়িতেছে। শিক্ষার্থিগণের প্রদত্ত বেতনেই শিক্ষাপ্রদান এ দেশে প্রায় নিয়ম হইতে চলিয়াছে। আমরা প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী পরিত্যাগ করিয়াছি; বৈদেশিক প্রণালীর ব্যয়ভার গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত নহি। আমাদের অবস্থা নিতান্তই অস্বাভাবিক। এই অস্বাভাবিকতাই আমাদের ব্যাধি। ফলও ঠিক্ তদনুরূপ হইতেছে।

"আমরা দরিদ্র। হয়ত দারিদ্র্যই আমাদের সকল ব্যাধির মূল। বর্ত্তমান কালে আমাদের আয় বাড়িয়াছে সত্য কথা; আয়ের বিবিধ নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে সত্য কথা; কিন্তু আয়ের সঙ্গে কি ব্যয়ও বাড়ে নাই? আয়ের অনুপাতে ব্যয়ের মাত্রা অধিকতর হইয়াছে, এবং ব্যয়ের অঙ্ক যাহা বাড়িয়াছে, তাহা ঠিক্ আমাদের ইচ্ছাক্রমেই বাড়িয়াছে; এই ব্যয়বৃদ্ধির বিষয়ে কি আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে? এক একটা ছেলে মানুষ করিতেই এখন খরচ পড়ে কত? সেকালের ছেলেগুলা ভূমিষ্ঠ হইয়া 'উঙা উঙা' শব্দ করিত; এ কালের ছেলেগুলা ভূমি স্পর্শ করিবামাত্র 'ডাক্তার আন, ডাক্তার আন' বলিয়া কাঁদিতে থাকে। ডাক্তার বাবু আসিয়া অনেককে ভবযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি দিয়া ভবিষ্যতের খরচ কমাইয়া দেন; সুতরাং তাঁহার ভিজিটের টাকাটা নিতান্ত লোকসান মনে করা অন্যায়। কিন্তু দৈবাৎ যদি একটা ছেলে ডাক্তারকে ফাঁকি দিয়া পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিল, অমনি তাহার স্কুলের খরচ যোগাইতে হইবে। ছাত্রবৃত্তি পাঠশালায় জ্যামিতি ও পরিমিতি ও ভূবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা ও ব্যাকরণ ও অর্থব্যবহার ও নীতিকথা ও তত্ত্বকথা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক শাস্ত্রগ্রন্থসকলের ভীষণ ভার দুর্ব্বল শিশুর কণ্ঠরোধ করিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মাইয়া জঠরাগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া গৃহস্থের ভাবী

ব্যয়ের সংক্ষেপসাধনের আশা দেয় বটে; কিন্তু আপাততঃ ঐ সকল শাস্ত্র গ্রন্থের মূল্য জোগাইতে গৃহস্থের প্রাণ অস্থির হয়। ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া চাষার ছেলে আর লাঙ্গল ধরিতে চাহে না, কিন্তু আদালতের পেয়াদাত্ব গ্রহণ করিয়া নানা কৌশলে অর্থোপার্জ্জনে ব্যুৎপত্তি লাভ করে; ইহা নিতান্ত মন্দ নহে। কিন্তু ভদ্র গৃহস্থের ছেলেকে ইংরাজী পড়াইতে হয়? এণ্ট্রান্স পাশ করিলে দূর দেশে কলেজে পাঠাইতে হয়। সেখানে কলেজের বেতন ও পুস্তকাদির হিসাবে যে খরচ পড়ে, থিয়েটারের পয়সা যোগাইতে তাহার তিন গুণ পড়িয়া যায়। এই প্রয়াসের ফলে যাঁহারা উপাধিভূষিত হইয়া বাহির হয়েন, তাঁহাদের চাপরাশের ও সামলার মূল্যও সহজে আদায় হয় না। বিবাহ উপলক্ষে কিঞ্চিৎ অর্থাগমের আশা থাকিলেও অন্ধ বিধাতা সকলকে কেবল পুত্ররত্নে সৌভাগ্যশালী করেন নাই।

"যাঁহারা আমাদের ব্যয়বৃদ্ধি ও বিলাসিতাবৃদ্ধি দেখিয়া আমাদের অবস্থার স্বচ্ছলতার অনুমান করেন, তাঁহাদের এই অনুমানের যাথার্থ্যে একটু সন্দেহ উপস্থিত হয়। অবশ্য অবস্থা ভাল না হইলে অনাবশ্যক অপব্যয়ের দিকে মানুষের মন যায় না, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম; কিন্তু এই স্বাভাবিক নিয়মের কি কোথাও ব্যভিচার নাই? বুদ্ধিদোষে, সঙ্গদোষে, কর্ম্মবিপাকে, প্রকৃতির তাড়নায় মনুষ্য কি কখনও এই স্বাভাবিক নিয়ম হইতে ভ্রষ্ট হয় না? কুবেরপুত্রও আপনার অস্বাভাবিক প্রকৃতির তাড়নায় পৈত্রিক ঐশ্বর্য্য নষ্ট করিয়া ভিক্ষাবৃত্তির অবলম্বনে বাধ্য হয়। ব্যক্তিপক্ষে যাহা ঘটিতে পারে, ব্যক্তিসমষ্টি বা সমাজপক্ষে তাহা ঘটা কি একবারে অসম্ভব?

"স্বভাবতঃ যে জাতি দরিদ্র, তাহার পক্ষে ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর অস্বাভাবিক। এই অস্বাভাবিকতাই আমাদের সমাজশরীরের যত ব্যাধির নিদান।

"আমাদের মূল ব্যাধির আর একটা উপসর্গ সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা শক্তির অভাবে, অনুরাগের অভাবে, শ্রদ্ধার অভাবে, বুদ্ধির অভাবে, অভিজ্ঞতার অভাবে সকল কাজেই হাত দিয়া বিফলপ্রযত্ন হই; ও পরস্পরকে গালি দিতে আরম্ভ করি। এই জাতিকে গালি দেওয়া একালের লোকের একটা দারুণ ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা প্রত্যেকেই ভাবি. আমি বড় বীর, কেবল আমার সঙ্গীদের কাপুরুষতাতেই লড়াইটা ফতে হইল না। যিনি ধর্ম্মসংস্কারক, তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন, আমি বড় ধার্ম্মিক, আর তোমরা সকলে পাপপঙ্কে ডুবিয়া রহিয়াছ, ইহাতে ভারতউদ্ধার হইবে কিসে? যিনি সমাজসংস্কারক, তিনি তারস্বরে চীৎকার করিতেছেন, আমি বড় সাহসী, আমি এইমাত্র আমার বৃদ্ধ পিতামহের পৈতা ছিঁড়িয়া দিয়া আসিয়াছি এবং বৃদ্ধা পিতামহীর পাকা চুলে কলপ মাখাইয়া আসিতেছি, কেবল তোমাদেরই সৎসাহসের অভাবে ও কাপুরুষতায় আমরা সভ্য জগতে মুখ দেখাইতে পারিতেছিনা। যাঁহার রাজদ্বারে কেরাণীগিরির দরখাস্ত গৃহীত হয় নাই, তিনি সংবাদপত্রে ঘোষণা করিতেছেন, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় যতদিন কেবল চাকরির জন্য ব্যস্ত থাকিবেন, ততদিন ভারতের কোন আশা নাই। যিনি বড় সাহেবের কাণমলা খাইয়া অক্লেশে হজম করিয়াছেন, তিনি হুঙ্কার ছাড়িতেছেন, যতদিন তোমরা স্বদেশের জন্য ও স্বজাতির জন্য ধনপ্রাণ সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে না পারিবে, ততদিন তোমাদের মনুষ্যজন্ম অজাগলস্তনের ন্যায় নিরর্থক থাকিবে। যিনি আবার সমাজমধ্যে সুনীতির অভাবদর্শনে ব্যথিতপ্রাণ, তিনি সকলের উপর গলা তুলিয়া বলিতেছেন, তোমরা চরিত্র উন্নত কর, চরিত্রবল ব্যতিরেকে তোমাদের সকল চেষ্টাই পণ্ড হইবে।

"বলিতে দুঃখ হয়, আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী আমাদের সমাজের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা উৎপাদনে সমর্থ হয় নাই। আমরা বিজাতীয়

সমাজের সম্বন্ধে যে সংবাদ রাখি, আমাদের আত্মসমাজের সম্বন্ধে সে সংবাদ রাখা আবশ্যক বোধ করি না। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর ফলে কবি জন্মিয়াছেন, ঔপন্যাসিক জন্মিয়াছেন, বাগ্মী জন্মিয়াছেন, রাজনীতিকুশল ব্যক্তি জন্মিয়াছেন, গণিতবিৎ ও বৈজ্ঞানিক পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু ভারতবর্ষের অতীত ও বর্ত্তমান সমাজতত্ত্ব শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করেন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি নিতান্তই বিরল।

"আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আর এক শ্রেণির লোক আছেন, তাঁহারা বলেন, ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বে শিখিবার কথা আছেই বা কি যে, তাহাতে সময় নষ্ট করিব? গোটাকতক শিলালিপি ও থানকতক তাম্র শাসন ও কয়েকথানা প্রক্ষিপ্তোক্তিপূর্ণ কীটদষ্ট গ্রন্থমাত্র যে পুরাতত্ত্বের অবলম্বন, তাহার সমালোচনায় ফল কি? শিলালিপি ও তাম্রশাসন ও কীটদষ্ট গ্রন্থ যে কয়খানা আছে, তাহা কি বৈদেশিক কর্ত্তৃক পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইয়া ভারতসমাজের ইতিহাসকে বিকৃত করিবে? যে দেশের প্রাচীন ইতিহাস দেশীয়গণের ভক্তি আকর্ষণে সমর্থ হয় না, সে দেশের সামাজিকগণের মধ্যে প্রকৃত স্বজাতি-বাৎসল্য জন্মিতে পারে না।

"আমরা যাহা করি, তাহা পরহস্তধৃতসূত্রবিলম্বিত পুত্তলিকার অভিনয় মাত্র। আমরা কোন উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন কাজ করিনা; আমরা লোককে দেখাইতে চাই, আমরা কাজ করি। আমরা গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের অভিনয় করি, সাহেবদের কাছে প্রশংসালাভের জন্য; আমরা দেশহিতৈষিতার অভিনয় করি, বড় হইবার জন্য; আমরা বদান্যতার অভিনয় করি, উপাধিলাভের জন্য; আমরা সমাজসংস্কারের অভিনয় করি, আপনাকে জাহির করিবার জন্য; আমরা বিলাসিতার ও সাহেবিয়ানার অভিনয় করি, সভ্যতা ফলাইবার জন্য। জগৎসংসার আমাদিগের অভিনয় দেখিয়া হাসে ও করতালি দেয়; আমরা মনে ভাবি,

আমরা কেমন বীর। আমরা উদরান্নের সংস্থান না করিয়াও বিলাতী পণ্য দ্রব্যে ঘর সাজাই, বিলাতের বণিকেরা ভাবে, কেমন শিকার মিলিয়াছে। আমাদের বিলাসিতাবৃদ্ধি দেখিয়া আমাদের ধনবৃদ্ধি ঘটিয়াছে মনে করিও না; আমাদের শরীরে অভিনেতার চাকচিক্যময় পরিচ্ছদ দেখিয়া সেই পরিচ্ছদে আমাদের স্বামিত্ব কল্পনা করিও না।"

আমাদের এই অস্বাভাবিকতা, ব্যয়বাহুল্যতা, আন্তরিকতাবিহীনতা এবং অশ্রদ্ধার ভাব কেবল বিজাতীয় শিক্ষা ও সঙ্গদোষে ঘটিতেছে, এ কথা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিতেছেন। যে শিক্ষা সমাজধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হয় না, বরং তাহাকে উচ্ছৃঙ্খলতার পথে টানিয়া লইয়া যায়, সেরূপ শিক্ষার প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়াছেন, আমাদের এই অস্বাভাবিক শিক্ষা-প্রণালীর আমূল সংস্কার সাধন করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। রামেন্দ্র-সুন্দর শিক্ষাসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন। বিজাতীয় ভাষা এবং বিজাতীয় ভাব লইয়া সদাসর্ব্বদা আলোচনা করিলে মানুষের মতিগতিও বিজাতীয় ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে ইহাও স্বাভাবিক নিয়ম। সেই বিজাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যদি আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারি, তাহা হইলেও রক্ষা; নচেৎ কেবল অন্ধ অনুকরণের বশবর্ত্তী হইয়া ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইয়া লাভ কি?

রামেন্দ্রসুন্দর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রোড়ে জীবনের উৎকৃষ্ট সময় অতিবাহন করিয়া যে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব তাঁহার অন্তরে জাগরূক ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তিত উচ্চ শিক্ষাকে আমাদের জাতীয় ভাবে গঠিত করিবার জন্য তাঁহার বাসনা প্রবল হইয়াছিল; আমাদের সমাজ যাহাতে সেই শিক্ষা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া জাতীয় উন্নতি সাধনে সমর্থ হয়, তাহাই তাঁহার

একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইয়াছিল। প্রতীচ্য বিদ্যা হইতে শিক্ষণীয় বস্তুসকল আহরণ করিয়া উহা আমাদের জাতীয় ভাবে রূপান্তরিত করিয়া লইয়া এবং প্রাচ্য বিদ্যার সহিত উহার সম্মিলন ঘটাইয়া মাতৃভাষার সাহায্যে দেশবাসীদিগকে শিক্ষা দিলে সুফল ফলিতে পারে, এইরূপ ধারণা তিনি মনোমধ্যে পোষণ করিতেন। ঐ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি বহুদিন হইতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় পূর্ব্বে তাঁহার বিরুদ্ধবাদীর সংখ্যা অত্যধিক ছিল; সেই কারণে তিনি পদে পদে বাধা পাইতেছিলেন; কিন্তু বাধা পাইয়াও তিনি একবারে হতাশ হইয়া তাঁহার বহুকালের অন্তরপোষিত সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন নাই; শুভ সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারসাধনের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক "য়ুনিভারসিটি কমিশন" নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কমিশনের সদস্যগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া রামেন্দ্রসুন্দর শিক্ষাপ্রণালীর সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত, যুক্তি-পূর্ণ, সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ঐ মূল্যবান্ প্রবন্ধটি লেখকের চিন্তাশীলতা ও ধীশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছে। লেখক প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য এই দুইটি ভাবের মধ্যে কোন একটি ভাববিশেষের একান্ত অনুরক্ত ছিলেন না; প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য উভয়বিধ শিক্ষা হইতে যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু গ্রহণীয়, তাহা গ্রহণ করিয়া সেই ভাবধারার সম্মিলন ঘটাইয়া তাহা জাতীয় শিক্ষার উপযোগী করিয়া তুলিবার অভিপ্রায় কিরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সকলের চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়। কমিশন তাঁহার প্রকাশিত মন্তব্য ও প্রদর্শিত যুক্তিগুলি পাঠ করিয়া অতীব সন্তুষ্ট হন, এবং তাঁহাদের রিপোর্টের অনেক স্থলে উহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেন।

রামেন্দ্রসুন্দর সেকাল ও একালের শিক্ষাপ্রণালীর তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কমিশন বলেন, "রামেন্দ্রসুন্দর পাশ্চাত্য শিক্ষার আবশ্যকতা ও উপকারিতা নিজ জীবনে ভালরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন; পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট তিনি বিশেষভাবে ঋণী। কিন্তু উভয়বিধ শিক্ষার পরিণতি ও অবস্থা তুলনা করিয়া তাঁহার অন্তর ব্যথিত হইয়াছে। পুরাকালে গুরুশিষ্যের মধ্যে যে একটা মধুর সম্পর্ক ছিল, এখন তাহার অভাব দেখিয়া তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন, গুরুর সঙ্গ লাভ করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে আশ্রয় পাইয়া শিষ্য যে স্নেহ ও প্রীতি লাভ করিত এখন তাহার নিতান্তই অভাব ঘটিয়াছে।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুরাকালে আমাদের দেশে আত্মোন্নতির জন্য বিদ্যা শিক্ষার প্রচার ছিল। অধুনা ইহা সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রচারিত হইয়াছে। অর্থোপার্জ্জন ও আত্মপ্রতিষ্ঠা এখন শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আত্মোন্নতির পন্থা হইতে মুখ ফিরাইয়া অর্থ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, এবং সেই কারণে হৃদয়ের মধুর বৃত্তি সকলের অনুশীলন করিবার চেষ্টা এক কালে লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে, ও গুরুশিষ্যের মধ্যে যে একটা মধুর সম্পর্ক ছিল—এক পক্ষে স্নেহ ও প্রীতি, অন্য পক্ষে শ্রদ্ধা ও ভক্তি, তাহার একান্ত অভাব ঘটিতেছে। গুরুর নিকট প্রেম শিক্ষা করিবার সুবিধা না পাইলে, সমাজের প্রতি স্বজাতীর প্রতি এবং জগতের প্রতি কিরূপে প্রেমভাব আসিতে পারে, ইহা একটা ভাবিবার বিষয়।

রামেন্দ্রসুন্দর কমিশনকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় যাহা বলিয়াছেন তাহার কতিপয় অংশের ভাবার্থ এইরূপ,—

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ বিদেশী বস্তু। হঠাৎ নূতন জীবন-

যাত্রাপ্রণালী ও নূতন রাজনৈতিক অবস্থার প্রচলনের জন্য উহাকে এদেশে আমদানি করা অতি আবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছিল। নূতন শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলনকারিগণ দেশীয় শিক্ষার আদর্শ ও পদ্ধতি পর্য্যালোচনা করিবার অবকাশ পান নাই। যে সকল সামাজিক নিয়ম একটা পুরাতন জাতীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিত, তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া তৎকালে অত্যন্ত আবশ্যক বোধে নূতন শিক্ষাপ্রণালী তাড়াতাড়ি এদেশে প্রচলন করা হইয়াছিল। ঐ পদ্ধতির প্রচলন-কারিগণকে একটা নূতন শিক্ষা-যন্ত্রের উদ্ভাবনা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ঐ নূতন শিক্ষা-যন্ত্রটি যাহাদের উপকারার্থে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাদের ধর্ম্ম ও সামাজিক জীবনের সহিত উহার সঙ্গতি আছে কি না, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবার অবকাশ তাঁহারা পান নাই।

"একটি প্রতিষ্ঠা এবং যন্ত্র হিসাবে ধরিতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য বিফল হয় নাই। প্রথমতঃ যে উদ্দেশ্যে উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, প্রশংসার সহিত তাহা সাধিত হইয়াছে। রাজসরকার ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে বিশ্বস্ত এবং দক্ষ কর্ম্মচারী প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইংরাজশাসনে যে নূতন রাজনৈতিক অবস্থার প্রচলন হইয়াছে, তদনুসারে ঐ সকল কর্ম্মচারি-গণ তাঁহাদের নিজকর্ত্তব্য সাধন করিয়াছেন এবং করিতেছেন। উহা-দ্বারা এই দেশে শিক্ষিত জনসাধারণের সৃষ্টি হইয়াছে; তাঁহারা পাশ্চাত্য সংসর্গজাত বিধিনিয়মের দ্বারা এই দেশের লোকের দৈনন্দিন জীবনের উপর বৈধ প্রভাব বিস্তার করিতেছেন। ঐ শিক্ষাপদ্ধতিদ্বারা প্রাচ্য জাতীয় জীবনের ভিত্তি প্রশস্ত হইয়াছে, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক। ঐ শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলনের পূর্ব্বে ঐ জাতি তাহাদের নিজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া যেটুকু স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছিল, তাহারা তাহা লইয়াই থাকিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা

ও পাশ্চাত্য ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তাহার দ্বারা আমাদের ভাব ও চিন্তার ক্ষেত্র প্রসারতা লাভ করিয়াছে। আমরা নূতন কর্ত্তব্য সম্মুখে পাইয়াছি, আমাদের মধ্যে নূতন আশার সৃষ্টি হইয়াছে, এবং পৃথিবীর অনন্ত জীবন-সংগ্রামে যোগদান করিবার জন্য আমাদের দেশ নবজীবনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। তাহারই ফলে আমরা অধুনা এমন একরূপ ভারতবাসী সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছি, যাহাদিগের শিক্ষা ও দীক্ষার ভিত্তির উপর সুদৃঢ় ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তাহারা জগতের মানবসমাজে নিজের প্রভাব জ্ঞাপন করিবে।"

কমিশন তাঁহার রিপোর্টের এক স্থলে রামেন্দ্রসুন্দরের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধে মন্তব্যটি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, "রামেন্দ্রসুন্দরের কথিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এইরূপ কৃতিত্বে আমরা মুগ্ধ, এবং ইহার ভবিষ্যৎ পরিণাম সম্বন্ধে আমরা তাঁহার সহিত একমত। আমরা শিক্ষাসংস্কারের জন্য যে সকল পরিবর্ত্তন প্রস্তাব করিয়াছি, সেগুলি কার্য্যে পরিণত হইলে, আশা করি তাঁহার সঙ্কল্পিত আদর্শ লাভ হইবে ও বিশ্ববিদ্যালয় নব জীবনের সৃষ্টিসাধন ও স্বাধীনতা দান করিতে পারিবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সুন্দর ভাবসমূহের মধুর সম্মিলন ঘটিবে।"

লাট সাহেব লর্ড রোণাল্ডশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Convocation বা উপাধিবিতরণ সভায় রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষা উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছিলেন—"The future of India depends upon finding a civilisation which will be a happy union of Hindu, Islamic and European civilisations." অর্থাৎ ভারতের ভবিষ্যৎ হিন্দুমুসলমানের সভ্যতার ধারার সহিত য়ুরোপের সভ্যতা-ধারার সম্মিলনের উপর একান্ত নির্ভর করিতেছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভারতবর্ষ অনেক বিষয়ে লাভবান্ হইয়াছে

সত্য, কিন্তু তাহার প্রাচীন রীতিনীতি, আচারঅনুষ্ঠান ও সভ্যতা একবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহাতে যে বহুপরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে, এ কথাও রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

"Western education has given us much ; we have been great gainers ; but there has been a cost, a cost as regards culture, a cost as regards respect for self and reverence for others, a cost as regards the nobility and dignity of life."

অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমরা অনেক বিষয়ে লাভবান্ হইয়াছি ; কিন্তু বিনিময়স্বরূপ আমাদিগকে সনাতন অনুশীলন ত্যাগ করিতে হইয়াছে, আমরা আত্মসম্মান হইতে বঞ্চিত হইয়াছি—অপরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত হইয়াছি—জীবনের মহত্ব ও মর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়াছি।

রামেন্দ্রসুন্দর প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপ্রণালীর একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়া কমিশনের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন, সেই চিত্রের মনোহর নৈপুণ্য দর্শন করিয়া কমিশন মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

স্বদেশানুরাগে

বয়োবৃদ্ধিসহকারে রামেন্দ্রসুন্দরের স্বদেশের প্রতি মমত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঐ মমত্ব তাঁহাকে কর্ম্মবন্ধনে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া কর্ত্তব্যের পথে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। যশঃ, মান, অর্থ প্রভৃতি কিছুরই প্রলোভন তাঁহাকে সেই পথ হইতে রেখামাত্র বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। শেষ পর্য্যন্ত সেই বন্ধনের দৃঢ়তায় ও আকর্ষণে তাঁহাকে দেহপাত করিতে হইয়াছিল। ঐ মমত্ববোধ তাঁহার সহজাত শিক্ষার ফল; কোন নেতার নিকট তিনি সে শিক্ষা লাভ করেন নাই। দেশবাসিগণের মনে জ্ঞানের আলোকবর্ত্তিকা জ্বালিয়া দিয়া তাহাদিগকে অজ্ঞানান্ধকার হইতে মুক্ত করিয়া কর্ত্তব্যের পথে পরিচালিত করিবার জন্য আমরণ তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং ঐ পন্থায় দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। তিনি বড় আক্ষেপের সহিত বলিয়াছেন—"অন্যে যাহা সম্পন্ন করিয়াছে, আমরা ভাষার দ্বারা তাহা প্রকাশ করিতে পারি না।" এই দৈন্য দুর করিবার জন্য তাঁহার যত চেষ্টা যত প্রয়াস।

জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যসাধনার মধ্যদিয়া সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইবার জন্য তাঁহার একান্ত চেষ্টা ছিল। দর্শন এবং বিজ্ঞানের মধ্যদিয়া জগতের ও স্বদেশের জ্ঞানরাশি অর্জ্জন করিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, আমাদের প্রাচীন চিরন্তন ভাবধারা জগতের চিন্তারাজ্যের পার্শ্বে নিজের পায়ের উপর নির্ভর করিয়া ঋজুভাবে দাঁড়াইতে সমর্থ। আত্মবিস্মৃত স্বদেশবাসিগণের নিকট সেই ভাবধারা প্রবাহিত করিবার জন্য তিনি সরস সুন্দর এবং প্রাঞ্জল স্বদেশীয়

সত্য, কিন্তু তাহার প্রাচীন রীতিনীতি, আচারঅনুষ্ঠান ও সভ্যতা একবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহাতে যে বহুপরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে, এ কথাও রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

"Western education has given us much ; we have been great gainers ; but there has been a cost, a cost as regards culture, a cost as regards respect for self and reverence for others, a cost as regards the nobility and dignity of life."

অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমরা অনেক বিষয়ে লাভবান্ হইয়াছি ; কিন্তু বিনিময়স্বরূপ আমাদিগকে সনাতন অনুশীলন ত্যাগ করিতে হইয়াছে, আমরা আত্মসম্মান হইতে বঞ্চিত হইয়াছি—অপরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত হইয়াছি—জীবনের মহত্ত্ব ও মর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়াছি।

রামেন্দ্রসুন্দর প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপ্রণালীর একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়া কমিশনের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন, সেই চিত্রের মনোহর নৈপুণ্য দর্শন করিয়া কমিশন মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

স্বদেশানুরাগে

বয়োবৃদ্ধিসহকারে রামেন্দ্রসুন্দরের স্বদেশের প্রতি মমত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঐ মমত্ব তাঁহাকে কর্ম্মবন্ধনে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া কর্ত্তব্যের পথে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। যশঃ, মান, অর্থ প্রভৃতি কিছুরই প্রলোভন তাঁহাকে সেই পথ হইতে রেখামাত্র বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। শেষ পর্য্যন্ত সেই বন্ধনের দৃঢ়তায় ও আকর্ষণে তাঁহাকে দেহপাত করিতে হইয়াছিল। ঐ মমত্ববোধ তাঁহার সহজাত শিক্ষার ফল; কোন নেতার নিকট তিনি সে শিক্ষা লাভ করেন নাই। দেশবাসিগণের মনে জ্ঞানের আলোকবর্ত্তিকা জ্বালিয়া দিয়া তাহাদিগকে অজ্ঞানান্ধকার হইতে মুক্ত করিয়া কর্ত্তব্যের পথে পরিচালিত করিবার জন্য আমরণ তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং ঐ পন্থায় দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। তিনি বড় আক্ষেপের সহিত বলিয়াছেন—"অন্যে যাহা সম্পন্ন করিয়াছে, আমরা ভাষার দ্বারা তাহা প্রকাশ করিতে পারি না।" এই দৈন্য দূর করিবার জন্য তাঁহার যত চেষ্টা যত প্রয়াস।

জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যসাধনার মধ্যদিয়া সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইবার জন্য তাঁহার একান্ত চেষ্টা ছিল। দর্শন এবং বিজ্ঞানের মধ্যদিয়া জগতের ও স্বদেশের জ্ঞানরাশি অর্জ্জন করিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, আমাদের প্রাচীন চিরন্তন ভাবধারা জগতের চিন্তারাজ্যের পার্শ্বে নিজের পায়ের উপর নির্ভর করিয়া ঋজুভাবে দাঁড়াইতে সমর্থ। আত্মবিস্মৃত স্বদেশবাসিগণের নিকট সেই ভাবধারা প্রবাহিত করিবার জন্য তিনি সরস সুন্দর এবং প্রাঞ্জল স্বদেশীয়

ভাষায় তাহার আলোচনা করিয়াছিলেন। পরের ভাষায় জগতের দুরূহ ভাবের সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। জগতের কোন সভ্য দেশেই বোধ হয় ঐ নিয়ম প্রচলিত নাই। কেবল আমাদের এই ভারতবর্ষেই ঐ অদ্ভুত নিয়ম প্রচলিত আছে, ইহা ভারতের দুর্ভাগ্য; এই জন্যই বোধ হয় ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য বিদ্যা সকল ক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে ফলদায়িনী হয় নাই।

রামেন্দ্রসুন্দর ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। মাতৃভাষার পরিবর্ত্তে তিনি যদি ইংরাজী-ভাষায় তাঁহার প্রবন্ধাদির আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে তিনি হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, কেল্‌ভিন, ম্যাক্‌স্‌ওয়েল প্রভৃতি বড় বড় চিন্তাশীল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ন্যায় জগতে স্বীয় নাম প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন; কিন্তু সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে স্বদেশবাসীর জন্য। তিনি বর্ত্তমান স্বদেশবাসীকে কর্ত্তব্যের পথে চলিতে পথ দেখাইয়াছেন, এবং ভবিষ্যৎ স্বদেশবাসীদিগকে সেই পথে চলিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাঁহার ভাব, তাঁহার চিন্তা, তাঁহার কর্ম্ম ও সাধনা সবই তিনি দেশের মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত করিয়াছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর অন্তরে অন্তরে স্বদেশী ছিলেন। তিনি কখন নেতার পদ-গ্রহণ করিয়া ঢাক ঢোল বাজাইয়া নিজেকে স্বদেশভক্তরূপে প্রচার করিতে চেষ্টা করেন নাই। বাহ্য আড়ম্বর প্রদর্শন করিতে তিনি সর্ব্বদাই সঙ্কোচ বোধ করিতেন। নিজের অশনে ও বসনে, ব্যবহার ও চিন্তায় তিনি আদর্শ ভক্ত সন্তানরূপে নিজের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। বঙ্গবিভাগের হেতু স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁহার জন্মভূমিকে স্বদেশপ্রেমে মাতোয়ারা করিবার জন্য স্থানীয় জমিদারসন্তানকে পুরোবর্ত্তী করিয়া একবার মাত্র প্রকাশ্যভাবে তিনি আন্দোলনের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহার

পর আর কখন প্রকাশ্যভাবে তাঁহাকে আন্দোলনে যোগদান করিতে দেখি নাই। সেই স্বদেশী আন্দোলন যখন গুপ্ত নরহত্যার শোণিতে কলঙ্কিত হইয়া পড়ে, তখন তিনি বড়ই আক্ষেপের সহিত বলিয়াছিলেন—"এই পাপে আমাদের এই আন্দোলন পণ্ড হইবে, গবর্ণমেণ্ট কঠোর হস্তে ইহার মূলোচ্ছেদে প্রবৃত্ত হইবেন।" ফলে ঘটিয়াছিল তাহাই।

রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার স্বদেশকে বড় ভালবাসিতেন। সেই জন্য দেশের দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। কি উপায় উন্নাবিত হইলে আবার তাঁহার স্বদেশ জগতের সমক্ষে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইবে, তাহার জন্য তিনি প্রাণপণ করিয়াছিলেন। আমরা আচার্য্য জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভাষায় বলিতে পারি—"তিনি যে ভারতবর্ষকে ভালবাসিতেন, তাহা কতকটা ভারত ভারত বলিয়াই; কিন্তু আরও ভালবাসিতেন, ভারত তাঁহার নিজের বলিয়া। ভারতের যাহা কিছু—তাহার আকাশ—মৃত্তিকা, তাহার উদ্যান—প্রান্তর, তাহার হিমালয়, তাহার ভাগীরথী, তাঁহার কথাবিশ্রুত নরনারী, তাহার কবি ও দার্শনিক—সবেতেই তিনি গৌরব অনুভব করিতেন। তাঁহার ভারত, বাল্মীকি-বুদ্ধের ভারত যে কালের পঙ্কে লুণ্ঠিত হইল, এই যন্ত্রণাতেই তিনি ছট্ ফট্ করিতেন। স্বদেশের সেবা তিনি ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার প্রকৃতি, তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা, তাঁহার অবস্থা অনুসারে সেবার প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইল। * * * তাঁহার পবিত্রতা, তাঁহার আত্মসংযম ও তাঁহার নম্রতা, তাঁহার রচনারীতিতে প্রতিফলিত হইয়াছে। এগুলি যেমন তাঁহার ব্রতসাধনপক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল, তাঁহার প্রকৃতির পক্ষেও সেইরূপ স্বভাবসিদ্ধ ছিল। তিনি যে ভাবে অল্প বয়স হইতে অনুরাগবশবর্ত্তী হইয়া জীবনের একটি লক্ষ্য বাছিয়া লইতে পারিয়াছিলেন, এবং স্বীয় প্রতিভা ও বেষ্টনীর সহিত সম্পূর্ণ মিল রাখিয়া যেরূপ অবিচলিত ভাবে এই লক্ষ্য অনু-

সরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রণিধান করিলেই তাঁহার জীবন ও কীর্ত্তি কলাপের অর্থ পাওয়া যায়। * * * তিনি কলির সুসন্তান ছিলেন; জন্মভূমি ও মাতৃভাষার পরম প্রেমিক ছিলেন।”

স্বদেশী আন্দোলনের সময় উহার স্মৃতি দীর্ঘকাল জাগরূক রাখিবার অভিপ্রায়ে তিনি অরন্ধনের পরিকল্পনা করিয়া তাহা সামাজিক ব্রত-অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত করিয়া দিয়াছিলেন। সমাজের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী স্ত্রীজাতিকে সেই আন্দোলনের পশ্চাতে দণ্ডায়মান রাখিয়া পুরুষজাতির শক্তি ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি শক্তিরূপিণী স্ত্রীজাতির জন্য অপূর্ব্ব ভাষায় “বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা” রচনা করিয়াছিলেন। ব্রতকথার ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন—“বঙ্গব্যবচ্ছেদের দিন অপরাহ্ণে জেমোকান্দি গ্রামের অর্দ্ধসহস্রাধিক পুরনারী আমার মাতৃদেবীর আহ্বানে আমাদের বাড়ীর বিষ্ণুমন্দিরের উঠানে সমবেত হইয়াছিলেন; গ্রন্থোক্ত অনুষ্ঠানের পর আমার কন্যা শ্রীমতী গিরিজা কর্ত্তৃক এই ব্রতকথা পঠিত হয়।”

গ্রন্থখানি আকারে ক্ষুদ্র উহাকে আমরা একখানি ক্ষুদ্র গদ্য কাব্য বলিতে পারি। উহাতে বাঙ্গালাদেশের একটা ঐতিহাসিক বিবরণ অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। বিভিন্ন সময়ে রাজার ও প্রজার অনাচারের জন্য বাঙ্গালার লক্ষ্মী চঞ্চলা হইয়া বাঙ্গালা ছাড়িবার সঙ্কল্প করিলে, রাজা এবং প্রজার কাতর প্রার্থনায় তিনি আবার বঙ্গদেশে অচলা হইয়া বাস করিবার ভরসা দিয়াছিলেন; তাহার কয়েকটি চিত্র গ্রন্থকার অতি নিপুণ হস্তে অঙ্কিত করিয়াছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয় সেই চিত্রগুলি প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিবার বাঞ্ছা থাকিলেও আমাদিগকে সে প্রলোভন ত্যাগ করিতে হইল। রাজপুরুষের আদেশে এক্ষণে সেই চিত্র প্রদর্শন করিবার উপায় নাই। পাঠকবর্গের গোচরার্থ গ্রন্থের শেষ ভাগ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।

"তিরিশে আশ্বিন কোজাগরী পূর্ণিমার পর তৃতীয়া। পূর্ণিমার পূজা নিয়ে বাঙলার লক্ষ্মী ঐ দিনে বাঙলা ছাড়ছিলেন। ঐ দিন বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় অচলা হ'লেন। বাঙলার হাট মাঠ ঘাট জুড়ে ব'স্‌লেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগ্‌লেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হ'ল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠ্‌ল। তাতে রাজহংস খেলা ক'র্‌তে লা'গ্‌ল। লোকের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গুরু, গাল ভরা হাসি হ'ল।

"বাঙলার মেয়েরা ঐ দিন বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত নিলে। ঘরে ঘরে সে দিন উনুন জ্বাল্‌লনা। হিন্দু-মোছলমান ভাই ভাই কোলাকুলি ক'র্‌লে। হাতে হাতে হল্‌দে সুতোর রাখী বাঁধ্‌লে। ঘট পেতে বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুন্‌লে। যে এই বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শোনে, তার ঘরে লক্ষ্মী অচলা হন।

"বচ্ছর বচ্ছর ঐ দিনে বাঙলার মেয়েরা এই ব্রত নেবে। বাঙালীর ঘরে ঐ দিন উনুন জ্বল্‌বেনা। হাতে হাতে হল্‌দে সুতোর রাখী বাঁধ্‌বে। বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনে' শাঁখ বাজিয়ে' ঘটে প্রণাম করে' বাতাসা-পাটালি প্রসাদ পাবে। ঘরে ঘরে লক্ষ্মী অচলা হবেন। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাক্‌বেন। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় থাক্‌বেন।

সবাই বল—

আমরা ভাই ভাই এক ঠাঁই ভেদ নাই ভেদ নাই।

"মা লক্ষ্মী, কৃপা কর। কাঞ্চন দিয়ে কাচ নেবো না। শাঁখা থাক্‌তে চুড়ি পর্‌বো না। ঘরের থাক্‌তে পরের নেবো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা ক'র্‌বোনা ও পরের ধন হাতে তুল্‌বো না। মোটা অন্ন ভোজন ক'র্‌বো। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। মোটা ভূষণ আভরণ ক'র্‌বো। পড়শী খাইয়ে নিজে খাবো। ভাইকে খাইয়ে পরে খাব। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক।

মোটা বস্ত্র অক্ষয় হো'ক্। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুন। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় থাকুন।

"বাঙলার মাটী বাঙলার জল
বাঙলার হাওয়া বাঙলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান্।

বাঙলার ঘর বাঙলার মাঠ
বাঙলার বন বাঙলার হাট
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান্।

বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান্।

বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন,
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন্,
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান্।

বন্দে মাতরম্।"

অনেকে মনে করেন, চিরপরাধীনতাই আমাদের অবনতির একমাত্র কারণ, সম্পূর্ণরূপে পরের উপর নির্ভর করিয়া কোন জাতি কোন কালে উন্নত হইতে পারে না। কথাটা মূলতঃ ঠিক ; কিন্তু কোন জাতিই

মনুষ্যত্বের সীমায় না পৌঁছিয়া বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না এ কথাও ঠিক। বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে গেলে মানুষ হইতে হইবে; তাই আমাদের রাজপুরুষগণ বলিয়া থাকেন, তোমরা অগ্রে উপযুক্ত হও, তারপর স্বরাজের দাবী করিও। আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা মহাত্মা গাঁন্ধী বলিয়াছেন—"তোমরা সংযত ভাবে আত্মসাধনায় প্রবৃত্ত হও, নিশ্চয় সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইবে।" অজ্ঞতাই আমাদের সকল উন্নতির প্রতিবন্ধক। যে পথে চলিতে চলিতে আমরা জ্ঞান ও কর্ম্ম সাধনার দ্বারা আমাদের দোষ ও ক্রটী এবং হীনতা পদে পদে লক্ষ্য করিতে পারিব, ও সেই সকলের প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হইব, আমাদিগকে সেই পথে চলিতে হইবে। আমাদের অজ্ঞানান্ধ নেত্র সর্ব্বদা আলস্য এবং উপেক্ষার আবরণে আবৃত রহিয়াছে। আলস্য ত্যাগ করিয়া পূর্ণ উদ্যমের সহিত জ্ঞানাঞ্জন শলাকার সাহায্যে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া আমাদিগকে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করিতে হইবে। রামেন্দ্রসুন্দর সেই মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

প্রাচ্য ভাবে

রামেন্দ্রসুন্দর উচ্চ পাশ্চাত্য বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই জ্ঞানের ও চিন্তার ধারায় অভ্যস্ত হইয়াও প্রতীচ্য সভ্যতার আপাত-মনোহর মোহপাশে পড়িয়া তিনি আত্মহারা হন নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার তীব্র আলোকচ্ছটা তাঁহার নয়ন ঝলসিয়া দিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে তাহার মহিমার পার্শ্বে আমাদের বর্ত্তমান দৈন্যের ভাব তাঁহার চিত্তে বিষম বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি এত দিন ভাবিয়াছিলেন, যাহা কিছু মহিমাময়, যাহা কিছু গৌরবময় সবই কি প্রতীচ্যের নিজস্ব? আমাদের ভারত কি এতই দীন? ভারতে কি কিছুই ছিল না? জগতের জ্ঞানরাজ্যের পার্শ্বে খাড়া করিতে পারি এমন কোন বস্তু কি আমাদের প্রাচীন ভারতে ছিল না? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য তিনি প্রাচীন ভারতের জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; তাহা হইতে যে অমৃতের উৎস উঠিয়াছিল, তাহা আস্বাদন করিয়া তিনি ধন্য হইয়াছিলেন। সেই অমৃতের অপূর্ব্ব আস্বাদ তিনি নিজে গ্রহণ করিয়া তাহার বিমল আনন্দটুকু স্বদেশবাসিগণের নিকট পরি-বেশন করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন।

বি, এ, পাশ করিবার পর রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার খুল্লপিতামহ ব্রজসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সংগৃহীত প্রাচীন পুরাণ, উপপুরাণ, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিতেন, এবং জননী পিতামহী প্রভৃতি পুরমহিলাগণকে পাঠ করিয়া শুনাইতেন। তদবধি প্রাচীন শাস্ত্রের প্রতি

তাঁহার একটা শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। কলেজের পাঠ শেষ করিয়া ঐ সকল বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার একটা প্রবল আগ্রহ দেখিতে পাইতাম। তাহার ফলে বয়োবৃদ্ধিসহকারে তিনি তন্ত্র, দর্শন, বেদান্ত ও বেদ শাস্ত্র চর্চ্চা করিয়া গভীর জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর একদেশদর্শী ছিলেন না। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় বিদ্যার যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহা অর্জ্জন করিয়া তাহার সহিত প্রাচীন সভ্যতার কতটুকু সম্বন্ধ তাহা নির্ণয় করিবার জন্য তিনি প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। সেই অনুসন্ধানের ফলে তিনি জানিয়াছিলেন, প্রাচীন নবীনের তুলনায় কোন অংশে হীনতর নহে। সেই জন্য নবীন সভ্যতা তাঁহার নিকট অসম্ভব রকম বড় হইয়া উঠিতে পারে নাই; এমন কি উভয়ের তুলনায় প্রাচীন সভ্যতার প্রতি তিনি অধিকতর শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং সেই দিকে তাঁহার রুচিরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তাহার কারণ, প্রাচীন যাহা কিছু সব আমাদের নিজস্ব, নবীন পরস্ব।

স্বদেশপ্রেমই রামেন্দ্রসুন্দরকে সেই প্রাচীন সভ্যতার প্রতি অনুরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ঐ সম্বন্ধে আমরা তাঁহার নিজের একটু অভিমত উদ্ধৃত করিলাম—"আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এত দিন ধরিয়া আমাদিগকে যে বিদ্যা বিতরণ করিয়া আসিতেছেন, তাহার ফলে দেশের ইতিহাস জানিবার আকাঙ্ক্ষা বিশেষ উদ্দীপিত হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা ইতিহাসের গৌরব বুঝিতেন না, এইরূপ একটা বিলাপধ্বনি সচরাচর শুনা যায়; কিন্তু আমাদের নব্য সম্প্রদায়ের এ বিষয়ে আচরণ অনেক সময় স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনাজনক। পাশ্চাত্য হিসাবে স্বদেশানুরাগ যাহাকে বলে, তাহা বোধ হয় প্রাচীন-কালেও আমাদের ছিল না, এবং একালের শিক্ষাও তাহা হয়ত জন্মাইতে

পারে নাই। মূলে স্বদেশানুরাগের ভিত্তি না থাকিলে স্বদেশের উন্নতি-চেষ্টা কেবল পণ্ডশ্রম; এবং যে জাতির আপনার পুরাতন কাহিনী জানিবার প্রবৃত্তি নাই, তাহার স্বদেশানুরাগের আস্ফালন সর্ব্বতোভাবে উপহাস্য। স্বদেশের উন্নতির জন্য এ দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন, শিল্প-শিক্ষার প্রচার, বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রচার, শিল্পসমিতি স্থাপন প্রভৃতি নানাবিধ উদ্যম দেখা যাইতেছে; কিন্তু সকল উদ্যমই ব্যর্থ ও বন্ধ্য হয়। তাহার মূল কারণ এক। আপনার জাতির অতীত ইতিহাসে যাহার শ্রদ্ধা নাই, সে যেন স্বদেশপ্রিয়তার স্পর্দ্ধা না করে; আপনার জাতিকে যে চেনে না, সে যেন কৃত্রিম স্বদেশানুরাগের আস্ফালন না করে।

"শরীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তীক্ষ্ণ ছুরিকার সাহায্যে মনুষ্যের শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহার কোথায় কি আছে সন্ধান করিয়া দেখেন; এবং সেই অনুসন্ধানে কত নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। কিন্তু সেই শবদেহের প্রতি তাঁহার যে বিশেষ একটা অনুরাগ জন্মে, তাহা বলা যায় না। আপনার কাজটা সারিয়া ফেলিয়াই তাঁহারা বিবিধ ডিস্‌ইন্‌ফেক্টাণ্ট প্রয়োগে আপনার শরীরের অশুদ্ধি ও ছুরিকার অশুদ্ধি ও টেবিলের অশুদ্ধি তাড়াতাড়ি শোধনের জন্য ব্যস্ত হন। দুঃখের বিষয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা হিন্দুজাতির প্রাচীন সাহিত্য ও প্রাচীন ইতিহাস লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহাদের অনেক কার্য্যকে কতকটা এইরূপ শবব্যবচ্ছেদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তাঁহারা এই মৃত জাতির শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহা হইতে নানা তথ্যের আবিষ্কার করিয়া যথেষ্ট আনন্দ বা কৌতুক বোধ করিয়া থাকেন; কিন্তু এই শবদেহের স্পর্শ তাঁহাদের পক্ষে কতটা প্রীতিকর হয়, তাহা বলিতে পারি না।"

আমাদের দেশের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক পণ্ডিতই পাশ্চাত্য

পণ্ডিতদিগের অনুকরণ করিয়া ঐ ভাবে আমাদের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন; তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালীর অনুশীলন করিলে অনেক স্থলেই ঐরূপ শ্রদ্ধাহীন ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের বিশ্বাস, ঐরূপ ভাবে ইতিহাসের চর্চ্চা না করাই ভাল। কারণ শ্রদ্ধাবুদ্ধি-হীন কোন কার্য্যই শুভ ফল প্রদান করে না। শ্রদ্ধাহীনভাবে ইতিহাসের চর্চ্চা করিলে অনেক স্থলে সত্যের অপহ্নব ঘটে, এবং বিকৃত ভাব প্রচারের হেতু সমাজের অনিষ্ট সাধিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দরের ইতিহাসচর্চ্চার ধারা উহার ঠিক বিপরীত ভাবের ছিল। তিনি পরম শ্রদ্ধার সহিত প্রাচীন ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে সার সত্যের আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আধুনিক কৃতবিদ্যগণের মধ্যে যে দুই চারিজন সুধী পুরুষ আপনার জাতিকে চিনিতে চেষ্টা করিয়াছেন, রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

প্রাচীন সভ্যতা আমাদের জাতীয় জীবনের উপযোগী। সেই প্রাচীন সভ্যতার উপর নির্ভর করিয়া আমাদের যাহা কিছু অভাব, আমরা যাহা হারাইয়া ফেলিয়াছি, নবীন সভ্যতার অঙ্গ হইতে আমাদের জাতীয় জীবনের উপযোগী করিয়া তাহা পূরণ করিয়া লইতে হইবে। রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনব্যাপী সাধনার উদ্দেশ্য ছিল তাহাই। প্রাচীন সভ্যতার উপকরণ-গুলি সংগ্রহ করিয়া এই আত্মবিস্মৃত দেশবাসীকে তাহার স্বরূপ বুঝাইয়া দিবার জন্য তাঁহার যত চেষ্টা এবং উদ্যম।

মহাসমরের পর য়ুরোপ তাহার নবীন সভ্যতার সফলতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে; সেই জন্য সে আজ এখানে কাল ওখানে আন্তর্জাতিক বৈঠকের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত রহিয়াছে; কিন্তু কোনখানেই আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারিতেছে না। সে বুঝিয়াছে যে, তাহার অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী নবীন সভ্যতার সাধনা কেবল বিলাস-লালসা ও

স্বার্থরক্ষার জন্য; প্রকৃত মনুষ্যত্বের সাধনার জন্য ফিরিয়া চাহিবারও সে অবসর পায় নাই।

আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ যে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সভ্যতার বিশাল মন্দির গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার সহিত আধুনিক সভ্যতার চমক ও আরামপ্রদ নবনির্ম্মিত মন্দিরের তুলনা হইতে পারে কি? প্রাচীন সভ্যতার মন্দিরের উপর দিয়া ঝঞ্ঝাবাত, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রকৃতির কত নির্য্যাতন ঘটিয়া গিয়াছে, ইতিহাস তাহার সম্যক্ সাক্ষী দিতে পারে না। কত প্রাচীন কাল হইতে কত যুগব্যাপী নির্য্যাতন, কত বিপ্লবের ঝটিকা তাহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তাহা কে নির্ণয় করিবে? নির্য্যাতনের পর নির্য্যাতন, বিপ্লবের পর বিপ্লব সহিয়া এখনও সেই মন্দিরটি আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রকৃতির সহিত এতকাল যুদ্ধ করিয়া মন্দিরটি স্থানে স্থানে জীর্ণ হইয়াছে, তাহার বর্ণও মলিন হইয়াছে, এবং সেই জীর্ণ অঙ্গের সংস্কারসাধনেরও প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা স্বীকার করি; কিন্তু তাহার উন্নত চূড়া এখনও ভূমিতলে লুণ্ঠিত হয় নাই বা তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভগ্নস্তূপে পরিণত হয় নাই। পৃথিবীতে কত সভ্যতার উৎপত্তি এবং কত সভ্যতার বিলোপ এই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার চক্ষের সমক্ষে ঘটিয়াছে, তাহা কে গণনা করিবে? প্রাচীন মিশরীয়, সীরীয়, প্রাচীন আরব্য, পারসিক, প্রাচীন গ্রীসীয়, রোমীয় প্রভৃতি কত সভ্যতার নাম করিব! পৃথিবী হইতে তাহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান নবীন সেই প্রাচীন সভ্যতার ভাববিশেষ মাত্র গ্রহণ করিয়া রহিয়াছে।

আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ কিরূপ মাল মালসা দিয়া এই প্রাচীন মন্দিরটি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, আধুনিক য়ুরোপ এখনও তাহার সন্ধান করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার এত দিনের অতিযত্নের রচিত সুন্দর

মন্দিরটি একটিমাত্র প্রবল ধাক্কায় আমূল কম্পিত হইয়া পতনোন্মুখ হইয়াছিল, নির্য্যাতনের পর নির্য্যাতন সহিবার ক্ষমতা তার কতটুকু? উপর্য্যুপরি দুই চারিটা প্রবল ধাক্কায় তাহা যে একবারে ধূলিসাৎ হইবে না, এ কথা কে বলিতে পারে?

নবীন সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্যে আমাদের নয়ন ঝলসিয়া আছে; আমরা মনে করি, এমন সুন্দর, এমন উজ্জ্বল, এমন গ্রহণীয় এমন অনুকরণ-যোগ্য আর কিছুই নাই। ইহার নিকট সেই মলিন বিবর্ণ পুরাতন জীর্ণ সভ্যতার মূর্ত্তি দাঁড়াইতেই পারে না। এরূপ চিন্তা করিবার জন্য দায়ী কে? দায়ী আমরা—আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী। বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী আমাদের দৃষ্টিশক্তির সীমা-রেখা ঘিরিয়া রাখিয়াছে, বাহিরের কিছু দেখিবার অবসর বা সুযোগ দেয় না। রামেন্দ্রসুন্দর জীবনে সেই সুযোগটুকু খুঁজিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার প্রখরা দৃষ্টিশক্তি বর্ত্তমান শিক্ষার সীমারেখার গণ্ডী ভেদ করিয়া বহুদূরবর্ত্তী বাহিরের দৃশ্যসকল দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার মধ্যে দেখিবার ভাবিবার গ্রহণ করিবার মত যে ভূরি ভূরি বস্তুসকল বিদ্যমান রহিয়াছে তিনি তাহাদের সন্ধান পাইয়াছিলেন। নিপুণ মণিকারের মত তাহাদের মধ্য হইতে উৎকৃষ্ট মণিগুলি সংগ্রহ করিয়া যে মণিমুক্তার মোহন মালা রচনা করিয়াছিলেন, তিনি পড়শীর নিকট তাহা বিলাইয়া দিয়াছেন।

প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ বিশ্বনিয়ন্তার বিশ্বপ্রবাহের জটিল দুর্জ্ঞেয় রহস্যরাজির ভাব বিশ্লেষণ করিয়া জগতের সমক্ষে ধরিয়াছিলেন। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে রামেন্দ্রসুন্দর সেই ভাবরাজি গ্রহণ করিয়া তৎপ্রতি এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান শিক্ষার মোহ তাঁহার চিত্ত-বৃত্তিকে বিচলিত করিতে একবারেই সমর্থ হয় নাই, সুরেশচন্দ্রের ভাষায় বলি, "তাই তিনি প্রতীচ্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধক হইয়াও সেকালের

সাবেক চণ্ডীমণ্ডপের খাঁটি বাঙ্গালী থাকিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন।" আহার পরিচ্ছদ এবং সামাজিক ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন; এমন কি কথোপকথন কালে তাঁহাকে ইংরাজী ভাষায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া কেহ বুঝিতে পারিত না। কথার ছলে, প্রয়োজন না হইলে, একটিও ইংরাজী শব্দ তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইত না। অধুনা ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই কথা কহিবার সময় ইংরাজী ও বাঙ্গালামিশ্রিত একটা খিঁচুরী ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন; ঐরূপে বিদ্যা জাহির করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার একেবারে ছিল না। যে শিক্ষাদ্বারা বাঙ্গালী নিজস্ব ছাড়িয়া রূপান্তরিত হইয়া পড়ে, সেই রূপান্তর আমাদের জাতীয়তার সহিত একবারেই খাপ যায় না, তাহাকে অদ্ভুত উদ্ভটের, উদাহরণস্বরূপ করিয়া তুলে। ব্যক্তিগত হিসাবে সেই শিক্ষা অর্থকরী হইলেও তাহা জাতির পক্ষে, সমাজের পক্ষে এবং দেশের পক্ষে কোনরূপ স্থায়ী মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হয় না। রামেন্দ্রসুন্দর এই ভাবটি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন। আমাদের যাহা কিছু নিজস্ব এবং যাহা কিছু আমাদের সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর, তাহার অনুষ্ঠানে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন, তাই আজ সমগ্র বাঙ্গালা দেশ—সমগ্র বাঙ্গালী জাতি তাঁহার অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে।

স জাতো যেন জাতেন যাতি বংশঃ সমুন্নতিম্।
পরিবর্ত্তিনি সংসারে মৃতঃ কো বা ন জায়তে॥

তাঁহার জন্মগ্রহণে বংশ সমুন্নত হইয়াছিল, তাঁহার জন্মগ্রহণ সার্থক।

ষোড়শ অধ্যায়

মনুষ্যত্বে

পিতা গোবিন্দসুন্দর পুত্র রামেন্দ্রসুন্দরকে বাল্যকাল হইতে প্রতিভাশালী বলিয়া মনে করিতেন। প্রতিভা স্বাভাবিক শক্তি হইলেও শিক্ষা ব্যতিরেকে তাহার বিকাশ হয় না, ইহা তিনি ভালরূপে বুঝিতেন; সেইজন্য তিনি পুত্রের উর্ব্বর ক্ষেত্রে সৎশিক্ষার বীজ বপন করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। পিতা ও পুত্র উভয়ের ঐকান্তিক যত্নে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উত্তর কালে ফল-পুষ্প-পল্লবভূষিত মহামহীরুহে পরিণত হইয়াছিল।

পিতা বালকপুত্রকে নিকটে রাখিয়া গল্পচ্ছলে তাহার মনোরঞ্জনের সহিত নানাবিধ সদুপদেশপূর্ণ প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেন। বালক সর্ব্বপ্রকারে পিতার বাধ্য ছিল। বয়োবৃদ্ধিসহকারে পুত্র পিতা ও পিতৃব্যের স্বভাবের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করে; অল্প কালেই কোমল বাল-স্বভাব মধুর সৌন্দর্য্যগুণে বিভূষিত হইয়া উঠে। উর্দ্ধতন পুরুষের ভবিষ্যৎ আশা, রামেন্দ্রসুন্দরের নিজের চেষ্টা যত্ন অধ্যবসায় ও সাধনার ফলে উত্তরকালে সর্ব্ববিষয়ে সাফল্য লাভ করিয়াছিল। সর্ব্বপ্রকার গুণরাজিতে বিভূষিত হইয়া সেই দেবোপম মানবচরিত্র পরিশেষে বঙ্গদেশের সুধীসমাজকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

সংযম এবং সাধনার দ্বারা মানবচরিত্র কিরূপ উন্নত হইতে পারে, রামেন্দ্রসুন্দরের চরিত্র অনুশীলন করিলে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে।

যে বিদ্যার দ্বারা মানবের মনে অহঙ্কার জন্মে না, সেই বিদ্যা যথার্থ

বিদ্যা ; যে বুদ্ধিতে কপটতার লেশমাত্র নাই, তাহাই শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি ; যে সম্পৎ লোভ নাশ করে, তাহাই প্রকৃত সম্পৎ ; এবং যে শক্তি ক্ষমাশালিনী, সেই শক্তিই যথার্থ শক্তি।

দর্পহীন বিদ্যা, কপটতাশূন্য বুদ্ধি, লোভহীন সম্পৎ এবং ক্ষমাশালিনী শক্তিদ্বারা রামেন্দ্রস্থন্দরের চরিত্র বিভূষিত হইয়াছিল।

রামেন্দ্রস্থন্দরের শান্ত সরল মধুর স্বভাবটির তুলনা হয় না ; কি এক মোহময়ী আকর্ষণী শক্তি তাঁহার চরিত্রে বিরাজ করিত বলিতে পারি না ; তাহার প্রভাবে একবার যে কোন ব্যক্তি তাঁহার সংস্পর্শে আসিত, সেই যেন কোন যাদুমন্ত্রবলে আকৃষ্ট হইয়া বশীভূত হইয়া পড়িত। পরকে আপন করিবার ক্ষমতা তেমনটি আর দেখি নাই। তাঁহার অমায়িক সরল স্বভাব সকলেরই প্রীতি এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। সদ্ভাবপূর্ণ স্থমধুর ও অকৃত্রিম সৌজন্যবলে তিনি সকলের চিত্ত হরণ করিতেন।

রামেন্দ্রস্থন্দরের সরল ও প্রফুল্ল অন্তরের মধ্য হইতে যে স্থধামাখা সুন্দর হাসিটি ফুটিয়া বাহির হইত, তাহার তুলনা কোথায় ? দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিলে লোকের মনে শান্তিস্থখ নষ্ট হয়, এবং সর্ব্বদা বিরক্তির ভাব জাগিয়া উঠে ; কিন্তু রামেন্দ্রস্থন্দরের মুখে বিরক্তির পরিবর্ত্তে সর্ব্বদা হাসিখানি ফুটিয়া উঠিত। সেরূপ হাসি আর কখন কাহাকেও হাসিতে দেখি নাই। তাঁহার সেই সরল হাসিদ্বারা সকল প্রকার বৈষম্যের ভাব দূর হইত। তাঁহার মনের উচ্চ ভাবসকল সেই হাসির মধ্যদিয়াই ফুটিয়া বাহির হইত ; সেই হাসি দেখিয়া মনে হইত, তাঁহার চিত্ত যেন ইহজগতের প্রশংসা বা নিন্দার কত উর্দ্ধ দেশে বিচরণ করে। তাই কবি বলিয়াছেন—"হে রামেন্দ্রস্থন্দর, তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর।"

রামেন্দ্রসুন্দর নির্ম্মৎসর ও নিরহঙ্কার ছিলেন ; যিনি একবার কর্ম্মসূত্রে তাঁহার সংসর্গে আসিয়াছেন, তিনি তাঁহার সেই সরল, উদার ও বিনয়ভূষিত চরিত্রের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। জাপানী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আর, কিমুরা তাঁহার চরিত্রমাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া একবারে চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর সর্ব্বদা আপনাকে একবারে ভুলিয়া থাকিতেন। তিনি নিজে যে কত বড় পণ্ডিত ছিলেন, এ কথা তাঁহার মনেই হইত না। তিনি যে কিছু করিয়াছেন, এবং কোন বিষয়ে যে তাঁহার বিশেষ কিছু কৃতিত্ব আছে বলিয়া তিনি কখনও স্পর্দ্ধা করিতেন না। আত্মপ্রশংসায় তাঁহার যেমন বিরাগ, পরের প্রশংসা করিতে তেমনই অনুরাগও ছিল।

তাঁহার লিখিত দার্শনিক প্রবন্ধগুলি জার্ম্মান ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন—"স্বদেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণের নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ শিখিয়াছি, সাধারণের বোধগম্য ভাষায় তাহা প্রকাশ করিবার চেষ্টা ব্যতীত আমার অন্য কোনরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা নাই। প্রবন্ধগুলির মধ্যে আমার নিজের কোন কৃতিত্ব আছে বলিয়া কখনও কোন স্পর্দ্ধা আমার মনে উপস্থিত হয় নাই।"

রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার অহমিকাশূন্য সরলতাপূর্ণ অমায়িক ব্যবহারে সহকর্ম্মীদের চিত্তহরণ করিয়াছিলেন। বিদ্যা বিনয়ং দদাতি এ কথার সার্থকতা তাঁহার চরিত্র আলোচনা করিলে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি হইবে। সেই "বিদ্যার জাহাজ" যেন বিনয়ের একটি প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন। তিনি মনে কখন এরূপ ক্রোধের ভাব পোষণ করিতেন না, যাহা জীবনে কখন কাহার অনিষ্ট সাধন করিয়াছে ; বিশেষ বিরক্তিকর বিষয়ে জড়িত হইয়া পড়িলেও কখন ধৈর্য্যচ্যুত হইতেন না। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরল হাসিটি এ বিষয়ে তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ ছিল। তাই কবি বলিয়াছেন—

"দুঃসাধ্য কার্য্যে তুমি অক্রোধদ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্য্যের দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ।"

রামেন্দ্রসুন্দর অতি শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন; কোন প্রকার বিবাদ বিসংবাদ বা দলাদলির মধ্যে প্রবেশ করিতে ভালবাসিতেন না। জাপানী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আর কিমুরা তাঁহার শান্তিপ্রিয়তার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"শিক্ষাদাতা রামেন্দ্রসুন্দর আমার শান্তিদাতা ছিলেন। প্রথম সাক্ষাতের পরই তাঁহার প্রীতিময়ী প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া আমার মনে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। আমার মনে চঞ্চলতা উপস্থিত হইয়া যখন উহা অশান্তিময় হইয়া উঠিত, তখন তাঁহার মুখের দুটো সান্ত্বনার কথা শুনিতে শান্তিলাভ করিতাম। যখন তাঁহার নিকট যাইতাম, তিনি হাস্যমুখে বড় আদর করিয়া কাছে বসাইতেন—যেন চিরপরিচিত। শান্তভাবে কত গল্প করিতেন—যেন কতদিনের আত্মীয়তা। একবার দীর্ঘকাল রোগে পড়িয়া বড় অশান্তি ভোগ করিয়াছিলাম; সেই জন্য সেবারে কিছু দিন প্রায় প্রত্যহ উঁহার কাছে গিয়া বসিতাম। এক দিন তিনি বলিয়াছিলেন—'কি কিমুরা সাহেব কোন কাজ আছে?' বাস্তবিক আমার কোন কাজ ছিল না, কি উত্তর দিব? বড়ই অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম; মনে করিলাম, কেন প্রত্যহ ইঁহাকে বিরক্ত করিতে আসি? পরক্ষণে বলিলাম—কাজ ত' কিছুই নাই, আপনাকে দেখ্‌তে এসেছি, অসুখের জন্য বড় চঞ্চল হ'য়ে, পড়েছি, আপনার নিকট একটু শান্তিলাভ কর্‌তে এসেছি। রামেন্দ্রসুন্দর বড় আনন্দিত হ'য়ে বল্‌লেন—'এখানে আস্‌লে কি আপনার শান্তি হয়?' হাঁ, আপনার শান্ত মুখ দেখ্‌লে হৃদয়ে বড় শান্তি পাই। আনন্দোচ্ছ্বাসে তাঁহার চোখে জল আসিয়াছিল, আমার বেশ মনে আছে—আর তিনি যে উত্তর

দিয়াছিলেন, তাহা আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। তিনি বলিয়াছিলেন—'কিমুরা মহাশয়, আমাদের দেশ দরিদ্র হ'লেও সেই শান্তির ভাবটা এখনও রয়েছে।' প্রাচীন ভারতের স্মৃতিচিহ্ন ঐ রকম দুই একটা ভাবের মধ্যেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়।"

হিংসা-দ্বেষবিরহিত শান্ত-রসাস্পদ তপোবনে বসিয়া ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ জ্ঞান, ধর্ম্ম ও কর্ম্মের সাধনা করিতেন, সেখানে হিংসাপূর্ণ জীবন-সংগ্রামের কোলাহল পৌঁছিত না। সেই মহাপুরুষের ক্ষুদ্র গৃহটিতে সর্ব্বদা তপোবনের ন্যায় অনাবিল শান্তি ও আনন্দ বিরাজ করিত; সেখানে জ্ঞান কর্ম্মের চর্চ্চা হইত; জীবনসংগ্রামের কোলাহল পৌঁছিত না।

রামেন্দ্রসুন্দরের স্বভাব একবারে মধুমাখা ছিল। সেই মাধুর্য্যধারায় তিনি বন্ধুজনের চিত্ত অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। 'ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু,' প্রাচীন ঋষিগণ সমস্ত পৃথিবীকে মধুময় দেখিতে শিক্ষা দিয়াছেন। সেই আর্য্য ঋষিদিগের সন্তান রামেন্দ্রসুন্দরও সমস্ত পৃথিবীকে মধুময় দেখিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রাচীন ঋষিগণ এই আধি-ব্যাধি-জরা-মরণ-সঙ্কুল সহস্রবিধ শোকদুঃখপূর্ণ জগৎটাকে আনন্দময় জগৎ বলিয়া প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; সেই শিক্ষার অনুবর্ত্তী হইয়া রামেন্দ্রসুন্দরের অন্তরও নানাবিধ শোকদুঃখের মধ্যদিয়া আনন্দের সন্ধান পাইয়াছিল। সেই আনন্দের মূর্ত্তি তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্যের মধ্যদিয়া ফুটিয়া বাহির হইত।

তিনি যে এতকাল বাঁচিয়া ছিলেন, ইহাই তাঁহার আর একটি আনন্দের বিষয় ছিল। অধিক দিন বাঁচিব না, এরূপ ধারণা তাঁহার ছিল। তাঁহার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন পুরুষগণ কেহই দীর্ঘজীবী ছিলেন না। সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কখনও দীর্ঘ জীবনের আশা তিনি করিতেন না। পিতৃপুরুষদিগের বয়স অতিক্রম করিয়া তিনি

বড় আনন্দ প্রকাশ করিতেন। পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়স অতিক্রম করিলে সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া তিনি তাঁহার স্বজনগণের নিকট আনন্দের সহিত বলিয়াছিলেন—"আমিই সকলের চেয়ে বেশী দিন বাঁচ্‌লাম এবং আজ্‌কার দিনে ইহাই আমার একমাত্র আনন্দের কারণ।"

হৃদয়ে মধুর বৃত্তির অনুশীলন করিয়া তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন। যে সকল গুণ থাকিলে শত্রুকে মিত্রে পরিণত করিতে পারা যায়, তাঁহার অন্তঃকরণে সেই সব গুণ প্রচুর পরিমাণে বিরাজ করিত। তাঁহার কেহ শত্রু ছিল না—তিনি অজাত-শত্রু ছিলেন।

জেমোর নূতন বাড়ীর পরিবারগণ অর্থাৎ রামেন্দ্রসুন্দরের পূর্ব্বজগণ সৌভ্রাত্রের পবিত্র আচরণে জীবন মধুময় করিয়াছিলেন, এবং সেই কারণে তাঁহারা ভ্রাতৃ-প্রেমের আদর্শরূপে গণনীয়। তাঁহাদের সেই পবিত্র পদাঙ্ক রামেন্দ্রসুন্দর ও তাঁহার অনুজগণ অনুসরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

১৩২৫ বঙ্গাব্দে পৌষ মাসে পুত্রহীন রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার স্নেহের কনিষ্ঠা কন্যাকে হারাইয়া শোককাতর অন্তরে দিন যাপন করিতেছিলেন। তাঁহার সেই শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিবার জন্য রিপন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটের বাড়ীতে যান। রামেন্দ্রসুন্দর তখন বাহিরের ঘরে বসিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পার্শ্বে শায়িত শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস ত্রিবেদীকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"উনি কে?" বলা বাহুল্য দুর্গাদাস ত্রিবেদী তখন উত্তরীয় বস্ত্রে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর বলিলেন—"উনি আমার কনিষ্ঠ—না না, আমার জ্যেষ্ঠ—না না, আমার পিতা। পিতার স্নেহময় কোলে আশ্রয় পাইয়া মানুষ যেমন পর্ব্বতের আড়ালে বাস করে, আমিও তেমনই আমার সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে, আনন্দে শোকে নিরন্তর উঁহার সাহায্য

লাভ করিয়া পর্ব্বতের আড়ালেই বাস কর্ছি। উনি স্নেহবারিসিক্ত পক্ষপুটে আবৃত ক'রে সংসারতাপদগ্ধ আধি-ব্যধি-ক্লিষ্ট এই দুর্ব্বল দেহকে রক্ষা করে আস্ছেন। আমার সকল শোক সকল বিপদের বোঝা নিজে মাথা পেতে বহন কর্ছেন। ঐরূপ সাহায্য না পেলে আমি এই রোগজীর্ণ দুর্ব্বল দেহ ও দুর্ব্বল মস্তিষ্ক নিয়ে এতদিন কখনও ঠিক্ থাক্‌তে পার্তাম না, বোধ হয় পাগল হ'য়ে পড়্তাম কিংবা আপনাদের দৃষ্টি পথ হ'তে চিরতরে বহুদূরে চ'লে যেতাম।"

রামেন্দ্রসুন্দর যেন মাটির মানুষ ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিটি বালকের ন্যায় কোমল ছিল; আত্মীয়স্বজনের বিয়োগে অতি অল্পেই তাহা গলিয়া পড়িত। ষোড়শ বর্ষ বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়; সেই শোকে তিনি বড় আকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন, এমন কি কয়েক মাস লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া উদাসভাবে দিন কাটাইয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধিসহকারে জ্ঞানবৃদ্ধির হেতু ও উপর্য্যুপরি অনেকগুলি শোকের আঘাত সহিয়া তাঁহার হৃদয়খানি শেষে ঘাতসহ হইয়া উঠিয়াছিল।

তাঁহার একান্ত প্রীতির পাত্র সহকর্ম্মী ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় স্বর্গারোহণ করিলে সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে তাঁহার সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিবার সময় অশ্রু-প্রবাহ তাঁহার গণ্ডস্থল অভিষিক্ত করিয়াছিল। আর একবার তাঁহার সতীর্থ অন্তরঙ্গ বন্ধু ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিয়োগে তাঁহাকে অশ্রুপাত করিতে দেখিয়াছি। প্রাণ খুলিয়া প্রীতির পাত্রকে ওরূপ ভালবাসিতে কখন দেখি নাই। সেই প্রাণভরা ভালবাসায় আঘাত পড়িলে, সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয় যে গলিয়া পড়ে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তিনি ভালবাসিতে জানিতেন, তাই তাঁহার হৃদয়খানি অল্পেই অভিভূত হইত।

অনেকে মনে করিতেন, রামেন্দ্রসুন্দর অতি গম্ভীর প্রকৃতির লোক

ছিলেন ; কিন্তু সকল ক্ষেত্রে আমরা উহা স্বীকার করিতে পারি না। যে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের হেতু হৃদয়ের কর্কশতা ভাষায় ও ভাবে ফুটিয়া বাহির হয়, সেরূপ গাম্ভীর্য্য তাঁহার ছিল না। না বুঝিয়া চঞ্চলপ্রকৃতি লোকের মত হঠাৎ একটা কিছু করিয়া ফেলা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। সকল বিষয়েই তিনি ধীরভাবে চিন্তা করিয়া বুঝিয়া কার্য্য করিতেন ; তাহাতে অনেকে তাঁহাকে নীরস গম্ভীরপ্রকৃতি লোক বলিয়া ধারণা করিত সত্য। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে যে সরস মধুময় ভাব ঢালা ছিল, যে কোন ব্যক্তি তাঁহার সংসর্গে আসিয়াছেন, তিনি তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার কলেজের নিম্নশ্রেণির ছাত্রগণ তাঁহাকে গম্ভীরপ্রকৃতির লোক বলিয়া ভয় করিত, এবং উচ্চশ্রেণির ছাত্রগণ চরিত্র-মাধুর্য্যে তাঁহাকে ভক্তি করিত। তিনি যখন তাঁহার বন্ধুদিগের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতেন, তখন তাঁহাকে গম্ভীরপ্রকৃতি বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ থাকিত না। তেমন সরসতা, তেমন হাসি, তেমন আনন্দ গম্ভীর-স্বভাবের নিকট দেখা যায় না। কৃত্রিমতার লেশহীন অনাবিল স্বভাবসিদ্ধ সরসতা নীরস কর্কশ গাম্ভীর্য্যের কলঙ্ক হইতে তাঁহাকে মুক্ত রাখিয়াছিল। তাঁহার কথিত প্রত্যেক প্রসঙ্গে ও রচিত প্রত্যেক প্রবন্ধে সরস ভাব বিদ্যমান। সেই সরসতাগুণে দর্শন ও বিজ্ঞানের কুটিলতা সরল এবং কর্কশতা স্নিগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। অতি কঠোর কর্কশ বিষয়গুলি সরলভাবে বুঝাইবার ক্ষমতা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। লেখনী ধারণ করিলে তাঁহার অন্তরের সরসতা স্বতঃই উথলিয়া উঠিত।

তিনি অতি চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন ; কোন বিষয়ে চিন্তা করিবার সময় তিনি একবারে তন্ময় হইয়া পড়িতেন, তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। এক দিন জামাতা শীতলচন্দ্রের সহিত সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় গাড়ীতে উঠিয়া তিনি চক্ষু মুদিয়া নীরবে বসিয়াছিলেন।

তাঁহার তৎকালীন মুখভাব দর্শন করিয়া শীতলচন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন,—"গাড়ীতে আস্‌তে আপনি মাথায় কোন যন্ত্রণা বোধ কর্‌ছেন কি ?" তিনি নিদ্রোত্থিতের ন্যায় চক্ষু মেলিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"না, কোন কষ্টই বোধ কর্‌ছি না।" শীতলচন্দ্র বলিলেন—"আপনি প্রতিদিন রবার টায়ারওয়ালা গাড়ীতে যাওয়া আসা করেন, আজ থার্ড ক্লাসের ঠিকা গাড়ীতে আস্‌ছেন, গাড়ীর ঝাঁকানিও বড় কম নয়, আপনার মুখের ভাব দেখে আমি মনে কর্‌লাম্ গাড়ীর ঝাঁকানিতে আপনার কষ্ট হচ্ছে।" এই কথা শুনিয়া তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন—"তাই নাকি ? থার্ড ক্লাসের গাড়ী ব'লে আমার কিছুই মনে হয় নি।"

তাঁহার অন্তরে হিংসা, বিদ্বেষ, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা প্রভৃতির স্থান ছিল না। কাহারও সহিত ঝগড়া বিবাদ করিবার প্রবৃত্তিও তাঁহার ছিল না। তিনি কোনরূপ দলাদলির মধ্যে যোগদান করিতেন না। কর্ম্ম-সূত্রে দলাদলির মধ্যে পড়িলে ন্যায়পক্ষ অবলম্বন করিয়া সাধ্যমত তাহার মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, সাধ্যাতীত হইলে সে ক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইতেন। পেড্‌লার সাহেব যখন শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টার ছিলেন, তখন তিনি রামেন্দ্রসুন্দরকে 'সেণ্ট্রাল টেক্‌স্‌ট্ বুক কমিটির' সদস্যপদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করেন ; কিন্তু তৎকালে উক্ত ক্ষেত্রে পুস্তক বিশেষের মতামত লইয়া অনেক সময় শান্তিভঙ্গের উপক্রম হইত জানিয়া তিনি ঐ পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই।

রামেন্দ্রসুন্দরের মনের বল খুব বেশী ছিল ; দেহটি দুর্ব্বল হইলেও মনটি ঠিক্ তদনুরূপ ছিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, না বুঝিয়া হঠাৎ কোন কার্য্য তিনি করিতেন না। যখন তিনি কোন মত ব্যক্ত করিতেন, খুব দৃঢ়তার সহিত তাহা পোষণ করিতেন ; অনেকের নিকট সময়ে সময়ে তাহা একগুয়েমি বলিয়া প্রতিভাত হইত। প্রথমে ভাল করিয়া

বুঝিয়া, পরে তাহার উপর জোর দিতেন বলিয়া ঐ ভাব প্রকাশ পাইত।

একবার তিনি ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পরীক্ষার উপযোগী একখানি ভূগোল রচনা করিয়া 'টেক্‌স্ট্‌ বুক কমিটিতে' মঞ্জুর করিবার জন্য দিয়াছিলেন। কমিটির তদানীন্তন সদস্যগণ তাঁহাকে ঐ গ্রন্থখানির স্থানবিশেষ পরিবর্ত্তন করিয়া দিবার জন্য পরামর্শ দেন। রামেন্দ্রসুন্দর কমিটির সহিত একমত হইতে পারেন নাই; তিনি নিজে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার উপর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাহার পরিবর্ত্তন করা উচিত বোধ করেন নাই। স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অথবা অপরের অনুরোধে তিনি সে ক্ষেত্রে অন্যায়ের পোষকতা করিতে পারেন নাই। সে সময় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। পুস্তকখানি পরিবর্ত্তিত আকারে পুনরায় দাখিল করিতে কোন আপত্তি আছে কি না, তাহা তিনি জানিতে চাহেন। রামেন্দ্রসুন্দর স্বীয় মতের স্বপক্ষে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করেন। বলা বাহুল্য গ্রন্থকার পুস্তকখানি কমিটির নিকট আর দাখিল করেন নাই।

এক প্রকার অভিমত তিনি চিরকাল পোষণ করিতেন না। বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত তাঁহার মতেরও ক্রমিক পরিবর্ত্তন ও পরিপুষ্টি ঘটিত, তাহা স্পষ্টভাবে স্বীকার করিতে তিনি কখন কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। পরিবর্ত্তনশীল বহিঃপ্রকৃতির সহিত আমাদের সজীব দেহ যেমন সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতেছে, আমাদের সজীব বুদ্ধিবৃত্তিও সেইরূপ বহিঃপ্রকৃতির সমঞ্জস হইয়া থাকে। বহিঃপ্রকৃতির পরিবর্ত্তনের সহিত তাঁহার আন্তরিক ভাবেরও পরিবর্ত্তন ঘটিত, ইহা আমরা অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। নিজের ভুল বুঝিতে পারিলে তিনি সেই ভুল মত বজায় রাখিবার জন্য অন্যায় চেষ্টা করিতেন না।

রামেন্দ্রসুন্দর জীবনে কখন কাহারও তোষামোদ করেন নাই। চাটু-বৃত্তিকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি যে উন্নত মস্তক লইয়া সংসারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহা সমান ভাবে উন্নত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ স্বার্থের জন্য সেই উন্নত মস্তক কাহারও নিকট তিনি অবনত করেন নাই। স্বার্থত্যাগ-রূপ নিকষের অঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের বিশুদ্ধতার গৌরব প্রকটিত হইয়াছিল।

তিনি তোষামোদের বিরোধী ছিলেন, সেইজন্য তোষামোদকারী দিগকে পছন্দ করিতেন না। তোষামোদের দ্বারা কেহ কখন তাঁহার নিকট হইতে কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইতে পারিত না। চাটুবৃত্তিপরায়ণ দুই চারিজন লোক তাঁহার নিকট স্বভাবসিদ্ধ তোষামোদের পরিচয় দিয়া আশায় বঞ্চিত হইয়াছিল, এইরূপ প্রমাণ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সঙ্গত কার্য্যের প্রস্তাব তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র সাধ্যায়ত্ত হইলে তিনি তাহা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত যত্ন করিতেন, অসাধ্য হইলে নিরস্ত হইতেন; তাহার জন্য কাহারও তোষামোদ করিবার প্রয়োজন হইত না। কর্ম্মক্ষেত্রে অধ্যাপক, শিক্ষক, ছাত্র বা অধীন কর্ম্মচারিগণ সকলেই নিজ নিজ কার্য্য করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইত। প্রিন্সিপালকে উপরি-ওয়ালাকে তোষামোদের দ্বারা তুষ্ট রাখিবার কোন আবশ্যকতা আছে, একথা কাহার মনে উদিত হইত না। তাঁহার সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি কর্ম্মসাধনের উপর নির্ভর করিত—তোষামোদের উপর নহে।

সর্ব্বপ্রকার কুটিলতা তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিত। স্বকার্য্য সিদ্ধির জন্য তিনি জীবনে কখন কুটিল পন্থা অবলম্বন করেন নাই; সেজন্য কার্য্য পণ্ড হইলেও তিনি দুঃখিত হইতেন না। অপরকেও কুটিল পন্থা অবলম্বন করিবার জন্য প্রশ্রয় দিতেন না; কুটিলতাকে তিনি অন্তরের

সহিত ঘৃণা করিতেন; সরল সত্যে নিষ্ঠা তাঁহাকে কুটিলতার কলিমা হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

রামেন্দ্রসুন্দর বড় গুণগ্রাহী ছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎমন্দিরে প্রবেশ করিয়া তিনি অনেক গুণশালী-ব্যক্তির সংস্রবে আসিয়াছিলেন। বাণীর বর পুত্রদিগের সহিত মিশিতে পাইয়া তাঁহার আনন্দের অবধি ছিল না; তিনি নিজেকে ধন্য মনে করিতেন। তাঁহার অন্তঃকরণ যেমন তোষামোদ-কারীদিগের সহস্র তোষামোদে বিচলিত হইত না, পক্ষান্তরে কিন্তু গুণশালী ব্যক্তিগণের গুণগৌরব-প্রভায় তাহা সহজেই অবনমিত হইত। ঐ গুণের প্রভাবে তিনি অনেক শক্তিশালী ও গুণশালী লেখককে বাঙ্গালার সাহিত্য ক্ষেত্রে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। যাদুকর যেমন যাদুমন্ত্র-বলে মোহের সৃষ্টি করিয়া মানুষকে বশীভূত করিয়া ফেলে, তিনিও সেইরূপ তাঁহার মোহময়ী আকর্ষণী শক্তিপ্রভাবে অনেক শক্তিশালী ব্যক্তিকে বশীভূত করিয়াছিলেন। যিনি একবার তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে পাদক্ষেপ করিয়াছেন, সেই পথ হইতে তাঁহাকে কখন প্রতিনিবৃত্ত হইতে দেখি নাই। সেই পথে চলিতে চলিতে কোন ব্যক্তি স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিলে অমনই তিনি শতমুখে তাঁহার প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার অন্তরে প্রবল উৎসাহের সঞ্চার করিয়া দিতেন।

রিপন কলেজের গণিতশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ৺ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রামেন্দ্রসুন্দরের সহপাঠী ও প্রিয় সুহৃৎ ছিলেন। কাব্যসাহিত্যের প্রতি তাঁহার কিছু মাত্র শ্রদ্ধা ছিল না—বিশেষতঃ বাঙ্গালা কাব্যের প্রতি। কাব্যের আলোচনা আরম্ভ হইলে তিনি উপহাসচ্ছলে বলিতেন—'কি হে, তোমাদের পয়ার হ'চ্ছে না কি?' সেই ক্ষেত্রমোহনই এক দিন রামেন্দ্রসুন্দরের অনুরোধে পড়িয়া রবীন্দ্রনাথের "পতিতা" কবিতাটি পাঠ করেন। সেই অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সুমিষ্ট ঔষধটি গলাধঃকরণ করিয়া

তাঁহার ব্যাধির উপশম হইল, তিনি মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন, এমন কি একখানি বেনামী চিঠি তিনি রবীন্দ্রনাথের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য সাহিত্যটা বেশ আয়ত্ত করিয়া লইলেন। গণিতশাস্ত্রের সেই গোঁড়া অধ্যাপক শেষে রামেন্দ্রসুন্দরের প্ররোচনায় দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। সেই আলোচনার ফলস্বরূপ দার্শনিক প্রবন্ধগুলি তাঁহার বন্ধুবরের উপদেশক্রমে "মানসীর" অঙ্কে "অভয়ের কথা" নামে প্রকাশিত হইল।

পরের গুণকীর্ত্তনে রামেন্দ্রসুন্দর যেমন সহস্রমুখ ছিলেন, নিজের প্রশংসাবাদে তিনি সেইরূপ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেন। বড়কে বড় বলিয়া মানিয়া লইবার ক্ষমতা তেমনটি আর দেখি নাই।

একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে কতিপয় বিষয়সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক হয়। তাহার দুই দিন পরে ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রামেন্দ্রসুন্দরের বাড়ীতে উপস্থিত হন। ভক্ত শিষ্য যেমন তাহার গুরু-দেবের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে, আমরা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি রামেন্দ্রসুন্দরকে সেইরূপ ভক্তি প্রদর্শন করিতে দেখিলাম। তিনি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে কোথায় বসিতে বলিবেন, তাঁহার প্রতি কিরূপ সৌজন্য প্রকাশ করিবেন, তাহা যেন খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। সেই ভাব উপলব্ধি করিয়া গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের যেন তখন একটু সঙ্কোচের ভাব দেখা দিয়াছিল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আসন গ্রহণ করিয়া দুই একটা প্রসঙ্গের পর বলিলেন—"সে দিন সেনেটে যে তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল, আপনি তাহাতে অন্তরে একটু আঘাত পাইয়াছেন বলিয়া মনে করি। আপনার অন্তরে আঘাত দেওয়া আমার অভিপ্রায় ছিল না, কার্য্যগতিকে ঐরূপ হইয়া পড়িয়াছে, আমি তাহাতে লজ্জিত এবং দুঃখিত হইয়াছি। আশা করি আপনি আপনার উদার অন্তঃকরণকে

ব্যথিত করিয়া তুলিবেন না।" রামেন্দ্রসুন্দর সেই অপ্রত্যাশিত শিষ্টাচারে বিস্মিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। পরক্ষণে তিনি আসন হইতে উঠিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"এই সামান্য কারণের জন্য আপনার এখানে কষ্ট করিয়া আসিবার প্রয়োজন ছিল না, ডাকিয়া পাঠাইলে আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইতাম। আপনি আমার পিতৃতুল্য পূজনীয় ব্যক্তি, আপনার কথা আমরা মাথা পাতিয়া স্নেহের তিরস্কাররূপে গ্রহণ করি। সে দিন এমন কোন কথা হয় নাই, যাহার জন্য আমার মনে কোন আঘাত লাগিতে পারে এবং সেই জন্য আপনার কষ্ট স্বীকার করিয়া এতদূর আসিবার প্রয়োজন হইতে পারে।" বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উঠিয়া যাইবার সময় রামেন্দ্রসুন্দর আবার তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া শিষ্টতা প্রদর্শন করেন। পরদিন রামেন্দ্রসুন্দর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে উভয়ের কিরূপ আলাপ হইয়াছিল, তাহা আমাদের জানিবার সুবিধা হয় নাই।

রামেন্দ্রসুন্দর কেবল গুণগ্রাহী ছিলেন না; তিনি বিপন্ন ব্যক্তিগণের সাহায্য করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। তাহার উদাহরণ স্বরূপ আমরা শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রবন্ধের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিলাম। "কুমিল্লা রাণীর দীঘির পাড়ে একটা খড়ো ঘরে আমি রোগের শয্যায় প'ড়ে বড় কষ্টে সময় যাপন করিতেছিলাম। ডাক্তারগণ বলিয়াছিলেন, আমি আর ভাল হব না। * * * এই নিদারুণ চিত্র ভবিষ্যতের সম্মুখে দেখিয়া আমি ভীত ও কাতর ভাবে মৃত্যুর কামনা করিতেছিলাম। * * * শীতের প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া, সারারাত্রি অনিদ্রা ও নৈরাশ্যের পরে এক দিন আমি মানসিক উৎকণ্ঠা দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলাম, এমন সময় ডাক পিয়ন আসিয়া এক সুদীর্ঘ পত্র আমার হাতে দিয়া গেল, পত্রখানি রামেন্দ্র বাবুর। আমি তখনও

তাঁহাকে দেখি নাই, কিন্তু এই অ-দৃষ্ট ব্যক্তির আশ্বাসবাণী আমার নিকট যেন অ-দৃষ্টের আকাশ হইতে ঘনঘটা দূর করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য স্বর্গের জ্যোতিঃ দেখাইয়া দিল। তারপর কলিকাতায় আসিলাম, তখন কত দিন শয্যাপার্শ্বে আমার চিরপ্রফুল্ল বন্ধুর মুখখানি দেখিয়াছি। তাঁহার উৎসাহ আশ্বাস শুধু মুখের কথায় ব্যয় হয় নাই, তিনি যে পর্য্যন্ত পরের কষ্ট দূর করিতে না পারিয়াছেন, সে পর্য্যন্ত ব্যথিত থাকিয়াছেন। তিনি আমার সে সময়ের দুরবস্থা দেখিয়া দ্বারে দ্বারে আমার জন্য ভিক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু কি করিয়াছেন, তাহা আমাকে জানিতে দেন নাই। তাঁহার এই সুগভীর আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বের ফলে আমি কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমারকে পাইলাম, লালগোলার রাজা বাহাদুরকে পাইলাম। আমি যে কয় বৎসর রোগাক্রান্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য ও জড়বৎ পড়িয়াছিলাম, সে কয় বৎসর আমি তাঁহাকে ঘন ঘন আমার বাড়ীতে পাইয়াছি। আজ অমুক এত টাকা দিয়াছেন, কাল কোন সহৃদয় ব্যক্তি আমার জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন, রামেন্দ্র বাবু প্রফুল্ল মুখে আমাকে আসিয়া প্রায়ই এই সংবাদ দিতেন। তখন মনে হইত, রামেন্দ্র বাবুকে উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান্ আমাকে সহায়তা করিতেছেন। সে সকল দিনের কথা মনে হইলে, আজও আমার চক্ষু সজল হয়। হে বন্ধুবর, তুমি আমার প্রকৃত বন্ধু ছিলে। যখন হইতে আমার রোগ ভাল হইল, তখন হইতে তোমার শুভাগমন বিরল হইতে লাগিল। সুখের সময় আমি তোমাকে তেমন করিয়া পাই নাই, কিন্তু দুঃখের সময় তোমার সহৃদয়তা, তোমার গভীর স্নেহ আমি হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে অনুভব করিতেছি।”

অনুগতবাৎসল্য রামেন্দ্রসুন্দরের হৃদয়ে অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি অনুগত ভক্তজনকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। গুণমুগ্ধ শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন গুপ্তকে তিনি পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। তারাপ্রসন্ন সর্ব্বদা

নিকটে রহিয়া তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন করিতেন। যোগেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একটি যুবক তাঁহার বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তিনি সদাসর্ব্বদা রামেন্দ্রসুন্দরের নিকট যাতায়াত করিতেন এবং দর্শনশাস্ত্রসম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। যোগেশ চন্দ্রকে দর্শনশাস্ত্রে শিক্ষা দিতে তিনি আনন্দ বোধ করিতেন।

এক দিন ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষ নামক একটি নয় বৎসর বয়সের অনাথ বালক মধুসূদন গুপ্ত লেনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সেই বালককে দর্শন করিয়া রামেন্দ্রসুন্দরের অন্তরে করুণার সঞ্চার হইল; পরিচয় লইয়া তিনি জানিতে পারিলেন, যশোহর জেলার বাঘডাঙ্গা গ্রামে তাহার বাড়ী, অনাথ বালক বিপদে পড়িয়া নিরাশ্রয় অবস্থায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রামেন্দ্রসুন্দর বালকের হস্তে অর্থ দিয়া তাহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দেন এবং তথায় তাহার পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। কিছু কাল পরে ব্রজেন্দ্রনাথ বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে বলে, সে অতি দরিদ্র, তাহার পড়িবার আর সুবিধা হইতেছে না, তাহাকে একটা কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলে ভাল হয়। অতঃপর তিনি তাহাকে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জমীদারী শিলাইদহে একটি কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। কিছু কাল পরে লাহা বাবুদের যশোহর জেলাস্থ জমীদারীতে তাহার প্রার্থনা মত একটী কার্য্য স্থির করিয়া দেন। শুনিতে পাই সেখান হইতে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ আবার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়দিগের জমীদারীতে রামেন্দ্রসুন্দরের কৃপায় কর্ম্মে নিযুক্ত হন।

বীরভূম জেলার মহম্মদ ইস্‌মাইল্ নামক এক ছাত্র ইংলণ্ডের লীড্‌স্ সহরে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছিলেন। তিনি তথায় অর্থাভাবে বিপন্ন হইয়া পত্রযোগে রামেন্দ্রসুন্দরের শরণাগত হন, তাঁহার দুরবস্থার বিষয়

অবগত হইয়া রামেন্দ্রসুন্দর করুণাকোমল প্রাণে ব্যথা অনুভব করিলেন এবং তাঁহার দুঃখমোচন করিবার উদ্দেশ্যে কিঞ্চিৎ অর্থ তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। সেই অর্থ পাইয়া মহম্মদ ইস্‌মাইল তাঁহাকে যে পত্র দিয়াছিলেন; তাহার অনুরূপ নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

34, College Road,
Leeds.
28-7-09.

My Dear Gurudeb,

With proper regards I acknowledge the receipt of your kind aid of Rs 300/-. It has come to me in time of sore need. Had it been a week later, I would have been in a most disgraceful condition. I left unpaid the the cost of apparatus and other laboratory expenses for the last session and the college closes next Saturday altogether till the middle of September. It is needless to mention that I owe you lifelong debt, you are good enough to say, that I owe you no thanks, but it is beyond me to thank you sufficiently for the kindness shown to me. I shall then reverence you as my Guru or one who is like my own father * * *.

I remain, Sir,
your evergrateful pupil,
Sd/ M. Ismail.

বহু দূর দেশে নিঃসঙ্গ অর্থহীন অবস্থায় পড়িলে যে কিরূপ বিপদগ্রস্ত হইতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইংলণ্ড হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া ইস্‌মাইল সাহেব রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতি যেরূপ ভক্তি প্রদর্শন করিতেন, তাহা দেখিবার বিষয়।

পরোপকারসম্বন্ধে আমরা রামেন্দ্রসুন্দরের বাল্য জীবনের একটি ক্ষুদ্র কার্য্যের কথা উল্লেখ করিতেছি। জেমোর নূতন বাড়ীর উত্তর-পশ্চিম প্রান্তস্থিত পল্লী অঞ্চলে কয়েক ঘর দরিদ্র বাউড়ীজাতীয় লোক বাস করে। উহারা সকলেই শ্রমজীবী। কেহ কেহ শিবিকা বহন করিয়া দিনপাত করে। ঐ দরিদ্র পল্লীমধ্যে এক জন অন্ধ বাস করিত, তাহার নাম ধন বাউরী। তাহার পরিশ্রম করিয়া জীবিকা উপার্জ্জনের ক্ষমতা ছিল না। সেই দুঃস্থ ব্যক্তির কষ্টের কথা অবগত হইয়া বালক রামেন্দ্রসুন্দরের প্রাণে বিষম আঘাত লাগিল। তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি, পূর্ণেন্দুনারায়ণ ও দুই চারি জন পল্লীবালক একত্র হইয়া একটি ক্ষুদ্র ধনভাণ্ডার স্থাপন করিলেন, এবং উহার পুষ্টিসাধনের জন্য তাঁহারা নিজেদের বৃহৎ পরিবারের সকল ব্যক্তি ও পরিচিত অপর সকলের নিকট হইতে নানাবিধ সাহায্য গ্রহণ করিবার উপায় স্থির করিলেন। বালকদিগের অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত চেষ্টার ফলে অচিরকালমধ্যে কিছু অর্থ সংগৃহীত হইল। ঐ ভাণ্ডার হইতে বহুদিন ধন বাউরীকে সাহায্য দান করা হইয়াছিল। ঐ সাহায্য লাভ করিয়া ধন বাউরীর অন্ন-বস্ত্রের অভাব পূর্ণ হইয়াছিল।

পরের উপকার করিয়া নিজের নাম সাধারণ্যে প্রচার করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার একবারেই ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। মুরশিদাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট ইগার্টন সাহেব এক দিন কান্দী পরিদর্শন করিতে গিয়া কান্দীর স্কুলের লাইব্রেরী দেখিতে চান। লাইব্রেরিয়ান

ও শিক্ষকগণ অনাহারে নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও সাহেবের সাক্ষাৎ পান নাই। দ্বারবানকে তথায় রাখিয়া স্নানাহারের নিমিত্ত তাঁহারা চলিয়া যান। ইত্যবসরে সাহেব আসিয়া লাইব্রেরিয়ানকে ডাকিবার জন্য দ্বারবানকে আদেশ করেন। সাহেবের ডাক শুনিয়া লাইব্রেরিয়ান সত্বর সেখানে উপস্থিত হন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে লাইব্রেরী ঘরের চাবি তাঁহার কাছে ছিল না, হেড মাষ্টার মহাশয় উহা লইয়া গিয়াছিলেন। লাইব্রেরিয়ান দ্বারবানকে চাবি আনিতে পাঠাইয়া দিলেন। সাহেব ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া লাইব্রেরিয়ানকে তালা ভাঙ্গিবার আদেশ করিলেন। লাইব্রেরিয়ান ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া সাহেব উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, তখন উভয়ের মধ্যে বেশ গরম গরম বাক্যালাপ চলিল। সাহেব রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কিছু দিন পরে সাহেব নিজের ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিতে ত্রুটি করিলেন না। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট সাহেবের পরামর্শক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটকে স্কুলটিকে মঞ্জুর না করিবার জন্য আদেশ করিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহায়তায় সেনেটে গবর্ণমেণ্টের ঐ প্রস্তাব গৃহীত হইতে দেন নাই। কাজেই সেবার স্কুলটি কোন রকমে রক্ষা পাইল। অগত্যা গবর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসরের জন্য স্কুলের বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেন। রামেন্দ্রসুন্দরের ঐকান্তিক চেষ্টাযত্ন না থাকিলে ঐ সময়ে স্কুলটিকে লীলাসংবরণ করিতে হইত। ঐ ঘটনার বিষয় রামেন্দ্রসুন্দর কখন কাহারও নিকট গল্পচ্ছলে উপস্থিত করেন নাই। রামেন্দ্রসুন্দর কি উপায়ে স্কুলটিকে রক্ষা করিয়াছিলেন, স্কুলের তৎকালীন কর্ত্তৃপক্ষগণ অথবা কান্দীর অধিবাসীরা কেহই তাহা অবগত ছিলেন না।

স্বদেশবাসীর জ্ঞানগৌরবের প্রসারতা সম্পাদনের জন্য রামেন্দ্রসুন্দর বিপুল আত্মত্যাগ করিয়াছেন। অর্থ, যশঃ, মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি সমুদয় বিসর্জ্জন দিয়া তিনি একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় বঙ্গবাণীর সেবায় আত্মনিয়োগ

করিয়াছিলেন। পরিশ্রম কিছু কম করিলে, হয়ত তিনি আরও কিছু দিন বাঁচিতে পারিতেন। আমাদের এই বঙ্গবাণীকে তিনি খুব বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন; সেই জন্য তিনি তাঁহাকে অতি আদরের সহিত বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। জাতীয় বিপ্লবের দিনে আমাদের জাতীয় জীবনতরী বঙ্গ-বাণীর শৃঙ্গে সংলগ্ন করিয়া বৈবস্বত মনুর ন্যায় আত্মরক্ষা করিতে হইবে। সেই শৃঙ্গ যাহাতে অতি সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি তাহার জন্য আত্ম-ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এস্থলে ত্যাগ অর্থে এক কালে সর্ব্বস্বদান কেহ বুঝিবেন না। ঈশোপনিষৎ বলিয়াছেন, "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীয়াঃ"—ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিবে। অতএব ভোগ ত্যাগমূলক—ত্যাগই ভোগ। রামেন্দ্রসুন্দর ভোগ করিবার জন্যই ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার স্বদেশ-বাসীদিগকে সেই ভোগের অংশভাক্ হইবার জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। যে দিন আমাদের সেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে, আমরা ত্যাগ স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ হইব না। হীরেন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে পারি "সেই দিন আমরা আত্মরক্ষা করিতে পারিব, জাতীয় জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইব এবং রামেন্দ্রসুন্দরের আমরণ আচরিত ব্রতের স্বার্থকতা সাধন করিব।"

রামেন্দ্রসুন্দর যাহা কিছু হীন, যাহা কিছু দূষ্য এবং যাহা কিছু ঘৃণ্য বলিয়া মনে করিতেন, স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহার কখন প্রশ্রয় দিতেন না। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলিয়াছেন—"রিপন কলেজে ঢুকিবার পূর্ব্বে রামেন্দ্রসুন্দরের গবর্ণমেণ্টে চাকরী পাইবার একবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। কেন তিনি গবর্ণমেণ্টের চাকরী লন নাই, সে সম্বন্ধে তিনি এক দিন আমার নিকট বড় মজার গল্প করিয়াছিলেন। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পাইবার অব্যবহিত পরেই ত্রিবেদী মহাশয় গবর্ণমেণ্টের এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টে চাকরীর জন্য ডিরেক্টরের নিকট আবেদন করেন। তাহার

ফলে ডিরেক্টর তাঁহাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বলেন। নিয়মিত সময়ে ত্রিবেদী মহাশয় ডিরেক্টরের আফিসে উপস্থিত হন এবং চাপরাশিদ্বারা কার্ড পাঠাইয়া দেন। কার্ডটি ডিরেক্টরের নিকট লইয়া যাইবার সময় চাপরাশিটি তাঁহার নিকট বক্শিস্ চাহে। ইহাতে ত্রিবেদী মহাশয় এত বিরক্ত হইয়া যান যে, তিনি ভাবেন, দূর ছাই, গবর্ণমেণ্টের চাকরী যাহার গোড়াতেই এই রকম, তাহার পর না জানি কত রকম গোলমাল। এই ভাবিয়া তিনি সেখান হইতে উঠিলেন, আর ডিরেক্টরের সহিত দেখা করিলেন না। এই ঘটনা হইতে ত্রিবেদী মহাশয়ের স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।" গল্পটি আমরা পূর্ব্বে অবগত ছিলাম না। তাঁহার মুখে গল্পচ্ছলেও কোন দিন উহা শুনি নাই।

রামেন্দ্রসুন্দর অনন্যসাধারণ পুরুষ ছিলেন। তিনি গতানুগতিক ছিলেন না; বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতির সিদ্ধান্তগুলি কখন বিনা বিচারে গ্রহণ করেন নাই। সর্ব্বত্রই তিনি বিভিন্ন মতগুলির সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচিত প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে, স্পষ্টভাবে উহার উপলব্ধি হয়। সকলেই জানেন, রামেন্দ্রসুন্দর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি বিজ্ঞানবিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিলেন। অনেকে এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন, যদি তিনি পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার অনুশীলনে ও গবেষণায় ব্যাপৃত হইতেন, তাহা হইলে তিনি ঐ বিষয়ে অনেক নূতন কথা বলিতে পারিতেন। তিনি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্বন্ধে নূতন কথা শুনাইয়া হয়ত জগতের সমগ্র সভ্য দেশে সুনাম উপার্জ্জন করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি সে পথে গমন না করিয়া, দর্শনবিজ্ঞানের গভীর তত্ত্বের মধ্যদিয়া আপন দেশের জ্ঞানোন্নতির কথা আত্মবিস্মৃত দেশ-বাসীর নিকট প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ঐ উভয়বিধ কার্য্যেই জগতের

উপকার আছে স্বীকার করি; কিন্তু দুইটির উদ্দেশ্য ভিন্ন রকমের, একটি আত্মপ্রকাশ, অপরটি দেশোন্নতি। তিনি আত্মপ্রকাশ অপেক্ষা দেশোন্নতিকে বরণীয় করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার প্রতি লোকের এত শ্রদ্ধা। তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে লোকসমাজের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, যাহাদ্বারা সমগ্র দেশ কিছু না কিছু লাভ করিয়াছে এবং করিবে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র লিখিয়াছেন—"মহাপুরুষেরা সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী কালের উপর যে প্রভাব রাখিয়া যান, তাহার দ্বারাই তাঁহাদের মহত্ত্ব পরিমিত হইয়া থাকে। সে প্রভাব আমাদের সাধারণ দৃষ্টির মাপকাঠিতে পরিমিত হইতে পারে না। কারণ ঐরূপ আধ্যাত্মিক প্রভাবের অন্তঃপ্রবাহ লোকচক্ষুর অন্তরালে অলক্ষ্যে অজ্ঞাতসারে ক্রিয়া করিতে থাকে এবং তাহার ফলে সমগ্র দেশ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে ক্রমশঃ বাহিত হয়। রাশিকৃত গ্রন্থপ্রণয়ন অপেক্ষাও ঐরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারা মহত্তর কার্য্য, এবং ঐরূপ মহত্ত্বের কার্য্যই রামেন্দ্র বাবুর প্রতিভার দ্যোতক।

"বঙ্গবাণীর অন্তররাজ্যের উপর রামেন্দ্রবাবুর যে প্রভাব, সে প্রভাব বড়ই পবিত্র ও শুভপ্রদ। প্রতিভা অনেক প্রকারের থাকে। দুরতিক্রমণীয় বাধাসমূহ অতিক্রম করিয়া কার্য্যকরী হওয়াই প্রতিভার স্বাভাবিক ধর্ম্ম; কিন্তু সেই প্রতিভার সঙ্গে যদি বিশ্বজনীন প্রেম, নিরভিমান, নিঃস্বার্থতা ও পূত চরিত্রের মহিমা বর্ত্তমান থাকে, তবে তাহা পুষ্পবৃষ্টিরই মত বিধাতার শুভাশীর্ব্বাদ বহন করিয়া আবির্ভূত হয়। এটিলা ও তৈমুরলঙ্গের ও যে প্রতিভা ছিল, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কিন্তু সেই লোকক্ষয়করী এবং দেশধ্বংসকরী প্রতিভা দেবতার অভিসম্পাতস্বরূপ দেখা দিয়াছিল, তাহা কোন স্থায়ী প্রভাবই রাখিয়া যাইতে পারে নাই। আর যাঁহারা নিরালা প্রদেশে বসিয়া অন্যের অজ্ঞাতে লোকের হিতচিন্তা

করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রভাব কালের অগণিত সোপানরাজি বাহিয়া অবিনশ্বরতার দিকে চলিয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রভাব সেই শ্রেণির প্রভাব ছিল। তাহার মধ্যে কুটিলতার সংস্পর্শ ছিল না, ছলকলার লেশমাত্র ছিল না এবং স্বার্থের প্রচ্ছন্ন লীলামাত্র ছিল না। এই জন্য তাঁহার মহত্ত্ব আমাদের অন্তররাজ্য জুড়িয়া বসিয়াছে। মহত্ত্ব যেখানে থাকে, সেখানে তাহার অভিমানও বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষণের অপেক্ষা বিদ্যুদ্বিকাশই অনেক স্থলে বেশী। মহত্ত্বের এই ভেরী-নিনাদের কোলাহলে অনেক সময় প্রকৃত মহত্ত্ব চাপা পড়িয়া যায়। রামেন্দ্রবাবুর মহত্ত্ব এ প্রকৃতির ছিল না। এখানে ভেরী-নিনাদ ত' ছিলই না, বরং অপরের ভেরী-নিনাদও তাঁহার নিকট লজ্জা পাইয়া স্তব্ধ হইত।"

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত বলিয়াছেন—"প্রতিভার বিদ্যুৎ চমকাইল, কিন্তু ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে। যখন তিনি অনর্গল নূতন কথা শুনাইলেন, তখন তিনি অত্যন্ত কঠিন পীড়ায় রোগশয্যায় শয়ান।" যখন শরীর ভাল ছিল, তখন বিষয়গুলি ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতেই সময় গেল। আয়ত্ত করিবার কিছুকাল পরেও তিনি মনে মনে ভাবিতেন—"সব কথাই বলা হ'য়ে গেছে, কেউ না কেউ ব'লে ফেলেছে। এখন এই বিছানায় শুয়ে শুয়ে মনে হচ্ছে, আমিও নূতন কথা কিছু বল্‌তে পার্‌তাম।"

এমন অনেক বিদ্বান্ আছেন, যাঁহারা তাঁহাদের বিদ্যা জ্ঞানার্থীর নিকট সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করিতে চান না। জ্ঞানার্থী হইয়া কোন ব্যক্তি রামেন্দ্রসুন্দরের দ্বারস্থ হইলে, তিনি তাঁহার জ্ঞাত বিদ্যা তাঁহার নিকট সরল ভাবে প্রকাশ করিতেন। কোন বিষয়ে সন্দেহ জন্মিলে তিনি মীমাংসা না করিয়া হঠাৎ কাহাকেও শিক্ষা দিতেন না, সন্দেহ নিরাকরণের জন্য সময় লইতেন। কোন বিষয়ে গভীর ভাবে প্রবেশ

না করিয়া তিনি তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতেন না। সুরেশচন্দ্র বলিয়াছেন—"পল্লবগ্রাহিতা তাঁহার চরিত্রে ছিল না; তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যেও নাই।"

রামেন্দ্রসুন্দর অধিক তর্ক করিতে ভালবাসিতেন না। যে বিষয়ের মীমাংসা তিনি দুঃসাধ্য বলিয়া মনে করিতেন, তাহা লইয়া কাহার সহিত অনর্থক তর্ক করিতেন না। ঐ প্রকার তর্কের লাভ কেবল শান্তিভঙ্গ। তাঁহার মুখে নীরব হাসির বিকাশই প্রসঙ্গকারীকে নিরস্ত করিত। কান্দী মহকুমার ভার পাইয়া কবিবর ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় কিছু কাল কান্দীতে বাস করিয়াছিলেন। তিনি তথায় রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার স্বজনকে লিখিয়াছিলেন—"এখানে এখন থাকার মধ্যে আছেন—স্থবিরপ্রায় বৃদ্ধ সাহিত্যিক মনস্বী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়। সে দিন অনুগ্রহ করিয়া আমার এখানে আসিয়াছিলেন। আলাপ হইল। বহু দিন পরে এক জন নামজাদা বিদ্বান্ ব্যক্তির সঙ্গ পাইয়া নানা প্রসঙ্গ তুলিয়া তাঁর সঙ্গে তর্ক করিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু সে জ্ঞানগর্ভ (?) গম্ভীর মুখ হইতে বাক্যের পরিবর্ত্তে অধিকাংশ সময়েই মৃদু হাস্য অর্থাৎ—শুধু দশনকৌমুদীর স্ফুরণ মাত্র হইতে থাকিল। সুতরাং আমারও সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল—তর্ক হইল না। অহো—দগ্ধ অদৃষ্ট!! * * বড় ধীর ও শান্ত মানুষটি; দেখিতে কতকটা কাণ্ডজ্ঞানহীন নির্ব্বোধের মত হইলেও, বিদ্যার জাহাজ। কিন্তু তর্ক যখন করেন না, বুঝিলাম—বেরসিক; এবং আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরে খুব খাওয়াইলেন, অতএব বুঝিলাম—উদারমনা মহাজন।"

রামেন্দ্রসুন্দরের শিক্ষায় একটু বিশিষ্টতা ছিল। সেই বিশিষ্টতার গুণে প্রতীচ্যের আপাতরম্য মোহ তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। সেই

জন্য তাঁহার মেধায় মনীষায় প্রকৃতিপ্রবৃত্তিতে প্রতীচ্যের কোন ভাববিহ্বলতা প্রকাশ পায় নাই। তাঁহার চালচলন, তাঁহার ভাবভাষা, তাঁহার অশনভূষণ, সর্ব্বস্ব ভারতবর্ষের বিশিষ্টতায় মণ্ডিত ছিল।

বিদ্যার উপর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল বলিয়া রামেন্দ্রসুন্দর সর্ব্বদাই পড়িতেন। পড়াশুনা ছাড়া তাঁহার অন্য কোন কাজ ছিল না। তিনি যাহা পড়িতেন, হজম না করিয়া ছাড়িতেন না। ঐ গুণে তিনি অতি জটিল বিষয়গুলি আয়ত্ত করিয়া সহজে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। তিনি বুঝাইয়াছেন, য়ুরোপ জড়বিজ্ঞানের পথে অতি বেগে অগ্রসর হইলেও ভারতীয় বিদ্যার ভিতর এমন অনেক ভাব ও জিনিষ আছে যাহাদের সন্ধান এখনও সে করিয়া উঠিতে পারে নাই।

অধিক দিন বাঁচিব না, এই ধারণা রামেন্দ্রসুন্দরের মনে বদ্ধমূল থাকিলেও প্রাজ্ঞ জনের ন্যায় তিনি নিজেকে অজর ও অমর ভাবিয়া বিদ্যার চর্চ্চা এবং জ্ঞানের সাধনা করিতেন। সর্ব্বদাই বিদ্যার অনুশীলন করিতেন বলিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহটি সদা সর্ব্বদা বিদ্বজ্জনসমাগমে পূর্ণ থাকিত। জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনায় তাহা সারস্বত ভবনে পরিণত হইয়াছিল। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, গণিত প্রভৃতি নানা বিষয়ের পণ্ডিতগণ তথায় গমন করিয়া নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন। জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থী ব্যক্তি তথায় স্বল্প কাল যাতায়াত করিলে, কোন না কোন একটা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইত। তথায় পরনিন্দা বা পরচর্চ্চার প্রবেশাধিকার ছিল না। কোন প্রকার আপত্তিজনক বা বিরক্তিকর কোন বিষয়ের আলোচনা হইত না। বিদ্যার গর্ব্ব এবং জ্ঞানের অহঙ্কার প্রকাশ করিবার অবসর কেহ পাইত না।

রামেন্দ্রসুন্দর উদার পণ্ডিত ছিলেন। অনুদার পাণ্ডিত্যের তিনি বিরোধী ছিলেন। অনুদার প্রকৃতির পণ্ডিতগণ তাঁহাদের অনালোচিত

বা অজ্ঞাত বিষয়সমূহের মহিমা প্রায়ই স্বীকার করেন না, বা তাহাদের আলোচনার বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে, এ কথা স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হন। ঐরূপ সংকীর্ণ ভাব রামেন্দ্রসুন্দরের ছিল না। জ্ঞানরাজ্যের সীমা অনন্ত, তাহা বিষয়বিশেষের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে, নানা শাস্ত্র আলোচনা করিয়া তিনি ইহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি গভীর গবেষণাদ্বারা জ্ঞানরাজ্যের নানা শাখা অবলম্বন করিয়া তাহাদের সহিত পরিচিত হইতে বিশেষ যত্ন লইতেন। জ্ঞান অনন্ত—"অনন্ত জ্ঞানের প্রবাহ সংসার প্লাবিত করিয়া ছুটিয়াছে। উষর সংসার-মরুতে জ্ঞানের অপেক্ষা প্রেমের প্রয়োজন অধিক; আতপদগ্ধ নরনারী স্নেহবারির জন্য লালায়িত। কেন আসে, কেন যায়, দিয়া কেন হরিয়া লয়;—প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর লীলাখেলার উদ্দেশ্য বুঝিবার জন্য তিনি দেশবিদেশে জ্ঞানিজনের চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। জ্ঞানের নিকট সান্ত্বনা মিলে নাই; স্নেহের পিপাসা জ্ঞানে মিটায় নাই।" কিন্তু তাই বলিয়া তিনি জ্ঞান ছাড়িয়া শুধু প্রেমের দুয়ারে আত্মবলি দেন নাই। প্রেমে হৃদয়কে স্নিগ্ধ করে—প্রেমে আত্মতৃপ্তিলাভ হয়। জ্ঞানের সাধনা প্রেমের সাধনা অপেক্ষা কঠিনতর। জ্ঞানেও আত্মতৃপ্তি লাভ হয়,—কিন্তু বিলম্বে। দিব্য জ্ঞানে বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি হয়। তাই প্রেম সাধারণ, জ্ঞান অসাধারণ। সংসারে সাধারণ নরনারীর জন্য প্রেমের প্রয়োজন অধিক। অসাধারণ জ্ঞানিজনের সংখ্যা অতি বিরল। অনন্ত জ্ঞানের পথে চলিতে চলিতে সেই অফুরন্ত পথের সীমারেখার প্রতি যখন দৃষ্টি পড়িত না, তখন ক্লান্ত দেহে অবসন্ন চিত্তে তিনি বলিতেন—"জ্ঞানের নিকট সান্ত্বনা মিলে নাই; স্নেহের পিপাসা জ্ঞানে মিটায় নাই।" তখন জ্ঞান ছাড়িয়া প্রেমের জন্য তাঁহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিত; তাই তিনি স্বর্গীয় পিতৃদেবকে

সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—"পিপাসা মাত্র সম্বল দিয়া জীবনের পথে প্রেরণ করিয়াছিলে; ভাগ্যহীন পথিক কোথায় চলিল, দেখিবার জন্য অপেক্ষা কর নাই। বিষাদের ঘনচ্ছায়ায় সংসারক্ষেত্র আবৃত রহিয়াছে; কোটী মানবের হাহাকার সেই অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া ভীত পথিকের ত্রাস জন্মাইতেছে। যে দীপবর্ত্তিকা একমাত্র পথপ্রদর্শক ছিল, কোন্ বিধাতার দারুণ বিধি তাহা অকালে নির্ব্বাপিত করিল?"

"মহাবাহো, তোমার উদ্ধত বাহুদ্বয় কোন্ ঊর্দ্ধ দেশের অভিমুখে প্রসারিত ছিল, আমার অজ্ঞানান্ধ নেত্র তাহার আবিষ্কারে সমর্থ হইতেছে না। আমার পূর্ব্ব পিতামহ সূরিগণ দিব্য নেত্রে তাহা দেখিতে পাইতেন,—তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।" সেই স্বরূপ দেখিবার জন্য তাঁহার ক্লান্ত হৃদয়ে আবার উৎসাহ জাগিয়া উঠিত, হৃদয় হইতে সমুদয় নিরাশা দূর হইত। তিনি বলিয়াছেন—"ভয় নাই, ভয় নাই—যে স্নেহসিক্ত আশীর্ব্বচন যাত্রারম্ভে উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহার স্মৃতিপ্রেরিত প্রতিধ্বনি আজিকার দিনে অভয়বাণীর কার্য্য করিবে। ভয় নাই, ভয় নাই,— কোন্ অদৃশ্য হস্ত কোথায় রহিয়া মঙ্গলময় লক্ষ্যদেশের নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহার অঙ্গুলিস্পর্শ এই অন্ধকারেও স্পষ্টভাবে অনুভব করিতেছি।" ঐ বাণীকেই ধ্রুব লক্ষ্য করিয়া তিনি জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কতটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা সুধীজন বিচার করিবেন।

তাঁহার দুইটি দোষের কথা উল্লেখ করিয়া অনেকে দুঃখ প্রকাশ করেন। প্রথমতঃ তাঁহার হাতের লেখাসম্বন্ধে;—অনেকে তাঁহার হাতের লেখা ভাল করিয়া পড়িতে পরিতেন না। আমরা তাঁহার হাতের লেখা পড়িতে নিত্য অভ্যস্ত ছিলাম, সুতরাং আমাদের পক্ষে উহা দুষ্পাঠ্য ছিল না। কিন্তু নূতন লোকের পক্ষে তাঁহার হস্তাক্ষর পাঠ করা

একটু শক্ত বোধ হইত। তিনি পাকা হাতে লিখিতেন, সকল অক্ষরই তিনি স্পষ্ট ভাবে লিখিতেন, একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইত। তাড়াতাড়ি লিখিতে বসিলে জড়ানে ভাব আসিত কাজেই নূতন লোকের পক্ষে ইহা পাঠ করা একটু কঠিন বোধ হইত। তাঁহার অন্তরে ভাবের উচ্ছ্বাস উথলিয়া উঠিলে হাতের লেখনীও দ্রুতবেগে চালিত হইত। তখন হস্তাক্ষরের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার অবসর থাকিত না। ঐরূপে তাড়াতাড়ি লিখিতে অভ্যস্ত হইয়া, হাতের লেখাটা জড়ানে হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ অনেকে অভিযোগ করেন, যে স্বাস্থ্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল না; স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি তিনি যথাযথ ভাবে সকল সময়ে পালন করিয়া উঠিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু তিনি জীবনে একটি দিনের জন্য আহারাদি সম্বন্ধে ব্যভিচার করেন নাই। সমগ্র জীবন তিনি অতি সংযমের সহিত অতিবাহিত করিয়াছেন; বিশেষতঃ শরীরে রোগ প্রবেশ করিলে আহারের নিয়মপালনসম্বন্ধে তিনি কৃচ্ছ্র সাধন করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। একরূপ রুগ্ন দেহ লইয়াই তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, বাল্যকালটা তাঁহার রোগ ভোগ করিতেই কাটিয়া ছিল। বাল্যকালে যখন লোকে স্বভাবতই শারীরিক ব্যায়ামের পক্ষপাতী থাকে, সেই সময়ে রোগ তাঁহাকে শারীরিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত হইতে দেয় নাই। যৌবনকালটা লেখাপড়া কার্য্য লইয়াই কাটিয়াছিল। শারীরিক পরিশ্রমে যে ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে অভ্যস্ত হইতে পারে না, বয়োবৃদ্ধি ঘটিলে আর তাহা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। স্বল্পজীবীর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কেবল সংযমের গুণেই তিনি পূর্ব্বপুরুষগণের অপেক্ষা কিছু অধিক দিন বাঁচিয়াছিলেন। হয়ত পরিশ্রম কিছু কম করিলে তিনি আরও কিছু দিন বাঁচিতে পারিতেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের হস্তলিপি

২৮৮পৃষ্ঠা

সপ্তদশ অধ্যায়

ধর্ম্মমতে
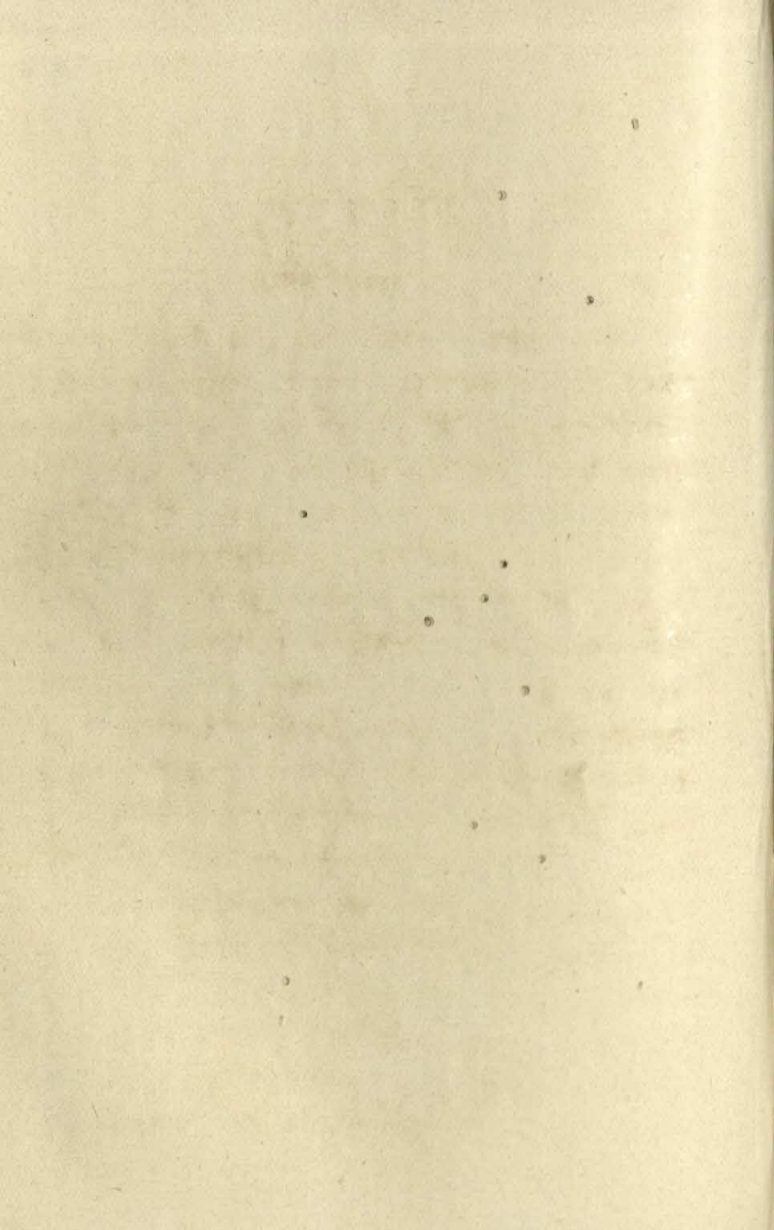
ধর্ম্মসম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী ছিলেন না। ধর্ম্মের প্রমাণ বা সিদ্ধান্তগুলিকে তিনি কখন বিনা বিচারে গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার বিচারশক্তি পক্ষপাতদুষ্ট ছিল না, তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্য তাহার যথেষ্ট পরিচয় দেয়। তিনি নিরপেক্ষ ভাবে যুক্তিযুক্ত পন্থায় প্রমাণগুলি বিচার করিয়া দেখিতেন মাত্র। তাঁহার যুক্তি বা বিচারের মূলে যে সিদ্ধান্ত টিকিতে পারিত না, তাহার মূলোচ্ছেদের জন্য তিনি তরবারি আস্ফালন করিতেন না। অন্ধ বিশ্বাসীকে তিনি কখন ঘৃণা বা উপহাস করিতেন না। সকল কার্য্যেরই একটা গভীর উদ্দেশ্য আছে, ইহা তিনি খুব মানিতেন; সেই উদ্দেশ্যটি কি? তাহার মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান করাই তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল। পরস্পর বিরোধী মত সমূহের মধ্য হইতে সার তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য নির্ণয় করিবার প্রয়াস তিনি করিতেন। স্বধর্ম্ম এবং জাতীয়তাকে তিনি খুব বড় করিয়া দেখিতেন; তাহার খুঁটিনাটি ধরিয়া জনসমাজে তাহাকে খাটো করিবার প্রয়াস কখন করিতেন না; এবং স্বধর্ম্ম ও জাতীয়তাকে বড় করিবার অভিপ্রায়ে পরধর্ম্ম ও জাতীয়তাকে তুলনায় খাটো করিয়া দেখাইবার চেষ্টাও করিতেন না।

ধর্ম্ম কি? তাহার উৎপত্তি হইল কিরূপে? তাহার প্রমাণই বা কিরূপ? ঐ সকল তত্ত্ব রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার "কর্ম্ম-কথা" গ্রন্থে ধর্ম্মের প্রমাণ," "ধর্ম্মের জয়," "ধর্ম্মের অনুষ্ঠান" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে অতি

সরস ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

"ইতর প্রাণীর চেষ্টা তাহার স্বভাব কর্ত্তৃক নিয়মিত হয়। তাহার স্বভাবের এই অংশের নাম সংস্কার। ঐ সংস্কার জীব জন্মসহকারে লাভ করে; তাহা শিক্ষাদ্বারা উপার্জ্জন করিতে হয় না। গরুর এক জোড়া শিং এবং দুই জোড়া খুর উপার্জ্জন করিতে এবং বাঘের ধারাল নখর এবং তীক্ষ্ণ দন্ত লাভ করিতে যেমন ব্যক্তিগত বাহাদুরি নাই; সেইরূপ সমুদায় মিষ্টান্ন পরিত্যাগ করিয়া ঘাসের প্রতি অনুরাগের জন্য গরুকে কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হয় নাই, এবং হরিণমাংস ও মেষমাংসের উপকারিতাসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে ব্যাঘ্রশিশুও কোন ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে নাই। আপনার সহজ সংস্কার কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বলদ চিরকাল ঘাস খাইয়া আসিতেছে ও বাঘ চিরকাল মেষমাংসে স্পৃহা দেখাইয়া আসিতেছে। এ পর্য্যন্ত তত্তৎসম্বন্ধে কোন রিফর্ম্মার জন্ম গ্রহণ করিয়া তাহাদের আচার সংশোধনের চেষ্টা করে নাই।

"এই সহজাত সংস্কারের একটা প্রধান লক্ষণ এই যে, যে ব্যক্তি এই সংস্কারের বশীভূত, তাহার কিছুমাত্র স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য নাই, সে সর্ব্বতোভাবে এই সংস্কারের অধীন। এই সংস্কারের অধীন ভাবে না চলিয়া তাহার উপায় নাই; এই সংস্কারের বশে চলা না যাইতে পারে, এরূপ সন্দেহও তাহার মনে কখন স্থান পায় না। গরুর ঘাস না খাইলে ও রোমন্থন না করিলে উপায় নাই; বাঘের পক্ষে হিংসাপরিত্যাগ ও হবিষ্যভোজন একবারে অসম্ভব। এই সকল প্রাণী নিতান্ত অন্ধভাবে আপনাদিগের অজ্ঞাতসারে প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট জীবন-প্রণালীর অনুষ্ঠান করিতেছে। কেন করিতেছে, কি উদ্দেশ্যে করিতেছে, না করিলে কি ক্ষতি হইত, এই সকল তত্ত্ব-কথা তাহাদের মনে উদিত হয় না। প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট পথে তাহারা

বিচরণ করে ও বিচরণ করিতে বাধ্য, রেখামাত্রমপি সেই লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইবার তাহাদের উপায় নাই। এই জন্য বলা হয়, তাহাদের সংস্কার অন্ধ অর্থাৎ বিচারবর্জ্জিত; তাহাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই এবং তাহাদের জবাবদিহি নাই; তাহাদের চেষ্টা যন্ত্রের মত নিয়মবদ্ধ। কাজেই তাহাদের জীবনসমালোচনায় পাপ-পুণ্যের কথা উঠিতে পারে না। পশুজীবনে ধর্ম্ম-বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রয়োজন নাই।

"হতভাগ্য মনুষ্যের জীবন এইরূপ দায়িত্ববর্জ্জিত যন্ত্রের মত হইলে মনুষ্যজীবনে ক্লেশের ভার অনেকটা লঘু হইত সন্দেহ নাই। প্রকৃতি দেবী তাহার পশুসন্তানগুলির প্রতি যতটা মমতা দেখাইয়াছেন, মনুষ্যসন্তান-গুলির প্রতি ততটা দেখান নাই। আধি-ব্যাধি-জরা-মরণ-ক্লেশ পশু ও মনুষ্য তুল্যরূপে ভোগ করে। স্বকর্ম্মের জন্য মনুষ্যের যে জবাবদিহি আছে, পশুজীবনে তাহার একবারে তুলনা নাই। মানবজীবন আধ্যাত্মিক ক্লেশের ভারে প্রপীড়িত ও অবসন্ন হইয়া আছে, পশুজীবনে তাহা নাই। প্রকৃতি পশুজীবনের বল্গা নিজের হাতে ধরিয়া রাখিয়া তাহাকে নির্দ্দিষ্ট পথে ঘুরাইতেছেন, কিন্তু মনুষ্যকে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য ও যথেচ্ছ ভাবে বিচরণের ক্ষমতা দিয়া তাহাকে অত্যন্ত বিপন্ন করিয়াছেন।

"মনুষ্য সংস্কারের বশ। জীবনরক্ষার্থ ও সন্তানোৎপাদনার্থ যে সকল প্রবৃত্তির প্রয়োজন, সেগুলি মনুষ্য অন্যান্য জীবেরই মত প্রকৃতি হইতে লাভ করিয়াছে; এইগুলি তাহার সংস্কার। মানুষ সংস্কারবশেই ক্ষুৎপিপাসার তাড়নায় প্রেরিত হয়; পথ্যাপথ্যের বিচার অনেক স্থলেই সংস্কারবশেই সম্পাদিত হয়; বংশরক্ষা ও অপত্যপালনে প্রবৃত্ত হয়। জীবনরক্ষা ও বংশরক্ষা বিষয়ে এই সংস্কারের এত প্রয়োজন যে, প্রকৃতি এ সকল বিষয়ে মনুষ্যকে স্বাতন্ত্র্য দিতে সাহস করেন নাই। যৌনসঙ্গলিপ্সা যদি স্বাভাবিক সংস্কার হইতে উৎপন্ন ও তীব্রতাবিশিষ্ট না হইত, তাহা হইলে

এই ঘোর জীবন-সংগ্রামে মনুষ্য বংশবৃদ্ধিতে সম্মত হইত কি না সন্দেহের বিষয়। মনুষ্যের এই সকল ধর্ম্মকে পাশব ধর্ম্ম ও এই সকল বৃত্তিকে পাশব বৃত্তি বলিয়া উল্লেখ করা প্রথা দাঁড়াইয়াছে।

"ইতর জীবের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই; মনুষ্যের কতকটা আছে, তাহাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, এবং তাহাতেই পশুতে ও মনুষ্যপশুতে বিশেষ। অন্তঃকরণের যে বৃত্তি লইয়া এই বিভেদ তাহার নাম প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা ও সংস্কারের মধ্যে যথেষ্ট বিভেদ, এমন কি বিরোধ বর্ত্তমান। প্রজ্ঞা ও সংস্কারের বিরোধী ভাব হইতে পাপ-পুণ্যের উৎপত্তি। প্রজ্ঞা ভূয়োদর্শন বা অতীত কালের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত ও প্রজ্ঞার দৃষ্টি ভবিষ্যৎ কালের ভরসার উপর স্থির ভাবে বর্ত্তমান। সংস্কারের সহিত এই অতীতের অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যতের ভরসার সম্পর্ক নাই। সংস্কার সম্পূর্ণ ভাবে অন্ধ, কিন্তু প্রজ্ঞা চক্ষুষ্মতী। সংস্কার একবারে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করে, তাহার এ দিক ও দিক থাকে না, তাহাতে ভ্রান্তি থাকে না, তাহাতে শিখিবার বা ঠেকিবার কিছুই থাকে না, তাহাতে উন্নতি অবনতির কোন আশা থাকে না। প্রজ্ঞা যে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করে, তাহা বহু যত্নে ও বহু কষ্টে শিখিতে হয়, শিখিয়াও আবার প্রয়োগকালে পুনঃ পুনঃ ঠেকিতে ও শিখিতে হয়, এইরূপ ঠেকিয়া শিখিয়াও পুনঃ পুনঃ ঠকিয়া অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি ও উন্নতি হয়। সংস্কার কেবল একটা পথ দেখায়, অন্য পথে চলিতে স্বাধীনতা দেয় না; প্রজ্ঞা হাজার দরজা খুলিয়া রাখিয়াছে, সকলগুলিই অবারিত ও নিরর্গল; যে দিকে ইচ্ছা চলিয়া যাও, স্বর্গের বা নরকের মুখে চলিতেছ, তাহা ঠেকিয়া ও ঠকিয়া আবিষ্কার কর।

"বাঁধা নিয়মে চলিতে হয় বলিয়া পাপপুণ্যের কথা পশুজীবনের সমালোচনায় উঠে না; মনুষ্যজীবনের সমালোচনায় উঠে। পশু পাপপুণ্যবর্জ্জিত, কারণ প্রকৃতি নিজের হাতে পশুকে চালাইতেছেন, কাজেই

তাহার কোন কাজেই দায়িত্ব নাই। মানুষের পক্ষে এ কাজটা ভাল, ও কাজটা মন্দ, এ কাজটা পাপ ও ওকাজটা পুণ্য।

"মনুষ্য সমাজবদ্ধ জীব, দল বাঁধিয়া থাকে। এই দল বাঁধিবার মুখ্য কারণ মনুষ্যের দৌর্ব্বল্য। জীবন-সংগ্রামে আত্মরক্ষার জন্য যে সকল মোটা হাতিয়ারের দরকার, মানুষের সে সকল কিছুই নাই, না আছে ধারাল দাঁত, না আছে ধারাল নখ, না আছে গায়ে বল। তবে মনুষ্যের প্রকাণ্ড মাথার ভিতরে একরাশি মস্তিষ্ক রহিয়াছে; সেই মস্তিষ্কের ভাঁজের পরদায় পরদায় বহু কালের বহু অতীত ঘটনার বিবরণ সাঙ্কেতিক চিহ্নে অঙ্কিত থাকে, এবং প্রয়োজনমত মানুষের অন্তরেন্দ্রিয় সেই ভাঁজগুলা ও পরদাগুলা উদ্ঘাটিত করিয়া সেই চিহ্নগুলির অর্থ আবিষ্কার করিয়া সেই বিবরণগুলি মানসপটে দেখিতে পায়; এবং সেইগুলি বাছিয়া বাছিয়া তাহাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়া আপনার ভবিষ্যতের প্রয়োজনসাধনার্থ তাহাদিগকে কাজে লাগাইতে চায়। ইতর জীবের পক্ষে এই শক্তিটার অত্যন্ত অভাব; মনুষ্যের এই শক্তির অদ্যাপি ইয়ত্তা হয় নাই। ইহারই নাম প্রজ্ঞা। অতীত কালের অভিজ্ঞতায় ইহার প্রতিষ্ঠা, ভবিষ্যতের দিকে ইহার দৃষ্টি। কিন্তু দুর্ব্বল শরীর লইয়া কেবল আপন প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়াও চলে না, অপরের প্রজ্ঞার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়; এক জন মানুষের অভিজ্ঞতা অপরের জীবনযাত্রার আনুকূল্যে প্রদত্ত হয়। একের অভিজ্ঞতা অপরকে জানাইবার জন্য মানুষ একটা বিস্ময়কর কৌশলের উদ্ভাবনে সমর্থ হইয়াছে, তাহার নাম ভাষা। সকলে মিলিয়া একযোগে কয়েকটা ধ্বনির সহিত কয়েকটা ভাবের সাঙ্কেতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া লইয়াছে। মনুষ্য দল বাঁধিবার পর ভাষার উদ্ভাবন দ্বারা দল বাঁধিবার সুবিধা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। মানুষ একা এক দুর্ব্বল, কিন্তু এইরূপে দলবদ্ধ ও সমাজবদ্ধ মনুষ্য প্রকাণ্ড বলে বলীয়ান্।

জীবজগতের মধ্যে কোন জীবই সমাজবদ্ধ মনুষ্যের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না; মনুষ্য জীবজগতের সার্ব্বভৌম অধীশ্বর।

"মৌমাছি, পিপীলিকা প্রভৃতি কতকগুলা জীব মানুষের মত দল বাঁধিয়া বাস করে। তাহাদেরও কতকগুলা নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী আছে; সকলেই আপন আপন কাজ শৃঙ্খলার সহিত সম্পাদন করে, কেহ কাহাকেও বাধা দেয় না, কেহ কাহারও সহিত বিবাদ করে না। অথচ এত বড় সমাজ মধ্যে একটা ইস্কুল নাই, একটা আদালত নাই, একটা ধর্ম্মপ্রচারক নাই, একটা রিফর্ম্মার নাই। প্রত্যেকে নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত, তাহাকে কাজ করিতে হয়, তাই সে কাজ করে।

"মৌমাছিসমাজে ও মনুষ্যসমাজে এইখানে পার্থক্য—মৌমাছিসমাজে সংস্কারের সর্ব্বাঙ্গীন প্রভুত্ব, মনুষ্যসমাজে প্রজ্ঞার শাসন। মৌমাছিসমাজে ভুল ভ্রান্তি নাই, সকলেই বিনা শিক্ষায় ওস্তাদ, সকলেই বিনা পুলিশে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ; মনুষ্যসমাজে ভুল ভ্রান্তি পদে পদে, নৈপুণ্য শিখাইবার জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন। মৌমাছিসমাজে উন্নতি নাই, ঐ সমাজ চিরদিনই সমান ভাবে চলিতেছে। প্রাকৃতিক নিয়মে মৌমাছির যদি উন্নতি ঘটে, তাহা মৌমাছির অজ্ঞাতসারে, তাহাদের আপন চেষ্টায় বা ইচ্ছায় উন্নতি ঘটিবে না। মনুষ্যের সমাজ উন্নতিশীল, মনুষ্যের নৈপুণ্য ক্রমশঃ মানুষের জ্ঞাতসারে মনুষ্যের চেষ্টায় প্রকর্ষ লাভ করিয়াছে ও ক্রমে করিবে। এক স্থানে অন্ধ সংস্কার অন্যত্র চক্ষুষ্মতী প্রজ্ঞা। একে জানে না যে কি করিতেছে, কেন করিতেছে, না করিলে দোষ কি, ক্ষতি কি। অন্যে জানে যে কি করিতেছে, কেন করিতেছে, অকরণে ক্ষতি কি। একত্র পূর্ণ অধীনতা; অন্যত্র যথেচ্ছ স্বাতন্ত্র্য। ইতর প্রাণীর কাজে দায়িত্ব নাই, সুতরাং সেখানে পাপপুণ্যের কথা আসিতে পারে না। মনুষ্য নিজের ঘাড়ে দায়িত্ব লইয়াছে; সুতরাং এইখানে পাপপুণ্যের সমস্যা; ঐরূপে পাপপুণ্যের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং মনুষ্যই তাহার জন্য দায়ী।

"কোন্ কাজটা পাপ? কোন্ কাজটা পুণ্য? ইহার মীমাংসা করিবে কে? যাঁহারা ইহার মীমাংসার জন্য বিধাতা পুরুষের সৃষ্টি করিতে চাহেন, তাঁহাদের কৌশল প্রশংসনীয়, এক নিশ্বাসেই কাজ সারিতে চাহেন। সেই বিধাতা পুরুষ এক দিন বলিয়া দিলেন এই এই কাজ ভাল, এই এই কাজ মন্দ। সেই দিন শুভ ক্ষণে পাপপুণ্যের তপসীল বিধিবদ্ধ হইয়া গেল। কোন সৌভাগ্যশালী মানব কোনরূপে সেই তপসীলটা হস্তগত করিয়া এক-খানা খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছে। এখন সেই খাতাটা খুলিয়া দেখ, আর কোন চিন্তা থাকিবে না।

"একখানা পাকা খাতায় পাপপুণ্যের তপসীলটা লিপিবদ্ধ থাকিলে মানুষের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধা হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মানবসমাজে এইরূপ অনেকগুলি তপসীল বিভিন্ন খাতায় লিপিবদ্ধ দেখা যায়; কোন্‌টা প্রকৃত ও কোন্‌টা জাল, তাহা নির্দ্দেশ করিবার কোন উপায় দেখা যায় না। আপন দলের খাতার অকৃত্রিমতা প্রমাণ করিবার জন্য বিভিন্ন দলমধ্যে ঘোর বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে এবং বিতণ্ডা ক্রমে তীব্র হইয়া শোণিতপাতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাপি কোন্ খাতা জাল ও কোন্ খাতা অকৃত্রিম, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মতক্রমে স্বীকৃত হইল না। অগত্যা আমাদিগকে বাধ্য হইয়া অন্য উপায়ের আশ্রয় লইতে হইবে।

"পাপ কি? না, যাহা সমাজজীবনের প্রতিকূল। পুণ্য কি? না, যাহা সমাজজীবনের অনুকূল। সমাজজীবনের যাহা কিছু অনুকূল তাহাই যেন পুণ্য হইল, কিন্তু সমাজজীবনের অনুকূল কি? তাহা স্থির করিবে কে? এই কাজটা অনুকূল কি প্রতিকূল এইরূপ বিতণ্ডা উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা করিবে কে? এই মীমাংসার জন্য কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করিতে পারা যায় কি? মনুষ্যজাতির যুগব্যাপী অভিজ্ঞতা বলি-

তেছে যে, পায়া যায় না। প্রকৃতি মনুষ্যকে এমন কোন সংস্কার দেন নাই, যাহার সাহায্যে এই মীমাংসা অভ্রান্ত ভাবে চলিতে পারে। ব্যক্তি বিশেষের প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতায় যাহা প্রতিষ্ঠিত, তাহার ভিত্তি এত সঙ্কীর্ণ, তাহার দূরদৃষ্টি এত অল্পপ্রসার, তাহার নির্দ্দেশ এত অস্পষ্ট ও এত দ্বিধা-ভাবযুক্ত, যে তাহার উপর নির্ভর করা চলে না। ফলেন পরিচীয়তে এই ব্যবহারের উপর অনেক সময়ে নিরাপদে নির্ভর করা চলে। কোন্ কার্য্যটা সমাজজীবনের অনুকূল? না যাহা এতকাল পর্য্যন্ত মানবজীবনের অতীত ইতিহাস ব্যাপিয়া সুফল প্রসব করিয়া আসিতেছে। মনুষ্যসমাজ যুগ যুগান্তরের শিক্ষালাভে যাহাকে ভাল বলিয়া শ্রেয়স্কর বলিয়া জানিয়াছে,—যাহা সমগ্র মানবজাতির, সমগ্র মানবসমাজের কল্পব্যাপিনী শিক্ষায় ও অভিজ্ঞতায় উপার্জ্জিত, তাহার উপর নির্ভর করাই বোধ করি সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপৎ। এই অভিজ্ঞতার নাম শ্রুতি ও স্মৃতি। কোন্ দিন কোন্ শুভ ক্ষণে মানবজাতির এই জ্ঞানলাভ আরব্ধ হইয়াছে, ইতিহাস তাহা জানে না। পুরুষপরম্পরাক্রমে এই পুরাতনী অভিজ্ঞতা সংক্রামিত হইয়া আসিতেছে মাত্র। পুরুষের স্থান পুরুষান্তরে গ্রহণ করিতেছে। শত কোটী পিতার স্থান শত কোটী পুত্র গ্রহণ করিতেছে। পূর্ব্বপুরুষের মুখ হইতে পরপুরুষ সেই পুরাতনী বাণী শুনিয়া আসিতেছে; কিন্তু কবে কোথায় সেই বাণীর আরম্ভ, তাহা কেহ জানে না। চিরকাল সকলেই শুনিয়া আসিতেছে, প্রথমে কে বলিয়াছিল, তাহা কে জানে?

"ঐতিহাসিক কালে মানবসমাজে যাঁহারা নেতা ছিলেন, তাঁহাদের প্রজ্ঞাচক্ষু অতীতের অন্ধকার ভেদ করিতে পারিত, অন্যে যাহা দেখিতে পায় না, তাহা তাঁহারা দেখিতে পাইতেন; অন্যে যাহা শুনিতে পায় না, তাহা তাঁহারা শুনিতে পাইতেন; প্রজ্ঞাচক্ষুর সাহায্যে, অন্যে যাহা দেখিতে পায় না, তাহা তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহাদের

নাম ঋষি ; তাঁহারা যাহা শুনিতে পাইয়াছিলেন, তাহার নাম শ্রুতি ; তাঁহাদের শিষ্যপরম্পরা, তাঁহাদের পরবর্ত্তী পুরুষপরম্পরা, তাঁহাদের নিকট শুনিয়া যাহা স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার নাম স্মৃতি।

"মানবজাতির সেই প্রাচীন অভিজ্ঞতার শ্রুতির ও স্মৃতির তাৎপর্য্য উদ্ঘাটন করিয়া দিবে কে? ব্যক্তিবিশেষের প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করা চলে না ; মনুষ্যমাত্র একদেশদর্শী, মনুষ্যমাত্রেই পাশব ধর্ম্ম ও মানবধর্ম্ম উভয়ের বিরোধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া উদ্‌ভ্রান্ত ও ব্যাকুল। প্রজ্ঞা মানুষকে এক পথ দেখাইতেছে, সহজাত প্রাকৃতিক সংস্কার তাহাকে অন্য পথে চালাইতেছে। মনুষ্যের জীবনতরী কর্ম্মসাগরে ভাসিতেছে ; কোন্ পথে যাইতে হইবে, মানুষ ঠাহর পায় না। মনুষ্যসমাজ একবাক্যে যাঁহাদিগকে কাণ্ডারী বলিয়া নির্দ্দেশ করে, অগত্যা তাঁহাদিগের আশ্রয় লইতে হয়। সাধুসম্মত মার্গ আশ্রয় করিতে হয়। শ্রৌত ও স্মার্ত্ত বাক্যের তাৎপর্য্য যখন ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় না, যখন তাহা হেঁয়ালির মত ঠেকে, তখন মহাজনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। সংশয়সমাকুল মানবের নিকট শ্রুতি যখন নানারূপে কথা বলে, স্মৃতি যখন উপদেশ দেয় না, ধর্ম্মের তত্ত্ব যখন আঁধার গুহায় নিহিত বলিয়া বোধ হয়, তখন মহাজনসেবিত মার্গ অবলম্বন করিতে হয়। মহাজনের পন্থাই তখন পন্থা, শুধু সাধুসম্মত সদাচার তখন ধর্ম্মের প্রমাণ।

"শ্রুতির অর্থ যখন বুঝিতে পারি না, স্মৃতি যখন হেঁয়ালিতে কথা কহে, তখন কি তোমার আমার মত প্রজ্ঞাবলহীন ব্যক্তিকে কেবল সাধুর অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে হইবে? আমাদের অভ্যন্তরে শক্তি কি কিছুই নাই? আমাদিগকে কি চিরদিন পরের হাত ধরিয়া চলিতে হইবে? আমাদের মেরুদণ্ড কি এতই দুর্ব্বল? আমরা অপরের আশ্রয় না পাইলে

সংসারের সমাজক্ষেত্রে আপনার চরণদ্বয়ের উপর দাঁড়াইয়া বিচরণ করিতে পারিব না? জগতের এই কি বিধান? জীবজগতের উচ্চতম পদবীতে অবস্থিত মনুষ্যের পক্ষে কি এই ব্যবস্থা? আমরা কি তৃণের মত বন্যায় ভাসিয়া যাইব? নিজযত্নে গন্তব্য পথ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইব না? যে ধর্ম্ম-মীমাংসার সহিত আমাদের জীবনযাত্রার এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সেই ধর্ম্মমীমাংসায় আমরা স্বয়ং কি একবারেই অক্ষম? অন্যে চিনাইয়া না দিলে আমরা ধর্ম্মকে চিনিতে পারিব না? অন্যে না বলিয়া দিলে কি আমরা অধর্ম্মকে পরিহার করিতে পারিব না? মনুষ্যের অবস্থা কি এমনই শোচনীয়? উত্তরে বলিব—না। আমাদের অন্তস্তলে এক জন সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিয়া আমাদের কর্ত্তব্য মার্গের নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত রহিয়াছে; শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার যেথানে উপদেশ দেয় না, অথবা তাহাদের উপদেশ যেথানে আমরা বুঝিতে পারি না, সেখানে তাঁহার সেই নীরব বাণী নিঃশব্দে আমাদিগকে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিভেদ দেখাইয়া দেয়। সেই নীরব বাণী কাহার? আমাদের হৃদিস্থলে কোন্ হৃষীকেশ অবস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে সর্ব্বদা গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিতেছে? কর্ণধারস্বরূপ হইয়া জীবনতরীকে পথভ্রষ্ট হইতে দিতেছে না? আমরা তাহার নাম দিতে পারি সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, ইহাই সেই অন্তর্যামীর প্রেরণা।

"মানবের হৃদিস্থিত সেই অন্তর্যামীর প্রেরণা অনেকটা সহজাত সংস্কারের মত কাজ করে। মনুষ্য জন্মমাত্রই এই অন্তর্যামীর অধীনতা আশ্রয় করে। সহজ সংস্কার যেমন কারণ দেখায় না, প্রেরণ করে মাত্র; এই সহজাত ধর্ম্মপ্রবৃত্তিও সেইরূপ কারণ দেখায় না, একবারে বাদসাহের মত হুকুম চালায়। বলে—এই কাজটা ভাল, এই কাজটা মন্দ, তাহার কোন কৈফিয়ৎ দেয় না। একবারে বলিয়া ফেলে এই পথটা ভাল, এই পথে চল; এই পথ মন্দ, এই পথে চলিও না। মনুষ্য যদি মন্দ পথে চলিতে চায়, তখন তাহাকে পশ্চাৎ হইতে টানিয়া ধরে; মনুষ্য যথন জ্ঞানপথে

চলে, তখন নীরব উৎসাহধ্বনিদ্বারা তাহার পুরোগতির বেগ বাড়াইয়া দেয়। এই বিশিষ্ট মানবধর্ম্ম হইতে মানবেতর পশু পূর্ণ মাত্রায় বঞ্চিত। এই সহজাত ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যাহাকে ভাল বলে, তাহাই পুণ্য এবং যাহাকে মন্দ বলে, তাহাই পাপ। ভাল মন্দ বাছিয়া লইবার স্বাধীনতাও প্রকৃতি মনুষ্যকে দিয়াছেন। ঐ স্বাধীনতা হইতে মনুষ্যের যত দায়িত্বের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ স্বাধীনতার মূলে ভাল মন্দ বাছিয়া লইয়া মনুষ্য পাপপুণ্যের অধিকারী হয় এবং কর্ম্মফল ভোগ করে। তাই বলি হতভাগ্য মনুষ্যের জীবন পশু জীবনের ন্যায় দায়িত্ববর্জ্জিত যন্ত্রের মত হইলে, মনুষ্যজীবনে ক্লেশের ভার অনেকটা লঘু হইত সন্দেহ নাই।

"সে যাহা হউক, শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার এবং আত্মতুষ্টি বা হৃদিস্থিত অন্তর্যামীর পরিতোষ সকল ধর্ম্মের মূল ও প্রমাণ। অন্য প্রমাণের কল্পনা বোধ করি অনাবশ্যক।"

শুনিতে পাই, অনেকে রামেন্দ্রসুন্দরকে নাস্তিক মনে করিতেন। তাঁহারা কি ধারণার বশে, কি বিশ্বাসের বলে এবং কি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে নাস্তিক স্থির করিতেন বলিতে পারি না। মনে পড়ে এক দিন তাঁহার বাড়ীতে প্রতিমাপূজাসম্বন্ধে কয়েকজন ভদ্রলোকের মধ্যে বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। উভয় পক্ষই স্বমতের সপক্ষ নানাবিধ যুক্তি উপস্থিত করেন। রামেন্দ্রসুন্দর উভয়ের যুক্তি মনোযোগসহকারে শ্রবণ করিয়া প্রতিমাপূজার বিরোধীদিগের উদ্দেশে একটু হাসিয়া বলিয়াছিলেন—এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং যিনি বা যাঁহার শক্তি ইহার অতি সূক্ষ্মতম অণু পরমাণুর সহিত ওতপ্রোত ভাবে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন, অন্ততঃ আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র যাহা বলিয়া উপদেশ দেয়, সৃষ্টি ছাড়া তাঁহাকে একটা কিছু অনুমান করিবার প্রয়োজন কি? তাঁহার কোন স্বরূপ আছে কি না, তোমার আমার মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তিগণের

মাথায় না আসিলেও আমরা কোন্ সাহসে তাঁহার অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করিতে পারি? পুরাকাল হইতে এই কথা লইয়া বিতণ্ডা চলিতেছে এবং ভবিষ্যতেও চলিবে; কোন কালেই ইহার মীমাংসা হয় নাই, ভবিষ্যতে হইবে কি না বলিতে পারি না। আমাদের শাস্ত্র তাঁহাকে সর্ব্বময় ও সর্ব্বরূপ বলিয়া জানিতে শিক্ষা দিয়া আসিতেছে।" এই একটা সামান্য কথা হইতে সুধীগণ তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া লইবেন।

সমাজধর্ম্মপালনে তিনি চতুর্ব্বর্ণের উপর প্রতিষ্ঠিত বেদমূলক সামাজিক প্রথার অনুরাগী ছিলেন। কালভেদে ব্যবস্থাভেদের প্রয়োজনীয়তা তিনি অস্বীকার করিতেন না; এবং শত বৎসর পূর্ব্বে আচারবিষয়ে যে সকল শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ বর্ত্তমান ছিল, বর্ত্তমান কালে তাহার সকলগুলির উপ-যোগিতা না থাকিতে পারে, ইহা স্বীকার করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা পাওয়া যায় না এরূপ প্রচলিত প্রথার অনুবর্ত্তন না করিলে কোনরূপ প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, এরূপ ধারণা তিনি অন্তরে পোষণ করিতেন না।

একাদশী তিথিতে বিধবাগণের নিরম্বু উপবাসের ব্যবস্থাসম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া বর্দ্ধমান সেহাড়সোল রাজস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে যে পত্র * লিখিয়াছিলেন, তদুত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"পরম কল্যাণবরেষু—

একাদশী-তত্ত্ববিচারসম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছ। আমার মত ইংরাজী নবিশ অধ্যাপকের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্রসম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর চাহিয়াছ, ইহা বিস্ময়ের বিষয়, এই বিষয়ে উত্তর দেওয়া আমার ধৃষ্টতা।

একাদশীতে বিধবাগণের নিরম্বু উপবাসের ব্যবস্থা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের

* পত্রখানি (ঙ) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

মতে বাঙ্গালা দেশের কিয়দংশে চলিত আছে, বাঙ্গালার সর্ব্বত্র এ ব্যবস্থা চলিত নাই। বাঙ্গালার বাহিরেও এই নিরম্বু উপবাস সর্ব্বত্র চলে না, ইহাই আমি জানি।

যখন ভারতবর্ষের সমস্ত হিন্দুসমাজে ইহা প্রচলিত নাই, তখন ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে বলিয়াই বুঝিতে হইবে। বাঙ্গালার বাহিরে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব নাই। তৎসত্ত্বেও অন্যত্র যখন নিরম্বু উপবাস চলে নাই, তখন শাস্ত্রের বিধিসম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। রঘুনন্দনাদি ব্যবস্থাদাতারা শাস্ত্রকার নহেন, শাস্ত্রানুসারে ব্যবস্থাদাতা মাত্র, শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা মাত্র।

যে কোন ব্রাহ্মণের স্বাধীন ভাবে শাস্ত্রব্যাখ্যা ও শাস্ত্রের ব্যবস্থা দিবার অধিকার আছে। রঘুনন্দনের সহিত অন্য ব্রাহ্মণের এ বিষয়ে বিশেষ কিছুই প্রভেদ নাই। তবে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যবলে তৎকালে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি যে অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব সঙ্কলন করিয়াছিলেন তাহা book of reference-রূপে অসামান্য। তদবধি বাঙ্গালা দেশের পণ্ডিতেরা ঐ গ্রন্থখানি পঠন পাঠন করিয়াই সহজে ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়ী হইতেছেন। মূল ধর্ম্মশাস্ত্র গৃহ্যসূত্র এবং মনুসংহিতাদি ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ অধ্যয়ন করা কেহই আবশ্যক বোধ করেন না। কাজেই অদ্বিতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্ রঘুনন্দনের শিষ্যপরম্পরা কর্ত্তৃক বাঙ্গালাদেশে তাঁহারই মত চলিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার বাহিরে অন্য মত চলিয়াছে। ফলে প্রকৃত তত্ত্বটি এই—

বেদগ্রাহী সমাজের সমস্ত বিধিনিষেধ শ্রুতিপ্রমাণ। শ্রুতি অর্থে বেদের ব্রাহ্মণবাক্য। বেদের ব্রাহ্মণবাক্যের সহিত বিরোধী হইলে কোন স্মৃতিই প্রামাণিক নহে। এমন কি ঋষিপ্রণীত কল্পসূত্রাদি গ্রন্থের এবং মন্বাদিপ্রণীত সংহিতা গ্রন্থের উপদেশও অগ্রাহ্য। দুর্ভাগ্যক্রমে

ব্রাহ্মণ গ্রন্থের অধিকাংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। একাদশী-তত্ত্ববিষয়ে বেদের ব্রাহ্মণবাক্যে কিছুই পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। যে সকল বিধিনিষেধ গৃহ্যসূত্রাদি এবং মন্বাদির স্মৃতিশাস্ত্রে আছে, অথচ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে নাই, তাহা লুপ্ত বেদের অনুযায়ী বলিয়া ধরিতে হয়। গৃহস্থের দৈনন্দিন আচারসম্বন্ধে খুঁটিনাটি ব্যবস্থা এই শেষোক্ত গ্রন্থমধ্যেও সমুদায় পাওয়া যায় না। তজ্জন্য পুরাণাদির আশ্রয় লইতে হয়। পুরাণ গ্রন্থগুলিকেও এই জন্য লুপ্ত বেদানুযায়ী স্মৃতি বলিয়া মান্য করা হইয়া থাকে। আধুনিক শাস্ত্রব্যাখ্যাতৃগণ যে সকল বিধিনিষেধের সমর্থন গৃহ্যসূত্রে বা মন্বাদি সংহিতায় পান নাই, তাহার জন্য পুরাণের এবং মহাভারতাদি ইতিহাসের আশ্রয় লইয়াছেন। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যকে এই জন্য বহু স্থানে পুরাণের প্রমাণ দিতে হইয়াছে। কিন্তু পুরাণ গ্রন্থগুলির প্রামাণিকতা লইয়া নানা গণ্ডগোল আছে। শঙ্করাচার্য্যের মত মনীষী মহাভারতের প্রমাণ অশঙ্কোচে আশ্রয় করিয়াছেন, কিন্তু পুরাণের আশ্রয় লইতে সঙ্কুচিত হইয়াছেন।

প্রচলিত পুরাণমধ্যে কোন্‌খানা খাঁটি, কোন্‌খানা জাল, কোন্‌খানায় কতটা প্রক্ষিপ্ত আছে, ইহা লইয়া পণ্ডিতসমাজে মতভেদ আছে। বৈষ্ণবেরা বৈষ্ণব-পুরাণকে প্রাধান্য দেন, শৈবেরা শৈব-পুরাণকে প্রাধান্য দেন; কাজেই পুরাণের প্রমাণ আশ্রয়ে যে সকল ব্যবস্থা, তাহাতে দেশভেদে ও কালভেদে নানামুনির নানামত দাঁড়াইয়াছে। কাজেই কোন ব্যবস্থাদাতা যদি রঘুনন্দনের দত্ত পৌরাণিক প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া অন্য প্রমাণ দেখান, তাহাতে বিস্মিত বা ক্ষুব্ধ হইবার হেতু নাই।

ফলে বাঙ্গালা দেশে বিধবার নিরম্বু উপবাসের ব্যবস্থা ঘটনাচক্রে চলিয়া গিয়াছে ইহাই আমার বিশ্বাস। কোন ব্যক্তি যদি সরল চিত্তে অন্য দেশাচারচলিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাহাতে প্রত্যবায় ঘটিবে, তাহা আমি মনে করি না। তবে মোটের উপর সংযমের পক্ষে ব্যবস্থাই সমাজরক্ষার অনুকূল।

রঘুনন্দনের মতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত অন্য বর্ণ সংসারে নাই। ব্রাহ্মণের আচার শূদ্রেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করেন ভালই, না করিলে দোষ দেখি না।”

রামেন্দ্রসুন্দর ধর্ম্মপরায়ণ নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে ব্রাহ্মণ্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল। তিনি সংযত ভাবে আচারধর্ম্মের নিয়মগুলি যথাসাধ্য পালন করিতেন; অশন, বসন, ব্যবহার, প্রভৃতি কোন বিষয়ে কোন দিন উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব তাঁহার কার্য্যে বা চিন্তায় প্রকাশ পায় নাই। তিনি স্বীয় জনকের নিকট বাল্যকাল হইতে যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেই শিক্ষা তাঁহার অবলম্বনীয় ছিল; সেই শিক্ষাকেই তিনি বড় করিয়া লইয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বদেশবাসী ভ্রাতাদিগকে ঐ শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য তাহাদের সম্মুখে স্বয়ং আদর্শ পুরুষরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

সুরেশচন্দ্র বলিয়াছেন—“রামেন্দ্রসুন্দর ডিরোজিও যুগের প্রতিক্রিয়ার অবতার।” হেনরী ডিরোজিও যুগে প্রতীচ্য শিক্ষার ফলে যুবকগণ আচারধর্ম্মবিরোধী হইয়া উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় প্রদান করিত এবং উহা করিয়া তাহারা নিজেদের খুব বাহাদুর বলিয়া মনে করিত।

“প্রতীচ্য শিক্ষা রামেন্দ্রসুন্দরকে প্রাচ্য ভাবে প্রাচ্য সংযমে বঞ্চিত করিতে পারে নাই। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বলতম রত্ন রামেন্দ্রসুন্দর, প্রতীচ্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাধক রামেন্দ্রসুন্দর ‘আহেলে বিলাতী’ হইবার প্রলোভন সংবরণ করিয়া সেকালের বাঙ্গালার সাবেক চণ্ডীমণ্ডপের খাঁটি বাঙ্গালী হইয়া থাকা সৌভাগ্য মনে করিতেন। যে শিক্ষায় বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী রূপান্তরিত হইয়া অদ্ভুত ও উদ্ভটের উদাহরণ হইতেছে, তিনি সেই শিক্ষা আকণ্ঠ পান করিয়াও অভিভূত হন নাই। তিনি নীলকণ্ঠের মত

বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির মন্থন-সম্ভূত হলাহল স্বয়ং জীর্ণ করিয়া, তাহার অমৃতটুকু দেশবাসীকে দান করিয়া গিয়াছেন। বাল্য জীবনের পারিবারিক দীক্ষা তাঁহাকে রক্ষা-কবচের মত রক্ষা করিয়াছে। ডিরোজিও যুগের দেশহিতৈষণা, গণের কল্যাণকামনা, দেশহিতব্রতে অদম্য উৎসাহ রামেন্দ্রসুন্দরে পূর্ণভাবে বিকশিত হইলেও, সে যুগের কোন উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁহার জীবন ও চরিত্রে দূরে থাক্, তাঁহার চিন্তা বা তাঁহার কোনও সঙ্কল্পকেও স্পর্শ করিতে পারে নাই। আমার মনে হয়, এ ক্ষেত্রে তিনি ভাবী শিক্ষিত বাঙ্গালীর আদর্শ।"

রামেন্দ্রসুন্দরের একটা নিজস্ব ছিল, সেই নিজস্বের উপর নির্ভর করিয়া তিনি কর্ত্তব্যের পথে চলিয়াছেন, অনুকরণের প্রতি ফিরিয়াও চাহেন নাই। সুরেশচন্দ্র বলিয়াছেন—"ভবিষ্যতের বাঙ্গালী মধুকরের মত বিশ্বনন্দনের নানা ফুল হইতে মধুসঞ্চয় করিয়া মধুচক্র রচনা করিবে, কিন্তু সে চক্রে, সে মধুতে তাহার নিজস্ব থাকিবে। রামেন্দ্রসুন্দর স্বীয় জীবনে, চরিত্রে ও জীবনের কর্ম্মসমবায়ে সেই অনন্যসাধারণ নিজস্বের পরিচয় ও প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি ভাবী বাঙ্গালীর অগ্রদূত। নিজস্বে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে সম্মিলন হইলে যাহা হয়, তাহাই রামেন্দ্রসুন্দর। জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, ধর্ম্মে ও সাহিত্যে 'গোড়ামির' স্থান নাই, কিন্তু নিজস্বের যথেষ্ট অবকাশ আছে, রামেন্দ্রসুন্দর নিজের জীবনে বাঙ্গালীর উত্তর পুরুষের জন্য এই ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছেন।"

আচারধর্ম্মের সপক্ষে বা বিপক্ষে রামেন্দ্রসুন্দর যে অভিমত পোষণ করিতেন, নিম্নোদ্ধৃত রচনা হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

"আচার অর্থশূন্য, যুক্তিহীন ; ইহাতে উপকার নাই, ক্ষতি আছে ; ইহা অকারণে স্বাধীনতাসংহার করে ও বন্ধনস্বরূপ হয় ; ইহা অকারণে সংশয়যাতনা বাড়ায় ; ইহা সত্যগোপন ও প্রবঞ্চনার জন্য ব্যবহৃত হয়।

সর্ব্বত্রই এক ভাব, আচারমাত্রই বুঝি অস্বাভাবিক অর্থহীন ও কৃত্রিম, অপিচ সহস্র স্থানে ছলনা ও প্রবঞ্চনার অনুকূল। অথচ মনুষ্যজীবনে, বিশেষতঃ উন্নত মানবজীবনে, আচারের শাসন বোধ হয় প্রকৃতির শাসনকেও পরাজয় করে। বরং দুই দিন অনাহারে থাকিতে পারি, অথচ সমাজের কৃত্রিম নিয়ম লঙ্ঘন করিবার যো নাই। এমনি দুরন্ত শাসন। কাজেই আবহমান কাল হইতে যে শাসন চলিয়া আসিতেছে, বর্ত্তমান কালে তাহার উপযোগিতা আছে কি না, তাহা মানুষে ভাল করিয়া দেখিতে চাহে না; অথচ অনুপযোগিতা প্রতিপন্ন হইলেও তাহাকে স্থানচ্যুত করিয়া নূতনের আশ্রয়গ্রহণে সর্ব্বদা সাহস হয় না। মনুষ্য পুরাতনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, নবীনের যতই প্রলোভন ও আকর্ষণ থাক্, মানুষ পরিচিত পুরাতনকে ত্যাগ করিয়া অপরিচিত নূতনকে গ্রহণ করিতে অত্যন্ত আশঙ্কা করিয়া থাকে। ইহা মানুষের দুর্ব্বলতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই; কিন্তু দুর্ব্বলের জীবনরক্ষার জন্য এইরূপ সাবধানতার নিতান্ত আবশ্যক। অরণ্যমধ্যে সিংহ শার্দ্দূল নির্ভয়ে বিচরণ করে; কিন্তু দুর্ব্বল মৃগশিশু সর্ব্বদা ত্রস্ত থাকে। প্রকৃতি তাহাকে কোমল ললিত বপুখানি যে দিন দিয়াছেন, সেই দিনই তাহাকে আত্মরক্ষার জন্য চঞ্চল চরণ ও সচকিত অন্তঃকরণ প্রদান করিয়া ঔদার্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। মনুষ্য স্বভাবতই দুর্ব্বল। অপরিচিতের সম্মুখীন হইয়া তাহার সহিত সম্বন্ধ পাতিতে সে সহসা সাহসী হয় না। কাজেই সে পরিচিত পুরাতনকে চিরকাল জড়াইয়া থাকিতে চাহে। সেই জন্য মনুষ্যপ্রকৃতিতে একটা স্থিতি-প্রবলতা বিদ্যমান, সেই জন্য মানুষের নিকট প্রাচীনের এত আদর।

"সময়ে সময়ে ঐরূপ মনুষ্যসমাজেও এমন এক একটা লোক জন্মগ্রহণ করে, যাহার মেরুদণ্ড সমাজপ্রেরিত লৌহমুদ্গরে ভাঙ্গিতে পারে না, সে সমাজের রচিত শৃঙ্খল জোরের সহিত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া স্পর্দ্ধার সহিত

ঋজু পথে চলিতে চাহে। কবির ভাষায় তিনি অচলায়তনের বেড়া ভাঙ্গিয়া মুক্ত হয়েন ও অপর সাধারণকে মুক্তি দেন। আমরা এইরূপ ব্যক্তির অনুকরণে সাহসী হই না।

"পশুসমাজে যেমন সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে, মনুষ্যসমাজে তাহার কিছুই নাই। পশুসমাজের সদস্যগণ কোন প্রকার কৃত্রিম আচারের দাস নহে। এ বিষয়ে তাহাদিগকে ষোল আনা প্রশংসা পত্র দেওয়া যাইতে পারে। লোকাচার ও দেশাচারের যত কিছু খুঁটিনাটি, যত কিছু বন্ধন, সমস্ত এই মনুষ্যসমাজে বর্ত্তমান। মনুষ্যজীবনের প্রধান কার্য্য জগৎকে সুন্দর করিয়া লওয়া। যে শিব গড়িতে বসিয়া বানর গড়ে, তাহার শিল্প-চাতুরীর প্রশংসা করি না। মনুষ্যসমাজের সহিত পশুসমাজের এই খানে প্রভেদ। সম্প্রতি আমরা কৃত্রিম আচার পরিত্যাগ করিতে পারি না। কৃত্রিমতাই আমাদের মনুষ্যত্বের ভূষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমাজ হইতে কৃত্রিম আচার উঠাইয়া দিলে মানবসমাজ একবারে পশুসমাজে পরিণত হইবে। স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাইতে পারে, আরাম বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু যাহাতে মনুষ্যত্বের শোভা হয়, তাহাও সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইবে।

"অনেকে সমাজের সৌন্দর্য্যের ভিতর যুক্তির কথা আনিয়া উপস্থিত করেন। কালিদাস হিমালয়ের সৌন্দর্য্যবর্ণনা লইয়া তাঁহার মহাকাব্যের আরম্ভ করিয়াছেন; কিন্তু যদি তাঁহাকে যুক্তির দ্বারা সেই সৌন্দর্য্য প্রতিপন্ন করিতে হইত, তাহা হইলে তাঁহার মহাকাব্যের অবস্থা শোচনীয় হইত সংশয় নাই। অমুক জিনিষটা আমাকে ভাল লাগিতেছে, তোমার ভাল লাগে না, ইহা তোমার দুর্ভাগ্য; কিন্তু যুক্তির দ্বারা তাহার সৌন্দর্য্যপ্রতিপাদন আমার ক্ষমতার অতীত। সৌন্দর্য্য সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র যুক্তিহীন। ভূতত্ত্ববিদের নিকট হিমালয় ভূগর্ভ হইতে উৎক্ষিপ্ত শতধা বিদীর্ণ ও জীর্ণ পাষাণরাশির কঙ্কাল মাত্র; পৃথিবীর মানদণ্ডরূপে হিমালয়কে ব্যবহার করিতে তাঁহার

আপত্তি না থাকিতে পারে, কিন্তু গোরূপিণী ধরিত্রীর বৎসরূপে হিমালয়কে কল্পনা করিতে তিনি শিহরিয়া উঠিবেন, ইহা তাঁহার দুর্ভাগ্য।

"নরদেহকে অনাবশ্যক বসনভূষণে সজ্জিত করিলে তাহার সৌন্দর্য্য বাড়ে; কেন বাড়ে তাহা যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না।

"মনুষ্যসমাজের যে সকল প্রাচীন ঐতিহাসিক আচার ও অনুষ্ঠান এক্ষণে সমাজের হিতকল্পে আবশ্যকতারহিত হইয়াও বর্ত্তমান আছে, তাহাদের পক্ষে কোন যুক্তির অনুসন্ধানের প্রয়োজন দেখি না। এখন তাহাদের প্রধান কাজ জীবনের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন। অলঙ্কারের শোভার সহিত অলঙ্কারের ভার দুর্বহ হইয়া পড়ে। কৃত্রিম আচারবন্ধন সামাজিক মনুষ্যের স্বাধীন গতিকে পদে পদে ঠেকাইয়া দেয়, অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি সমস্ত সমাজবিধান চূর্ণ করিয়া মানবিকতাকে নিরাবরণ পাশবিকতায় পরিণত করিতে উৎসুক হইয়া উঠেন।

"বেদশাস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পরাশরপ্রণীত শাস্ত্র পর্য্যন্ত আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, পারমার্থিক জগতের কথা ছাড়িয়া দিয়া ব্যবহারতঃ এই জগৎকে ও এই জীবনকে বিবিধ আচারপালনদ্বারা সৌষ্ঠব-শালী করিয়া তুলিবার জন্য ব্রাহ্মণের আত্যন্তিক ব্যগ্রতা ছিল। অসুন্দরকে সুন্দর করিয়া তোলাই, অকাব্যকে কাব্যে পরিণত করাই, মানুষের প্রধান কার্য্য ও মনুষ্যত্বের গৌরবময় বিশেষণ। এই ব্যক্তিগত জীবনের প্রত্যেক অশোভন অসুন্দর স্বাভাবিক অনুষ্ঠানকে মহত্তর সমাজজীবনের সহিত কৃত্রিম সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া কৃত্রিম বেশে ও কৃত্রিম ভূষায় সজ্জিত করিয়া সংস্কৃত, শোভন ও সুন্দর করিয়া সংসারক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করাই ব্রাহ্মণপ্রণীত শাস্ত্রের বিধানের প্রধান উদ্দেশ্য। সমাজসংস্কারকগণের মধ্যে যাঁহারা ভাব-প্রবণতার একান্ত বশীভূত হইয়া অচলায়তনের বেড়া ভাঙ্গিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়া উঠেন, সমাজরক্ষক ব্রাহ্মণের প্রণীত শাস্ত্রের প্রতি

তাঁহাদের আক্রমণ কতটা যুক্তিযুক্ত তাহা এখনও বোধ করি সুধীজনের বিবেচ্য।”

ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রের প্রতি লেখকের অচলা ভক্তির ইহা একতর উদাহরণ। ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রোক্ত বিধি ও আচারধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অন্তরে কোনরূপ বিদ্বেষ ছিল না; কোনটাকেই তিনি অবজ্ঞার সহিত পরিহার করিতে সাহস করেন নাই, এবং সেই কার্য্যে প্রশ্রয়ও কখন দেন নাই।

দেশাচারসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—“আমাদের মধ্যে যাঁহাদের বিশ্বাস যে, প্রাচীন কালে এক দিন জনকয়েক ব্রাহ্মণ পরামর্শ করিয়া লাভের প্রত্যাশায় এই জঘন্য দেশাচারসকলের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং জনসমাজ ভয়ে হউক অথবা নির্বুদ্ধিতায় হউক, সেই সকল ব্যবস্থা নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আমি একমত নহি। ব্যক্তিবিশেষের বা শ্রেণিবিশেষের চেষ্টায় সমাজের ধারাবাহিক জীবন যে এইরূপে বিপর্য্যস্ত হইতে পারে, তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। আজকাল সমাজশরীরের সহিত জীবশরীরের তুলনা করা এবং সমাজের অন্তর্গত দেশাচারকে জীব শরীরোদ্গত ব্যাধিজনক বিস্ফোটকের সহিত তুলনা করা একটা প্রথা দাঁড়াইয়াছে। জীববিদ্যার অন্তর্গত আধুনিক নিদানশাস্ত্রে বিস্ফোটকের উৎপত্তির যে কারণ নির্দ্দেশ করে, তাহাতে এই তুলনা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বাহির হইতে রোগের বীজ শরীরমধ্যে লব্ধপ্রবেশ হইয়া বিস্ফোটকের সৃষ্টি করে। কিন্তু সমাজশরীরের অন্তর্ভূত পুরুষপরম্পরাগত প্রথাগুলিকে সকল সময়ে বাহির হইতে আগত বলিতে পারা যায় না। সমাজশরীরের বয়ঃক্রম অনুসারে তাহারা জৈবিক নিয়মমতেই আপনা হইতে উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও লয় পায়। সমাজশরীরকে ঠিক জীব শরীরের মত দুরন্ত প্রকৃতির মধ্যে অবস্থান করিয়া সহস্র প্রতিকূল শক্তি হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে হয়; এবং সেই আত্মরক্ষার প্রয়াসফলে তাহাতে বিবিধ

অঙ্গ ও বিবিধ অবয়ব ও বিবিধ যন্ত্রের বিকাশ হয়। জীবশরীরের মধ্যে কতকগুলা অবয়বের চিহ্ন দেখা যায়। শরীর-বিজ্ঞানে তাহাদিগকে vestigial organ আখ্যা দেয়। এই ক্ষুদ্র অবয়বগুলার জীবনধারণে ও জীবনরক্ষণে কোনরূপ উপকার দেখা যায় না; বরং সময়ে সময়ে তাহারা জীবনের সংহারক হইয়া উঠে। সাধারণতঃ তাহারা তাহাদের নিরর্থক, অনাবশ্যক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সমগ্র দেহের নিকট হইতে পুষ্টির ভাগ ও শক্তির ভাগ গ্রহণ করিয়া জীবনের প্রতিকূলতাই সাধন করে। ইহারা জীবনযাত্রার প্রতিকূল হইলেও আধুনিক জীববিদ্যার মতে বিস্ফোটকের বা ব্যাধির স্থানীয় নহে। জীবের ইতিহাসে এমন সময় ছিল, তখন তাহারা জীবের পক্ষে আবশ্যক ছিল, তখন তাহারাও জীবনের আনুকূল্য সাধনে নিযুক্ত রহিত। তদানীন্তন বহিঃপ্রকৃতির সহিত যুদ্ধ-ব্যাপারে জীবদেহকে সমর্থ করিবার জন্য তাহাদের আপনা হইতে বিকাশ হইয়াছিল। বহিঃপ্রকৃতির পরিবর্ত্তনসহ তাহাদের আবশ্যকতা অন্তর্হিত হইয়াছে, এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে কাজেই তাহাদের অস্তিত্বও বিলোপের অভিমুখে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। সমাজশরীরে দেশাচারগুলাও কতকটা যেন সেইরূপ। সমাজের অতীত ইতিহাসে বিশেষ প্রয়োজনসাধন উদ্দেশে তাহাদের আবির্ভাব হইয়াছিল; এখন সেই প্রয়োজনের অভাব হওয়ায়, তাহারা অনাবশ্যক ও জীবনের যন্ত্রণাদায়ক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বিনা অন্য কোন প্রণালী নাই, যাহাতে তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন সময় সাপেক্ষ; এবং সেই দিনের প্রতীক্ষা করাই সঙ্গত। সমাজশরীরের চিকিৎসক তুমি বিস্ফোটকভ্রমে যেখানে সেখানে ছুরিকা চালাইলে সর্ব্বত্র সুফল লাভ নাও হইতে পারে।"

সনাতন ধর্ম্মসম্বন্ধে লেখক বলিয়াছেন,—

"যাঁহার আসক্তি নাই, যাঁহার চিত্ত জ্ঞানে অবস্থিত, তিনি কর্ম্মবন্ধন-

মুক্ত। এই কর্ম্মাকর্ম্ম বিচারের জন্য বেদপন্থীর ধর্ম্মশাস্ত্র। ধর্ম্মশাস্ত্রমতে কর্ম্মের প্রমাণ চতুর্ব্বিধ—'শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচার আত্মনস্তুষ্টিরেবচ'—শ্রুতির অর্থে বেদোক্ত সনাতনী বাণী, স্মৃতি অর্থে মহাজনকৃত স্মৃতির তাৎপর্য্যব্যাখ্যা, সদাচার অর্থাৎ মহাজনের অবলম্বিত পন্থা, এবং সকলের উপর আত্মতুষ্টি—আত্মার পরিতোষ;—যিনি সকল তত্ত্বের হেতুভূত, সকল চরাচরের নিদান, যিনি আপনাকে জীবরূপে পরিণত করিয়া স্বকল্পিত জগতের সমীপে আপনাকে যজ্ঞীয় পশুরূপে আহুতি দিয়াছেন, তিনিই সেই বৃহৎ জগতের সহিত জীবের সামঞ্জস্যসাধনে, অন্তর্যামী স্বরূপে কর্ত্তব্যনির্ণয়ে পরম সহায়, দুর্গম সংসারযাত্রায় যেখানে কোন আলোক পাওয়া যায় না, যেখানে শ্রুতিস্মৃতিসদাচারও গন্তব্য নির্দ্দেশ করে না, সেইখানে সেই অন্তর্যামী সহায়;—'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি' বলিয়া আহ্বান করিলে অন্তর্যামী সাড়া না দিয়া স্থির থাকিতে পারেন না।

"যে শাশ্বতী বাণী, যে সনাতন শব্দ, বিশ্ববিধাতার চতুর্মুখ হইতে সমীরিত এবং যুগে যুগে ঋষিমুখে প্রচারিত ও মহাজন কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়া এই প্রাচীন সমাজে লোকস্থিতির সহায় হইয়াছে, যে সনাতন ধর্ম্ম সহস্র বিপ্লবে এই পুরাতন সমাজকে ধারণ করিয়া আসিতেছে এবং বহু অনার্য্যআক্রমণ সত্ত্বেও এই আর্য্য সমাজের বিশুদ্ধি ও বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে, সেই বাণী, সেই শব্দ, সেই ধর্ম্ম আমাদের এই বিপত্তির দিনে পথপ্রদর্শক হউক। স্বধর্ম্মে রক্ষিত হইলেই আমরা রক্ষিত হইব—ইহাই এই ক্ষুদ্র লেখকের ধ্রুব বিশ্বাস। আর যদিই বা নিয়তির প্রেরণায় আমরা রক্ষিত না হই, যদিই বা মহাকালের চক্রতলে পিষ্ট হইয়া আমাদের জাতীয় জীবনের ধ্বংস হইবে, ইহাই আমাদের নিয়তি হয়, তাহা হইলে আমাদের আর্য্যবিশিষ্ট ভাব রক্ষা করিয়াই যেন আমরা বিনষ্ট হই,

ইহাই প্রার্থনা—কেন না, ভগবান্ অঙ্গুলিসঙ্কেতে উপদেশ দিতেছেন—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।"

আমরা উপসংহারে বলিতে পারি, শুধু বিদ্যাচর্চ্চা করিয়া বিষয়জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই মানুষ পণ্ডিত নামে আখ্যাত হয় না। পণ্ডিতের আটটি গুণ থাকা আবশ্যক।

> "গর্ব্বং নোদ্বহতে ন নিন্দতি পরং ন ভাষতে নিষ্ঠুরং
> প্রোক্তং কেনচিদপ্রিয়ঞ্চ সহতে ক্রোধঞ্চ নাবলম্বতে।
> জ্ঞাত্বা শাস্ত্রমনেকলক্ষণযুতং সন্তিষ্ঠতে মূকবদ্
> দোষাংশ্ছায়তে গুণান্ বিতনুতে পাণ্ডিত্যমষ্টাগুণম্॥"

বিদ্যার সহিত যাঁহার চিত্ত ঐ আটটি গুণে ভূষিত হয়, তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দরের চরিত্র ঐ আটটি গুণে অলঙ্কৃত ছিল। তাঁহার মনে অহঙ্কার ছিল না, তিনি ভুলিয়াও কখন পরনিন্দা করিতেন না, কদাপি নিষ্ঠুর বাক্য মুখে আনিতেন না, কটু কথা শুনিয়াও স্তব্ধ রহিতেন, কখন ক্রোধের আশ্রয় লইতেন না, সমুদয় শাস্ত্র জানিয়াও মূকবৎ ছিলেন, পরের দোষ গোপন করিতেন এবং পরের গুণকীর্ত্তনে সহস্রমুখ ছিলেন। সুতরাং তিনি যথার্থ পাণ্ডিত্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর পিতৃপুরুষের তপঃসঞ্চিত পুঞ্জীভূত পুণ্যপ্রভাবে যে মধুর পবিত্র চরিত্র লাভ করিয়াছিলেন, সেই পবিত্র চরিত্রের মাধুর্য্যগুণে তিনি এত অল্পকালের মধ্যেই জনপ্রিয় হইয়াছিলেন, এবং পরকে আপনার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদর্শিত পবিত্র পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমাদিগকে জীবনের পথে যাত্রা করিতে হইবে। তাই বলিতেছি হে মহাপ্রাণ! তুমি নিজের জীবনকাল অতিবাহন করিবার জন্য এবং স্বদেশের কল্যাণসাধনের জন্য যে পথ বাছিয়া লইয়াছিলে তাহা অতি সরল,

প্রশস্ত, বিঘ্নবিহীন পবিত্র পথ। সে পথে চলিতে গেলে কাহার সহিত সংঘর্ষ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, সে পথে হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, কোলাহল নাই। নরশোণিতপাতে ঐ পথের ধূলিকণা কখন পঙ্কিল বা কলঙ্কিত হয় না, চলিতে চলিতে দস্যুতস্কর কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অনাহারে শীর্ণ দেহে সেই পথের পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়া রোদন করিতে হয় না। কি করিলাম কি হইল, কোথায় চলিলাম বলিয়া কাহাকেও আক্ষেপ করিতে হয় না। তোমার চিনিবার ক্ষমতা ছিল, তাই তুমি ঐ পথ বাছিয়া লইয়াছিলে। তোমার জীবনের পথ ফুরাইয়াছে, কিন্তু তুমি সেই পথে যে কর্ম্মভার বহন করিবার মানস করিয়াছিলে তাহা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। পথ অনন্ত, কিন্তু জীবন স্বল্প, ইহা নিয়তির বিধান। তুমি পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া তোমার বোঝা বহিবার জন্য অনুগামিজনকে উৎসাহ প্রদান কর; সেই উৎসাহবাক্য যেন এই মৃতকল্প জাতির দেহে সঞ্জীবনী সুধা বর্ষণ করিয়া নবজীবনের সঞ্চার করে।

হে মহাপ্রেমিক, তুমি ভালবাসিতে জানিতে। তোমার হৃদয়খানি ভালবাসাতে পূর্ণ ছিল। তোমার নিঃস্বার্থ প্রেমে কামনার গন্ধ ছিল না। মাতৃভূমিকে ভালবাসিয়াই তুমি সুখ পাইতে, তাই তনু মন প্রাণদিয়া তাহাকে ভালবাসিয়াছিল; কখন প্রতিদান আকাঙ্ক্ষা কর নাই। তুমি তোমার প্রিয় জন্মভূমিকে ভালবাসিয়াছিলে; সেই ভালবাসার জন্য তোমার জীবনপণ। তুমি তাহার জন্য দেহপাত করিয়াছ। তুমি মহাজন, মহাজন যে পথে গমন করে সে-ই পথ। তুমি অনুগামী ভ্রাতৃগণকে সেই পথ দেখাইয়া দাও; তোমার আশীর্ব্বচন শিরে বহন করিয়া তাহারা যেন সেই মঙ্গলময় পথে নির্ভয়ে অগ্রসর হইতে পারে।

তুমি আসিয়াছিলে, চলিয়া গিয়াছ; আমরা আসিয়াছি, চলিয়া যাইব; যাহারা আসিবে, তাহারাও চলিয়া যাইবে। জগতে কেহ থাকিতে আসে

রামেন্দ্র পান্থনিবাস

৫১৩ পৃষ্ঠা
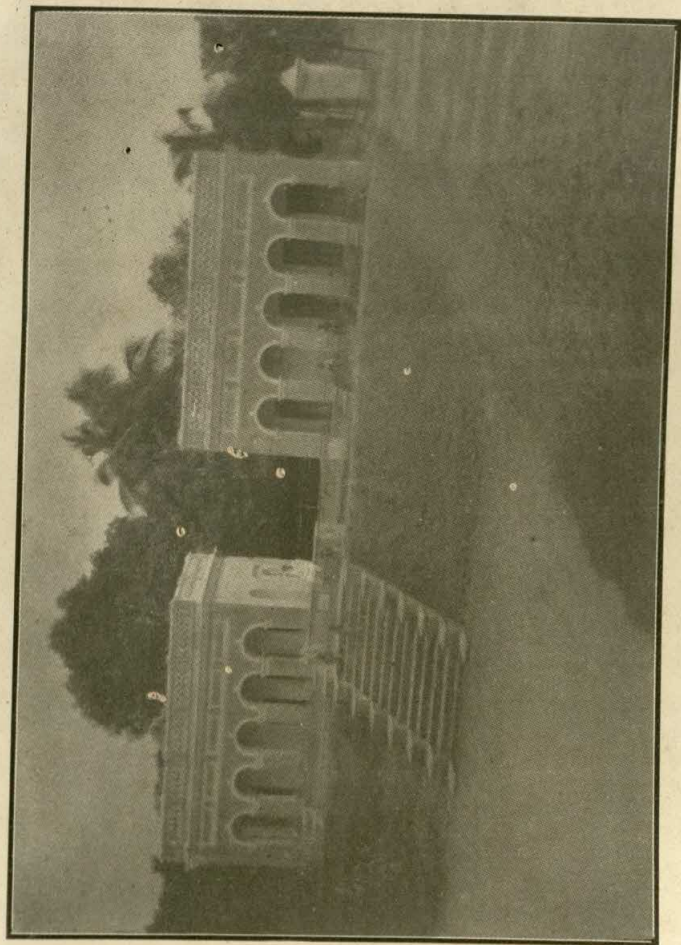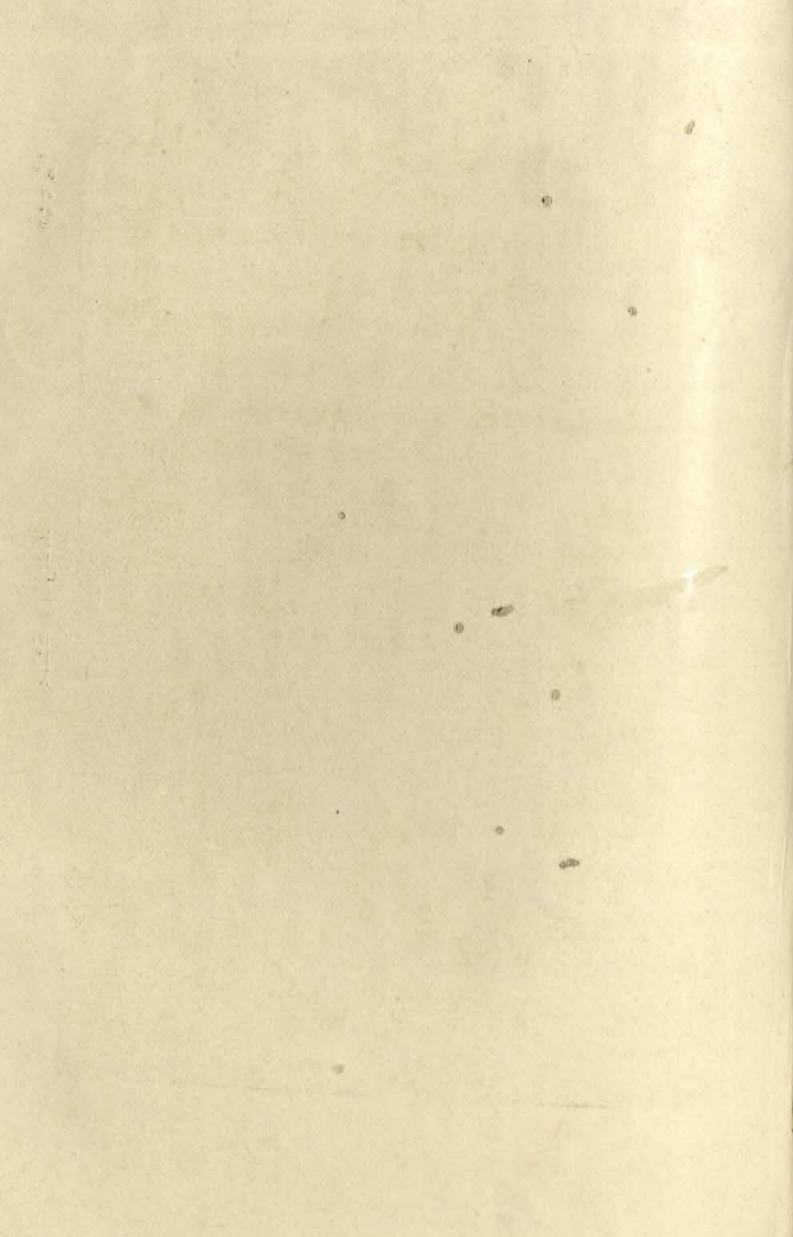
নাই, যাইবার জন্যই আসিয়াছে, যাইবার জন্যই আসিবে, তাহা জানি। যাহারা জগতের ভারস্বরূপ তাহারা যায় যাউক, ক্ষতি নাই; কিন্তু যাহার যাইবার কারণে জগতের ক্ষতি হয়, জগৎ তাহাকে যাইতে দেয় কেন? এ রহস্য কে বলিয়া দিবে? ইহাও নিয়তির বিধান।

পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব নিয়তির বিধানে আবর্ত্তময় জগৎ-প্রবাহের উপরিস্তরে ক্ষণে ক্ষণে ভাসিয়া উঠে, বুঝিতে পারি; জগন্নিয়ন্তার কোন্ নিয়মে তাহা স্বকার্য্যসাধন অসমাপ্ত রাখিয়া বুদ্বুদের মত অন্তর্হিত হয়, তাহা বুঝি না।
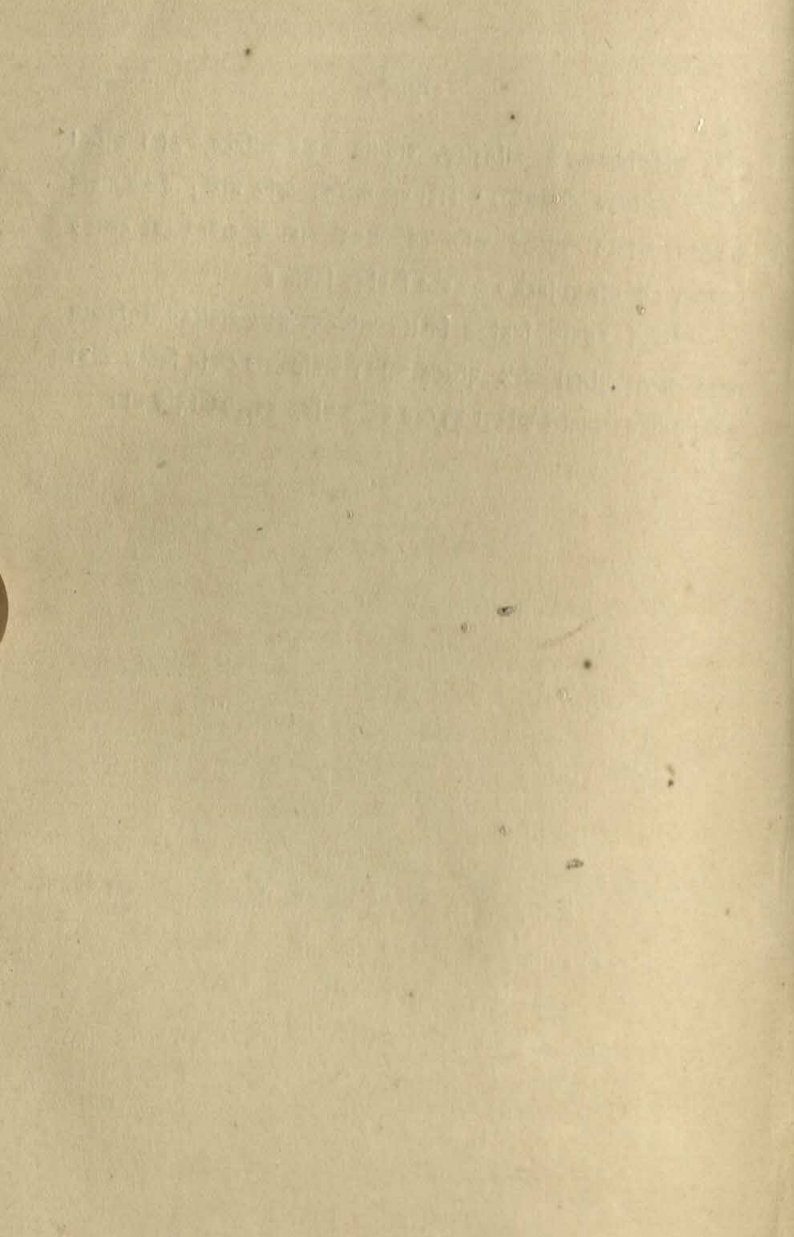
পরিশিষ্ট

(ক)

রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতিমন্দির

লালগোলার স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর রামেন্দ্রসুন্দরের জন্মভূমি জেমোকান্দিতে তাঁহার পবিত্র স্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি তরাগ খনন করাইয়া তাহার তীরে হিন্দু ও মুসলমানদিগের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র পান্থনিবাস নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ঐ কার্য্যে রাজা বাহাদুরের পনর হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। ১৩৩০ সালের ৯ই বৈশাখ সমারোহের সহিত স্মৃতিমন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষে অপরাহ্নকালে পান্থনিবাসের পুরোবর্ত্তী প্রাঙ্গণে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। পণ্ডিত প্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্, এ, সি, আই, ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। প্রায় দুই সহস্র লোক সভাস্থলে সমবেত হন। কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, তাঁহার পুত্র মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী, লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাদুর, ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, রিপন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত আনন্দকৃষ্ণ সিংহ, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধিগণ এবং প্রবাসী, ভারতী ও ভারতবর্ষের লেখকগণ আনন্দের সহিত সভায় উপস্থিত হইয়া সভার অনুষ্ঠাতৃগণের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাদুর, ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রভৃতি বঙ্গের বিখ্যাত সাহিত্য-সেবকগণ সভাস্থলে বক্তৃতা করেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের শান্তিপূর্ণ নিবাস পরিত্যাগ করিয়া দারুণ গ্রীষ্মকালে সুদূর রাঢ়ভূমিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহা সেই পরলোকগত মহাত্মার প্রতি তাঁহাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধাভক্তির নিদর্শন। ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জেমোকান্দি হইতে ফিরিয়া গিয়া লিখিয়াছেন—"একটা মানুষের—এক জন অধ্যাপকের স্মৃতি রক্ষার উৎসবে যে এমন সমারোহ হইতে পারে, এত ভদ্রসজ্জনের সম্মেলন ঘটিতে পারে তাহা আমরা কল্পনায় আনিতে পারি নাই। রামেন্দ্র যে কত বড় ছিল, তাহার গ্রামে ও জেলায় এবং প্রতিবেশী অন্য সকল জেলার ভদ্র শিক্ষিত সমাজের মধ্যে তাহার এতটা প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল, সে ধারণা আমাদের ছিল না। তাহার স্মৃতিরক্ষা খাঁটি দেশীয় বাঙ্গালী পদ্ধতি অনুসারে হইয়াছে। সে বন্ধুর রূঢ় রাঢ় দেশে, শুষ্ক ব্রহ্মডাঙ্গায় এক তরাগ খনন করাইয়া বহু গ্রামের জলাভাব দূর করা হইয়াছে, আর সেই বাপীতটে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য দুইটি পান্থশালা নির্ম্মাণ করান হইয়াছে। এই রাম-আশ্রমে যে শ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের তৃষ্ণার জ্বালা দূর হইবে, শ্রান্তি ও ক্লান্তি অপসারিত হইবে, তাহা ভাবিলেও প্রাণে একটা অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। রামেন্দ্র যেমন মানুষ ছিল, তাহার স্মৃতিরক্ষা তেমনই উপযোগী ভাবে হইয়াছে।"

(খ)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারসাধনকল্পে ভারত গবর্ণমেণ্ট
য়ুনিভারসিটি কমিশন নিযুক্ত করেন। সেই কমিশন
কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া রামেন্দ্রসুন্দর আমাদের
দেশের শিক্ষাসংস্কারসম্বন্ধে যে মন্তব্য
প্রকাশ করেন, তাহা নিম্নে
উদ্ধৃত হইল।

"I confess that I feel a degree of diffidence in submitting to the Commission my views on the questions that have been forwarded to me for expression of my opinion on them. Each of the questions is broad and comprehensive in its nature, and will require careful thought and mature judgment for an answer, A reasoned and carefully thought-out reply may require a number of pages ; a short categorical statement embodying an opinion either in affirmation or negation will be almost useless. The questions cover a wide field of investigation and open up important aspects of fundamental principles and their applicability to the present conditions and circumstances of Indian education. What is of fundamental importance as a principle conforming to a definite ideal, aim or object, may not be easy of application. Every institution has a history behind it and it will not do to judge of the merits of the institution apart from the accidents and circumstances that have given it its present shape. No argument based on principles alone which may suggest revolutionary changes in structure and constitution without reference to the determining factors of environment, past or present, will have any value for practical reformers. The University of Calcutta is altogether a foreign

plant imported into this country, belonging to a type that flourished in foreign soil. The importation was an urgent necessity of the time, suddenly created by the abrupt introduction of new conditions of life with a new order of political situation ; the founders of the new educational system had not the time to study the ideals and methods that were indigenous: the new system was introduced in entire ignorance and almost in complete defiance of the existing social order regulating the every-day life of an ancient people. It was a temporary device necessitated by a sudden emergency. The framers of the device had to plan out a machinery, but had not the opportunity to think out whether it would organically blend with the life, spiritual and secular, of the people for whose benefit it was intended.

"The University, however, has not failed as an institution and as a machinery. It has done admirably the work that it was primarily intended to do. It has admirably served the purpose for which it was primarily intended. It has given the State a body of faithful and able servants, that have done and have been doing their duty in the new political situation created by British rule : it has produced a body of cultured citizens that are wielding their legitimate influence on civic life under the conditions introduced by close contact with the West. What is more valuable still, it has broadened the very base of life of an Oriental people hitherto accustomed to move along the narrow lines and ways of their own, in the seclusion imposed upon them by their own history and their own geography. Western thought and western culture brought to us through the Universities have widened our field of vision, have placed before us new duties, have created new aspirations and to-day the land is astir with the promptings of a new life, struggling to

participate in the eternal conflict of life in the world : striving to bring forth a type of Indian humanity, which, broadly and securely based on the foundations of its own special culture, will assert itself in the presence of the Manhood of the world.

"A celebrated French chemist began his well-known work on the history of Chemistry with the words "Chemistry is a French Science". Chemistry at all events, has outgrown that stage of development in which any particular people may claim it as its own. True Science, or *Vidya*, as we call it in India, is not a commodity, to the use of which any particular people can lay claim as a monopoly, whatever be that people's share in its manufacture. Science with its intrinsic worth and its practical usefulness is of universal interest, and cannot in its very nature be the exclusive possession of any race or people. Knowledge, whether Eastern or Western in its origin and development, constitutes the spiritual treasure of all humanity ; but varied may be the methods in its pursuit. Each race and each people may be allowed to have its own way in the pursuit, the acquirement and the advancement of knowledge in accordance with its special instincts, special aptitudes and special characteristics. Knowledge of the western sciences cannot be withheld from an eastern people, as something alien to them ; but an eastern people may still be allowed its possession by methods and means best suited to their traditions and their needs.

"There are men more competent than myself who will give practical and suggestive hints in reply to the questions put by the Commission, pointing out the ways to reform of the University in the existing circumstances of the country. I, on my part, may more profitably confine myself to a brief statement of the aims and ideals of high education as understood and

plant imported into this country, belonging to a type that flourished in foreign soil. The importation was an urgent necessity of the time, suddenly created by the abrupt introduction of new conditions of life with a new order of political situation ; the founders of the new educational system had not the time to study the ideals and methods that were indigenous: the new system was introduced in entire ignorance and almost in complete defiance of the existing social order regulating the every-day life of an ancient people. It was a temporary device necessitated by a sudden emergency. The framers of the device had to plan out a machinery, but had not the opportunity to think out whether it would organically blend with the life, spiritual and secular, of the people for whose benefit it was intended.

"The University, however, has not failed as an institution and as a machinery. It has done admirably the work that it was primarily intended to do. It has admirably served the purpose for which it was primarily intended. It has given the State a body of faithful and able servants, that have done and have been doing their duty in the new political situation created by British rule : it has produced a body of cultured citizens that are wielding their legitimate influence on civic life under the conditions introduced by close contact with the West. What is more valuable still, it has broadened the very base of life of an Oriental people hitherto accustomed to move along the narrow lines and ways of their own, in the seclusion imposed upon them by their own history and their own geography. Western thought and western culture brought to us through the Universities have widened our field of vision, have placed before us new duties, have created new aspirations and to-day the land is astir with the promptings of a new life, struggling to

participate in the eternal conflict of life in the world: striving to bring forth a type of Indian humanity, which, broadly and securely based on the foundations of its own special culture, will assert itself in the presence of the Manhood of the world.

"A celebrated French chemist began his well-known work on the history of Chemistry with the words "Chemistry is a French Science". Chemistry at all events, has outgrown that stage of development in which any particular people may claim it as its own. True Science, or *Vidya*, as we call it in India, is not a commodity, to the use of which any particular people can lay claim as a monopoly, whatever be that people's share in its manufacture. Science with its intrinsic worth and its practical usefulness is of universal interest, and cannot in its very nature be the exclusive possession of any race or people. Knowledge, whether Eastern or Western in its origin and development, constitutes the spiritual treasure of all humanity; but varied may be the methods in its pursuit. Each race and each people may be allowed to have its own way in the pursuit, the acquirement and the advancement of knowledge in accordance with its special instincts, special aptitudes and special characteristics. Knowledge of the western sciences cannot be withheld from an eastern people, as something alien to them; but an eastern people may still be allowed its possession by methods and means best suited to their traditions and their needs.

"There are men more competent than myself who will give practical and suggestive hints in reply to the questions put by the Commission, pointing out the ways to reform of the University in the existing circumstances of the country. I, on my part, may more profitably confine myself to a brief statement of the aims and ideals of high education as understood and

believed in India, and of the contrast in these respects between the India that has come from the past, and the India that has come newly into being under influences from without. In speaking of India, I will mean Hindu India, for of Muhammedan India, which lies alongside of Hindu India, I do not feel myself competent to speak, though I do not believe that there is any real conflict in essential points between the two, so far as educational matters are concerned.

"Very recently there was a movement for the establishment of an agency and of institutions for the purpose of imparting high education *on national lines* and under *national* control, free from the control of Government and acting alongside but independently of the existing Universities. The movement has not so far been successful, but it engaged the serious attention of some of the most prominent leaders of the people in the province. The attempt of the Government to bring the existing Universities under more effective official control by the passing of the new Universities Act, had the effect of evoking discontent and almost a spirit of revolt. The spirit has not yet died out. The foundation of the Hindu University of Benares though under Government auspices and on the strength of a Government charter, was a measure taken up by Government in satisfaction of a popular demand. The very successful Bolpur Institute of Sir Rabindra Nath Tagore and the still more recent Research Institute of Sir J. C. Bose may be regarded as tangible instances of materialisation of the same spirit that is working in the country and among a people newly awakened to a sense of racial self-consciousness : and it will be unwise not to take cognisance of this new spirit in any serious attempt at reform of the educational institutions and agencies under direct control of the Government. It is not

practicable, neither is it desirable, to try to build anew on entirely new foundations ; it is doubtful if any revolutionary changes in aims and methods will succeed even if attempted. But the time has arrived for reconsideration of the whole question of education from a new point of view. Two sets of ideals with corresponding methods of their realisation,—a set of ideals and methods indigenous to the soil and a second set imported from abroad,—should be placed side by side and a comparative study be made of them in their relation to existing conditions and exigencies of the present situation. The points of contrast must be carefully studied. The distinguished educationists to whom the work of reform has been entrusted may thus derive some help in thinking out a possible scheme of reform which will place our educational methods on lines more in accord with the people's needs and the people's aspirations, and in better harmony with the people's cherished ideals and traditions.

"India, then, I take to be the seat of a special type of culture, which has developed or decayed in adapting itself to an ever-changing environment, in compliance with the laws of historic growth. What is *Vidya* (Knowledge or Learning in the broadest sense) is, in its peculiarly indian aspects, an expression of that special type of culture with which the name and fame of Innia is so closely associated. The systems and methods of education that have prevailed in India have had as their object the preservation, the advancement and the transmission of its *Vidya.* There have been very many theories about the aim and object of education and they have had their applications ; but India has had a theory of her own and Indian educational methods, that is, those that are of indigenous origin and growth, have been based, for good or evil, on that

theory. The object of education has been defined elsewhere to be the production of the complete man, the man successful in holding his own in the struggle for life without hindering the legitimate growth of life in others ; the manufacture of the perfect citizen, who with enough freedom for self-development, will still be a willing and efficient factor in the corporate life of the community of the State. A human being is a person with an individuality of his own, he is further a citizen, a member of the State, in which his individuality has often to be merged. The aim of education is to co-ordinate and reconcile the two aspects of his personality, to allow him freedom for self-development in compliance with and often in subordination to the requirements of his citizenship. The aim is success in life consistently with the strength and safety te.

"The Indian theory of education was laid down in distinct and specific terms in the Indian Scriptures ; and this theory has ruled Indian life for over thirty centuries at the least and it requires definitely to be stated.

"It will not be possible for me here to substantiate my statement if challenged by any with the necessary evidence or with necessary references to authorities and texts in support of it. But I have carefully sifted the evidence afforded by the material at disposal and will use cautious and carefully worded language. The Indian theory of educatian may be enunciated as follows ; every man is born with certain moral obligations—*Rinas* or debts as they are technically called :

(1) Debts to the Higher Powers that govern his being in their inscrutable ways, (2) Debts to his ancestors including the fathers of the race, (3) Debts to his neighbours pure fellowmen, (4) Debts to all sentient creatures that in a

way minister to his life's needs, and above all, (5) Debts to the *Rishis* or the ancient founders of the particular type of culture to which his life must conform. Real success in life—true self-realization—consists in the supreme satisfaction that a man derives from paying off all the debts and leaving the world with the clean conscience of a free man, a man who has freed himself from all obligations to the entire environment that gave him his being and moulded his life.

"The question of success in the popular wordly sense being the end and aim of life here cannot arise. Every debt has a corresponding duty to be discharged, and the discharge of the duty, and not success, is the goal of existence. The best education is that which qualifies a man to do his duty. The debt to the *Rishis* is given, with absolute unanimity, the first and foremost place in the list of life's obligations, and the way to pay off the debt is the cultivation of *Vidya*—the pursuit of knowledge for its own sake. The ceremonial performance of duty is called *Yajna* or sacrifice, and the pursuit of knowledge is the most binding of all *Yajnas*.

"*Vidya* is the heritage that has come down from the *Rishis*, the founders of racial culture ; it is the treasure that has been bequeathed to all coming generations to be kept and preserved. It has to be passed on to all succeeding generations as a sacred legacy, to be kept intact, pure and unsullied. The debt that a man owes to the *Rishis* is paid off if he succeeds in maintaining the purity and the integrity of the *Vidya* handed on to him. To pay off the debt requires an act of sacrifice, a *Yajna* which as a duty is incumbent on every man having a place in the community. It is a moral obligation and there is no shrinking from it.

"*Vidya* gives a man the second birth that places individual

life in proper relation to communal life. A man that has not been formally declared by his teacher as having gone through the necessary course of discipline in the pursuit of *Vidya* under him, is according to strict theory an unregenerate man, a man who cannot be admitted to full social rights and privileges, a man who cannot be permitted to marry even and leave lawful progeny.

"Education was thus made compulsory for every freeborn Indian, even for the tiller of the soil and the tenderer of the cattle. It was compulsory, because an uneducated man was practically denied full social status. It involved a corresponding duty on the part of the community to devise an organisation for imparting education to every member of it, a living, self-acting organisation that would endure independently of any driving mechanism anywhere constantly supplying its motive power and consciously regulating its work. The problem was serious, but old India solved the problem in a way that hardly finds a parallel elsewhere. The organisation that was devised has stood the test of time, and has lived and endured through thirty troublous centuries, and, though moribund and decaying at present contains the germs of life even today.

"I refer to the indigenous system of high education still current in the country, which may be called the *Tol* system. A relic and a survival, it still imparts high education of a certain type and standard, to tens of thousands of eager students who still seek the shelter of the numerous small establishments that lie scattered over the whole country. It has kept alive the ancient Learning or *Vidya* of India, and what is more valued still, it has kept alive an Ideal in almost its pristine purity, an Ideal that India may claim as exclusively her own.

"Speaking for myself, I am indebted for what is the most valued possession of my life to the benefits of western education received under the auspices of my own University. The old learning as it is imparted in our *tols*, with its narrowness, its one-sidedness, its want of breadth and comprehensiveness, has no very particular charm for me ; but I cannot but deplore the falling-off, the deterioration of the Ideal. Western education through the agency of the Universities has renovated our life, has given it vigour, has given it expansiveness ; it has raised high hopes and aspirations. We have been gainers on the whole, perhaps ; but I cannot be blind to and cannot but comtemplate with sadness, the very many contrasts between the old and the new, that have followed the falling-off of the Ideal. I may be permitted to dilate briefly on some of these contrasts.

(1) According to the Indian theory, *Vidya* is an end by itself ; knowledge must he pursued for its own sake, quite irrespective of any prospect of worldly success. Pursuit of knowledge is a duty ; it is *dharma*, it is a *Yajna* or sacrifice necessary for discharging a moral obligation.

To the current generation of students who seek western education, knowledge is power, because knowledge brings success in life. The object of education may be the production of a perfect or complete man ; but a perfect or complete manhood is almost synonymous with successful manhood. Thus success in life, often success in a vulgar sense, becomes the object of education. To most Indians, western education is valued because it brings wealth and influence and all that accompanies them. To the mediocre student, education has become necessary because it is the only means that can be relied upon for securing a decent living.

The education that is imparted in our *tols* cannot in its very nature be associated with worldly success and worldly gain; as a matter of fact, it is never a way to prosperity. The Pandit may be held in high veneration by the public for his learinng and attainments; he belongs necessarily to the highest rank in society in order of respectability, and has certain social privileges accorded him; but he can never aspire to be a rich man. A Pandit addicted to the luxuries of worldly life would be regarded as a monstrosity even at the present day.

(2) According to theory, education is the birth-right of every free man. A man must be educated in order to be admitted to full communal status, full rights and privileges. It follows of necessity that the door to knowledge must be open to all. Poverty should be no bar to acquisition of learning.

Times have changed and circumstances have altered. Pursuit of *Vidya* is no longer considered to be the duty of every man; literacy even is no longer a condition of admission to full social status. But the spirit still lives; the students that still seek admission to *tols* are mostly poor, their number is still considerable; the number will not compare unfavourably with the students attracted to the Universities; but instances are rare even under the present adverse circumstances of an eager and earnest student however poor, being unable to secure food and shelter under the hospitable roof of a Pandit of the old school.

"Western education under modern conditions, on the other hand, is costly; in most cases it is an expensive luxury which only the favoured few can afford. Good students may be helped with scholarships and stipends; charity may come to the assistance of the lucky few. But high University education

will remain barred to all but a miserable fraction of the population desirous of securing its benefits.

(3) Education being in theory compulsory for all, it has to be a free gift. In our *tols*, it is actually a free gift from the teacher to the taught. It is sin for a Pandit to accept any regular payment in silver from his pupil. He is permitted to receive personal services and even menial services from the pupil, but he cannot expect any pecuniary reward for his labours. On the contrary, he must be prepared to feed his pupils and find shelter for him under his own roof and must not expect any payment of fee for the same.

Under the system introduced under western influences pupils have to pay for the benefits that they receive. They have to pay for their tuition, for their lodging and boarding arrangements. This makes education expensive ane prohibitive to the major part of the population. Besides, it introduces new factors in the mutual relation between the teacher and the taught, that are quite foreign to native and genuine Indian instinct.

The University student knows that he pays for his education and that his education has a solid marketable value,—the learning he acquires is potential wealth and power. He knows further that his teacher works for him because he is paid for his work. Teaching has become a profession and often a paying profession too. Education has been reduced to a transaction subject to the economical laws of supply and demand. A new relation between the teacher and the taught has been introduced, which is entirely repugnant to Indian sentiment and Indian habits of thought.

(4) The bond tying a teacher to his pupil should, according to Indian notions, be a purely personal attachment,

a tie of sympathy and trust and co-operation. *Vidya* is a free and voluntary gift from the teacher, for which he cannot expect any remuneration in exchange. But the gift has to be received by the student with full faith in his teacher and in the spirit of the devotee. Both parties are free agents in the transaction. The teacher has the freedom to choose his pupils and the student is absolutely free in the choice of his teacher. There is nothing of the nature of a contract restricting the freedom of either party and regulating their mutual relation. There is the unwritten Law that serves the purpose in fixing the relation. The attachment, the devotion of an Indian student to his *Guru* in accordance with the traditional system, is proverbial.

It is a matter of regret that the relation has completely changed under modern conditions. The bond is no longer personal having its strength in moral obligations pure and simple: many other elements have entered into its composition. The teacher here is a paid employee working under a contract; the pupil demands from him assistance of a kind for which he has paid him. Very often the pupil is an unwilling agent who has been placed by his legal or natural guardian under a forced course of discipline with its rigorous restrictions and regulations under which he frets; and his inborn moral nature revolts at times against the system of restrictions imposed upon him against his choice. The relation between the teacher and the taught is apt to be bitter at times, and the bitterness leads occasionally to unfortunate and serious breaches of discipline. The consequences are very

often disagreeable. They are particularly regretable when the teacher happens to be a European. The Indian student is naturally touchy in his relation to his European teachers : the European teacher is apt to commit errors of judgment in his inability to enter into the feelings of his students. Revolt against the authority of a teacher is a thing inconceivable to old India ; it is quite unknown under the *tol* system. It is an importation under foreign influences and foreign ideals, and the artificial imposed from without.

(5) According to Indian theory, a man without education, a man who cannot produce a formal declaration from his teacher as having gone through the appointed course of discipline or *Brahmacharya* in pursuit of *Vidya*, is denied full participation in the duties pertaining to civic life : accordingly it becomes the duty of the community to provide and maintain an agency for the work of educating every member of it. In India the problem was solved by the institution of a permanent hereditary class of teachers, the much-maligned class of Brahmans. The Institution had its defects and demerits, as it had to grant special privileges to a hereditary caste, but it was the practical solution of the problem that India was required to solve under the circumstances conditioned by its special theory of education. While the duty of every member of the community was to learn, the duty of every man belonging to this class was to teach as well as to learn, to receive *Vidya* (*adhyayana*) as well as to give it

(*adhyapana*). He was the trusted custodian of traditional learning; and his duty consisted in keeping and preserving, as well as in advancing and transmitting the treasure of ancient lore that was trusted to his keeping. He had to impart it to his chosen pupils freely, and it was the duty of the community to provide him the means of decent living. Life of a teacher under such conditions cannot be a life of affluence or luxury; and ordinarily it had to be a life of long sacrifice. The teacher had to live a severely austere life, eschewing all luxuries. His wants were few and the community had to minister to these few wants. The motto of his life was to maintain a standard of plain living and high thinking; society found pleasure in granting him some special privileges. He belonged to the rank held highest in social estimation; he had not to bend his knees before the mightiest in the land; he had complete independence in the performance of the duties of his peaceful vocation. The State as a rule did not interfere with his work; he had full freedom of teaching and preaching; he had the support of the community behind him, and hardly needed any support from the State. Kings, princes and rich men might help and honour him with gifts and presents, with endowments in land or money, in accordance with their personal predilections. But the State as such did not concern itself much about meddling with his affairs. The class of teachers had some legal privileges and exemptions; and the State was the guardian of the

legal rights of them as of any other class of citizens under its protection.

"The whole system of western civilization with its Greco-Roman foundation hangs on the hinge connecting the citizen to the State. The whole trend of the system is to produce a good citizen, a citizen whose life will be subservient primarily to the needs of the State. Any degree of personal liberty that he may be permitted to enjoy, is allowed by sufferance ; the State keeps to itself the right to withdraw the liberty that is temporarily granted to a citizen, to a class of citizens, or to a corporation, the moment that the existence of the State is imperilled.

"In the west all self-governing institutions including the Universities which were of spontaneous origin and growth have had their liberties defined by charters granted by heads of the State and even these liberties have frequently been interfered with. Modern universities have their constitutions and powers strictly defined by statute that may any moment be repealed or modified at the bidding of the State. Modern Indian Universities are institutions of this class ; more-over as machineries they owe their driving and motive power to the State. The affairs of the State here are under the full control of a body of foreigners, who however well-intentioned and liberal-minded have to act in almost entire ignorance of the modes of life, the habits of thought of an alien people. They are out of touch, and out of sympathy, with the deepest springs of life,

the innate instincts and most cherished ideals of the people under their care and protection. The Universities and educational establishments here in modern India are all machines that require constant care and constant control of an ever-watchful Government, and are in constant need of mending and repairing. As a necessary consequence they cannot be allowed the freedom of spontaneous development along the lines most suited to the needs of the people, lines most in accordance with the needs of organic life. The life and the work of the teacher and the taught have to be fettered by mechanical regulations, by chains of restrictions forged at the official smithy. The restrictions are framed with an eye towards expediency and the efficiency of the State in the performance of its own work. The Universitydegree is primarily a test of fitness in the service of the State and the whole affair is made abservient to an efficient application of that test. The test applied is an endless chain of examinations conducted with the sole object of eliminating the unfit. We have a series of sifting operations for the selection of useful and competent servants for the State and desirable citizens for conducting public life along proper and decent channels. The University affords a field for competition for candidates in want of a recognised place in public life; and the main business of the University reduces to inventing the most effective method of eliminating as many of the unfit as is practicable under the circumstances. The end of University

education—the advancement of learning, which my own University has accepted for its motto,—has receded to distance and is half-forgotten in the striving for the maintenance of a suitable standard or test of fitness among the clamorous claimants for its degree.

"Any talk of freedom becomes idle and irrelevant and almost impertinent under such circumstances. The *tol* system, which is a relic, a decayed relic of the past, may still boast of freedom, of almost absolute freedom. It enjoyed absolute freedom from State interference till lately, till Government instituted title examinations for its students and forced its protection upon them. The teacher has the freedom still to select his pupils, and to select the courses of study. He has full freedom to interpret his texts; the student is free in the choice of his teachers and in the choice of his subject of study. His loyalty to his teacher is spontaneous and stands in need of no rules of discipline. No hard and fast rules for compelling and regulating attendance are needed for him. No fines, no penalties, need be imposed on him for misbehaviour; no black books need be kept for recording his conduct. No formal examination, preliminary, intermediate or final, conducted along mechanical lines, is necessary for testing his fitness for life. He is let off by his teacher after he has gone through his course, and the public is expected to be the final judge of his fitness. His education hardly makes him fit for struggle for life; the branches of learning, that form the subjects of his study are perhaps barren and fruitless

and narrow according to modern standards. But his course of training moulds his character; his learning gives him a position of honour and esteem in society. Above all, he represents an ideal—an ideal associated with a high standard of culture, a course of self-imposed discipline and a series of voluntary self-denial and sacrifice. Western education has given us much; we have been great gainers; but there has been a cost, a cost as regards culture, a cost as regards respect for self and reverence for others, a cost as regards the nobility and dignity of life.

(গ)

মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ফতেসিংহ পরগণায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের যে সকল নিদর্শন পাওয়া যায়, তদবলম্বনে রামেন্দ্রসুন্দর ইংরাজী ভাষায় একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধটি এতকাল অপ্রকাশিত ছিল। এই স্থলে তাহা প্রকাশিত হইল।

A Note on Traces of Buddhism found in Pergana Fatehsing of the District of Murshidabad.

Introductory.

Pergana Fatehsing forms an area within the Kandi Subdivision of the Murshidabad district, and with the river Bhagirathi forming its eastern boundary it forms a part, almost the north-eastern extremity, of the old Rarh division of the province. The village Rangamati lies at the north extremity of the Pergana and the identification of that village with the capital of the ancient Kingdom of Karna-Suvarna visited and described by Hieuan Thsiang in the Seventh Century may now be said to have been established on a sound basis.

In that case Buddhism must have been flourishing here a thousand years ago, and although the name of the Buddha or of Buddhism has been forgotten by the present population, it is impossible that traces of the

old creed should have completely disappeared from the social and religious practices of the people.

It is now almost accepted as sound history, that in the religious chaos that followed the decline of Buddhism in the province, rites from foreign and aboriginal sources repugnant alike to older Brahmanism and older Buddhism were freely incorporated into the body of the popular creed : that Buddhism modified by speculative mysticism and popularised by introduction of animistic rites constituted Tantricism : and that with the growing unpopularity of Buddhistic association Tantricism merged into *Sakti-worship* of modern Hinduism. There was a change of names : but there was perfect continuity in the successive stages of transition in the body of doctrines and rites and forms. There are strong reasons to suspect, that shrines now sacred in connection with *Sakti-worship* were at one time devoted to Buddhistic worship.

It is a curious fact that such shrines are very thickly distributed over the Rarh districts of Bengal. Of the fifty one *Mahà-pithas*, enumerated in *Tantra-chudamani* believed to contain relics of the *devi* and distributed over the Indian continent, a disproportionately large number are found to be grouped within a small area of Rarh. In the Gupta Press Almanac for the current year I find the following identifications.

1. *Attahása or Phullara*—identified with village Labhpur near Ahmadpur (on the Loop Line E. I. Ry.), Birbhum.

2. *Kirita*—identified with Baranagar near Berhampur, Murshidabad.
3. Nalahati—on the Loop Line, E. I. Ry, Birbhum.
4. Nandipur—identified with Sainthia (Loop Line, E. I. Ry.), Birbhum.
5. Bakreswar—near Suri, Birbhum.
6. Kshirgram—near Katwa, Burdwan.
7. *Bahula*—Ketugram near Katwa, Burdwan.
8. Ujjayini—Kagram near Guskara (E. I. Ry.), Burdwan.

Some of the identifications may be doubtful, but still the existence of so many *Mahapithas* within so small an area has its significance.

Besides these, places of minor importance but still of considerable sanctity are numerous in this district. Near Rampurhat lies the village Tarapur, sanctified by the presence of *Tárá Devi,* where the sage *Vasistha* is said to have obtained *Siddhi* by his Tantric austerities. This *Tárá* is obviously a Buddhist goddess closely connected with the cult of *Avalokiteswara* and the names of both the Buddha & Vasistha are mentioned in connection with her worship in treatises devoted to her. It would be interesting to have the image of the idol at Tarapur examined. It is said, that the image is a female form with a child in her arms.

The temples of *Rudra Deva* and *Dakshina Kalika* lie within the Municipal limits of Kandi and in the present paper a detailed account will be given of their mode of worship. It is said, that large number of stone images lie scattered about in the Mahomedan village of Salar, and a few years ago a cart-load of these was brought for sale to Kandi by a villager.

Collection of these images may be found worth the trouble,

and the subdivisional officer of Kandi may well be requested to undertake the work.

I may refer here to the practice of tree-worship; which is very general in this part of the district. Temples of *Siva*, *Sakti*, and *Dharma* usually stand under some sacred tree; whereas trees in isolated position are associated commonly with goddess like *Shasthi*, *Sitala*, &c.

I may also refer to the common practice of painting parts of walls about doorways and entrances in brick & mud dwellings with the figures of the lotus and the *makara* which are well-known symbols connected with Buddhist art.

Dharmaraja

In a certain sense this deity is the most popular among all the gods that receive public worship in this part of the district. He is the god of the village community and his daily worship and annual festival are conducted at public expense. In many cases *chakran* lands are assigned for defraying the cost of worship. There is scarcely an important village that has not its own *Dharmaraja*; and his temple and its precincts mark the spot where all businesses, in which the village community is interested, are usually transacted. Very often it serves as the zemindars cutchary. It is invariably the meeting place of the village elders.

It is however the low caste people such as Goalas, Teors, Bowris, Bagdis and Domes, that actively participate in the ceremonies connected with the worship. The priest is usually a low caste man. *Dharmaraja* has all the appearance of being the god of the Semi-Hinduised tribes. Being the most important of the village gods the agricultural and artisan classes are bound to be intersted in his worship. The attitude

of the highest castes towards the god is rather patronising than reverential. But all men—high or low are bound to make contribution to the fund raised for his worship, and the writer of the note has to contribute about three rupees annually to the fund for the *Dharmaraja* of his village Nilkantapur. I will choose this particular god as a typical example in my account of the worship.

Being under the patronage of the local Brahmin zemindars, the god of Nilkantapur has a Brahmin priest to serve him. Two days before the *Vaishakhi Purnima* of each year he is brought to his temple, which is a mud hut, * from the house of his priest at a neighbouring village. For the rest of the year the temple is occupied by *Baneswar or Ban Gosain* who is a log of wood shaped into a rude human form. In a few villages the annual festival takes place in the *Purnima* of the following month of *Jyaistha*, but in most cases it is held in *Vaishakhi Purnima*. The previous day is that of J*agaran*. The *Jagaran* night is given up to mirth and revelry. On arrival of the god from his distant home *Ban Gosain*, who is a sort of agent or representative of *Dharma* has to come out of the temple and is carried from door to door. He *has to beg alms from every householder*. The ceremony may be a survival of the old practice of Buddhist Bhikshus.

Seven pieces of stones thickly coated with vermilion form

---

* At the time when this note was written the temple had been a mud hut with a southern aspect. But afterwards in 1322 B. S. it was demolished and a brick-built temple facing the west has been erected on the stead under the care of Babu Nilkamal Trivedi the youngest brother of the writer of this note.

collectively the *Dharmaraja* of Nilkantapur. Each piece however has its individual name, Chand Ray, Phatik Ray, &c.

These groups of ceremonies are observed on the day of the festival at fixed hours. In the morning before the day dawns, there are the ceremonies of masque-play (মুখোস খেলা) and playing with corpses (মরা খেলা). In connection with the first, a man puts on a hideous masque and then dances frantically before the deity. The second, which is the most important ceremony of the festival, is of a revolting character. It is a veritable Devil's dance. A number of men dress themselves as Gobbas male and female, come to the temple with a load of human skulls and human corpses, and sing and dance before the god to the accompaniment of the noise of big drums. The corpses at times are in the advanced stage of putrefaction. They shout and yell and make frantic gestures as they dance. The following may serve as samples of the songs or incantations sung on the occasion.

1. ওরে সাজ্‌লে,
ধূল ধূল ধূল সাজ্‌লে, ধূল ধূল ধূল।
পড়েছে মায়ের পাতা উদোম্ ক'রে চুল॥
[উদোম্=dishevelled]

2. ওরে সাজ্‌লে,
শ্মশানে গিয়েছিলাম, মশানে গিয়েছিলাম ;
সঙ্গে গিয়েছিল কে ?
কার্ত্তিক গণেশ দুটি ভাই সেজেছে॥

3. ওরে সাজ্‌লে,

কাল বাছা খেয়েছিলে টুকুই ভরা মুড়ি।
আজ তোমার মুণ্ড যায় ধূলোয় গড়াগড়ি॥

4. ওরে সাজ্‌লে,

সোণার আঁচির, সোণার পাঁচির, সোণার সিংহাসন।
তার উপর বসে আছেন ধর্ম্ম নিরঞ্জন॥

5. ওরে সাজ্‌লে,

কার গাছেতে কেটেছিলেম খণ্ড কলার বা'ল।
আজ পুত্রশোকে আকুল হলেম কেবা দিলে গা'ল॥

6. ওরে সাজ্‌লে,

জল শুদ্ধ, স্থল শুদ্ধ, শুদ্ধ তামার বাটী।
আড়াই হাত মৃত্তিকা শুদ্ধ, শুদ্ধ ঢাকের কাঠি॥

7. ওরে সাজ্‌লে,

তুইত মেরা ভাই সাজ্‌লে, তুইত মেরা ভাই।
তোর সঙ্গে গেলে পরে শিব দরশন পাই॥

8. ভাল বাজালি ঢেকো ভাই তোর মা আমার মাসী।
এনোদ ক'রে বাজা সাজ্‌লে বিনোদ করে নাচি॥

The word সাজ্‌লে which is always in the vocative case probably stands for the name of some goblin or goblin worshipper.

These ceremonies of dancing with masques and with corpses are common to the worship of *Dharmaraja* and *Rudra Deva.* In the year 1882 the gruesome practice of bringing

dead bodies of human beings was suppressed on sanitary grounds by an order of the District Magistrate of Murshidabad. Since then the practice has been discontinued within the Municipal limits of Kandi but it survives in remote villages.

About midday the ceremonies of ভাঁড়ার আনা and পূজা and হোম are held. The first ceremony consists in a number of men carrying on their heads earthen pots or *kalsi* filled with water (কাঁচা ভাঁড়ার) from a distant tank to the temple and dancing along the whole distance to the beat of drums.

At times a পাকা ভাঁড়ার or a *kalsi* filled with country liquors may be added to the ordinary *Kancha Bhandar*. Exhausted by their dances under the hot midday sun they fall down in actual or feigned fainting fits and in their unconscious state give utterance to oracular sayings under inspiration of the god. This ceremony is followed by regular *puja* with offerings of flowers, uncooked rice, sweetmeat and *homa* or sacrifice through fire and the sacrifice of a goat. The *mantra* for *dhyan* used by the priest of the Nilkantapur *Dharma* seems to be only a fragment.

"নিরঞ্জন নিরাকার দিব্যরূপং পরমেশ্বরীং"

এবং ধ্যাত্যা "বং ধর্ম্মরাজায় নমঃ"।

In the evening the god is carried to a large tank where he is bathed in water and after sunset is brought back to his temple at the head of a procession. The whole village accompanies the god. The special ceremony observed on the occasion is বাণফোড়া or piercing the skin with barbed arrows or hooks This practice being disallowed, now groups of men form dancing parties, carrying lighted torches in their hands. The flame is fed from time to time by the

upward throw of a preparation consisting of a mixture of powdered incense (resin) and barley flour and oil.

The festival ends when the procession reaches the temple. Next morning the priest goes away with the god under his charge to his own village.

The foregoing account leaves no doubt whatever as to the close connection of *Dharma worship* with the animistic demon worship of the aboriginal races appropriated by later Buddhism. I believe however, that Thibetan influence can be distinctly traced in some of the ceremonies. When reading Dr. Waddel's account of Lamacism as given in his work of Buddhism in Thibet, and also in the Gazetteer of Sikim, I was greatly struck by the close parallelism which runs between the ceremonies of Lamacism and those observed in this part of Rarh in connection with *Dharma worship*. For instance Dr. Waddel describes in great detail the ceremonies of masque festival, Devil's Dance, Water Festival and Torch light Festival as observed by Thibetan Buddhists. These ceremonies are also observed in Rarh ; the parallelism is close, and the relation can hardly be accidental. The Thibetan ceremonies appear to be magnified imitations of the Rarh ceremonies. They are held in Thibet with great pomp at different seasons of the year : in this part of Bengal they have apparently been compressed into the short space of twenty four hours.

Dharmaraja here is popularly identified with *Yama* the god of death ; and *Yama* himself in his character of *Dharmaraja* has a recognised place in the pantheon of Thibetan Buddhists.

Rudra Deva

A short account of *Rudra Deva* of Fatehsing appeared in The Journal of the Asiatic Society of Bengal (Pt. III, No I, 1898) in an article headed "On a Rain Ceremony from the district of Murshidabad" by Babu Sarat Chandra Mitra, M. A, B. L. The present note will supply a most detailed account of the worship besides correcting a few errors of detail in that paper.

HISTORY—Kam Deva Brahmachari a Tantric Sannyasi on his way to Jagannath from Kamrup, settled at Kandi which was then an unimportant place. It is reported that he had made an aerial voyage through the whole distance, his vehicle having been a tree. He had two stone images with him, now identified with *Kalagni Rudra*, one of the terrible figures of *Mahadeva*. He had two desciples, Adi Gosain and Rudra kanta Sinha. To the latter the dying Sannyasi bequeathed the charge of the two gods he had served during life, with the injunction, that once at least in a year, the images should be seated on the spot marking his place of burial and there worshipped. This injunction has loyally been obeyed up to the present day. From Rudrakanta or some descendant of his, the gods were forcibly taken away by the Brahmin zeminder of Fatehsing and since then *Rudra Deva* has been reckoned among the family gods of the Fatehsing zemindars.

Now the date of *Rudra Deva* can be approximately settled. Kandi is the central *samaj* of the Uttar Rarhiya Kayasthas of Bengal, and from Anadibar Sinha an ancestor of Rudrakanta have descended all Uttar Rarhiya Kayasthas in Bengal who bear the title of Sinha. Rudrakanta himself was ancestor of the Paikpara Rajas, and Kumar Sarat Chandra

Sinha of Paikpara stands sixteenth in descent from Rudra kanta. The present Brahmin zemindar of Pergana Fatehsing stands fourteenth in descent from Savita Ray, the founder of the family who obtained the zemindari of Fatehsing as a reward for military services to Raja Mansing towards the close of the Sixteenth Century. So Rudrakanta was almost comtemporary of Savita Ray of Fatehsing and lived in the Sixteenth Century.

On a subsequent occasion one of the two images mysteriously disappeared in the waters of the Bhagirathi to reappear at the village Uddhanpur near Katwa, where the god still resides as the chief local deity.

ANNUAL FESTIVAL :—The last twelve days of each year are devoted to the annual festival in honour of *Rudra Deva.* From the 19th of *Chaitra* every evening at about 9. P. M. The god sits in solemn bar or war bar surrounded by his officers, attendants and servants. Of these there are several groups or classes, each having its own duties and functions. The following may be mentioned.

1. Priests.
2. *Deyasin*, *Bishaya*, *Maharana*, *Malamati*, *Swarnamati*—who have to prepare various offices connected with worship, or have custody of ornaments beddings and other belongings of the deity. .
3. *Durwans*, *kotwals*, *thanadar*, *chaukidars*, *nakibdars*—who have the charge of order and descipline or have to do police duties.
4. *Chharidar*, *Ashaburdar*, *Sotaburdar*, *Araniburdar*, *Nisandar*, *Chamarburdar*, &c.—the bearers of maces, rods, flags, fans, chamars, &c.
5. *Merdhas* or headmen representing 40 villages.

There are special ceremonies observed during the *Durbar*. On the first night is held the ceremony of *Kanta bhanga*, when devotees practise self immolation by lying on thorny beds made up of thorny branches and twigs of trees. It is repeated in the third night. On the sixth night is সিদ্ধিভাঙ্গা when *bhang* is distributed among those present On the ninth is *Chorajagaran*, when certain classes of Sannyasis appear to pay respects to the god. The tenth night is that of *Jagaran*. The night is wholly given up to festivities. The temple is crowded by servants, attendants and Sannyasis. All these men, whatever their caste, have to observe the rules of *Brahmacharya*, to fast during day time, and to take light meal after sunset. The vow is taken after an ablution, and extends to three days in the case of ordinary sannyasis who may number a few thousands. With sannyasis and attendants of special ranks, the vow may extend up to fifteen days. The equipment of one who has taken the vow consists of a rotten cane held in the hand and *uttariya* or a piece of silk or cotton riband worn round the neck. Ordinary *sannyasis* are recruited from all castes and classes and from many villages. Among special *sannyasis* who have special duties assigned to them, and are low caste people, the following may be mentioned.

(1) *Kalikar pata*—who have to perform the gruesome ceremony of dancing with skulls and corpses.

(2) *Mayer pata*—female gobblins who dance without skulls or corpses.

(3) *Chamundar pata*—who dance with hideous masques on faces.

(4) *Lausener pata*—who dance with gourds, cucumbers, pumpkins, etc.

(5) *Dhulsener pata*—who scattered dust over the heads of the crowd.

(6) *Brahmar pata*—who has to carry sacrificial fire.

(7) *Jalkumarir pata*—who has to consign *khichuri bhog* to water.

By midnight every inch of ground about the temple is occupied by these sannyasis and by spectators, and the air is full of noise. Then the *Kalikar patas* or devil dancers make their appearance, dressed as so many demons, go through a prescribed course of practices and then leave the temple to return before sunrise with the corpses or skulls they have collected. Meanwhile the other classes of sannyasis appear in turn before the god and perform the ceremonies assigned to them. One curious ceremony may perhaps deserves notice. A piece of *shankha* or conch shell is found to be missing from the presence of the god. Some man in the crowd has stolen it. This act of sacrilege creates profound consternation among the crowd, and the whole police force in the service of the god is set in motion for catching the thief. The thief is at last found with the stolen *shankha* in his possession. He is brougt before the god, undergoes humiliation and appeases the wrath of the offended deity by payment of fine of a rupee. Now Mahamohopadhyaya Haraprasad Sastri in one of his pamphlets related to *Dharma worship* records the tradition of a piece of *shankha* having been recovered from a tank in a certain village along with the stone image of *Dharma* ; and he offers the suggestion that, *shankha* may be only a mis-spelt or mis-pronounced form of the word *Shangha.* The curious and apparently meaningless ceremony of *shankha-churi* in connection with the *Rudra Deva worship* may have a similar origin. Perhaps it commemorates the dis-appearance on

some past occasion of the image of *Sangha*, the third person of the Buddhist Trinity, which existed along with the image of the Buddha now identified with Rudra Deva of Fatehsing, and the image of *Dharma* now at Uddhanpur. The night of *Jagaran* ends with the ceremony of *Marakhela* which is performed by *Kalikar patas*, and which is essentially the same ceremony as is observed in connection with *Dharmapuja*. After daybreak the god walks out from his temple and is carried in solemn procession followed by the crowd to the spot on the bank of the river *Maurakshi* or *More* which marks the burial ground of Kama Deva Brahmachari. His palanquin is borne on the shoulders of the resident of the houses lying on both sides of his route. On arrival there the following ceremonies are observed—

(1) *Obhisek*—or purificatory ablution.

(2) *Puja, Hom, Balidan*—regular worship with sacrifice through fire and sacrifice of a goat. It concludes with offering of *payasanna* or rice cooked with milk and sugar.

(3) *Dadurghata*—the god is anointed with oil offered by some living descendant of Rudrakanta, and is then bathed in the river-water.

(4) Offerings of uncooked rice, sweetmeat and silver and copper pieces by the assembled crowd. The night is spent on the same site, and it is supposed that, the brother god at Uddhanpur pays in an invisible form, his annual visit to receive joint worship at the shrine sacred to the memory of the Brahmachari. The temple at Uddhanpur remains closed during the night. Joint worship is offered to the two gods accordingly by the priests about midnight. The worship is according to Tantric rules, and is followed by the offering of *Khichuri* (a preparation of rice and pulses)

and fish. The materials for the food to be offered are obtained by the priests by actual begging from people representing the Fatehsing zemindars. Then comes the ceremony of consigning the food, that has been duly offered, to the river-water. The *Jalkumarir pata* a low caste man collects the food offering in an earthen pot, dives into the water of the river leaving the pot with contents in the water. Immediately he falls in a fainting fit and is dragged on to the banks by his comrades by means of a rope tied round his waist. Thus ends the ceremony. The god remains there for the night, and next morning he comes back to his temple at the head of a procession.

(ঘ)

রামেন্দ্রসুন্দরের জন্মপত্রিকা

জাতাহ ৭।২৬।৮ ১৮।৪০।২৮ ১৭।৩১।২৬।৩৪।০।৫

জন্ম—১৭৮৬ শকাব্দা—৫ই ভাদ্র শনিবার—কৃষ্ণ পক্ষ চতুর্থী—কর্কট লগ্ন—রেবতী নক্ষত্রাশ্রিত মীন রাশি—রাত্রি ২১ দণ্ড ৩৭ পল।

ফলিত জ্যোতিষে দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলেও রামেন্দ্রসুন্দর কৌতূহল বশতঃ কটক কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়কে একবার তাঁহার কোষ্ঠী বিচার করিতে দেন। যোগেশ বাবু কোষ্ঠী বিচার করিয়া তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

কটক,
২ আশ্বিন ১৩২১।

নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

আজি রেজেষ্টারি ডাকে কোষ্ঠীখানি আপনার ঠিকানায় ফেরৎ পাঠাইলাম। কোষ্ঠী ঠিক কিনা কে জানে। ঠিক হইলেও সব ফল মেলে না। যাহা হউক কোষ্ঠীতে দেখা যাইতেছে, চারি বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৪৬ বৎসর ২ মাস বয়সের পর অজীর্ণ-মূলক রোগ জন্মিয়াছে। অদ্যাপি এই রোগে কষ্ট পাইতেছেন। বিদ্যা, ধন, শৌর্য্য, বীর্য্য, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, অধিকার—সব থাকিতেও নাই। স্বোপার্জ্জিত ধন ব্যতীত পৈতৃক ধনেরও কিছু ক্ষয় পাইয়াছে। যাহা হউক ধনে মানে কি করিতে পারে, স্বাস্থ্যধনই প্রধান ধন। শান্তি ও ধর্ম্মশাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিলে আর কিছু না হউক মনে শান্তি আসে। দেশের লোক মঙ্গলকামনা করিতেছে। আশা করি মঙ্গল হইবে। ইতি—

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

কটক,
১৩২১।৭ আশ্বিন।

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনার কৌতূহল হইয়াছে শুনিয়া একটু আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি। দুই ঘটনায় আপনার কোষ্ঠী দেখিতে আমার কৌতূহল জন্মিয়াছিল, সেবার যখন আপনাকে ডাক্তার কবিরাজ ছাড়িয়া দিয়াছিল, হোমিওপেথী অল্প ঔষধে আপনার উদরমধ্যস্থ স্ফোটক অদৃশ্য হয়, যেন কে আসিয়া আপনাকে যমদ্বার হইতে ফিরাইয়া আনে। সে দিন নৌকা পুড়িল ডুবিল, আপনি দুর্ব্বল স্থূলদেহ। গঙ্গা-গর্ভ হইতে রক্ষা পাইলেন, যেন কে রক্ষা করিল। আপনার পত্র পড়িয়া আমার বড় আশ্চর্য ঠেকিয়াছিল। কে রক্ষা করিতেছে, অর্থাৎ কোষ্ঠীতে এমন কি যোগ আছে, যাহাতে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।* এরূপ ঘটনা সর্ব্বদা ঘটে না। কিন্তু কোষ্ঠীতে এমন কিছু ধরিবার ছুঁইবার পাওয়া গেল না। অবশ্য রিষ্ট ছিল, কিন্তু কি যোগে রিষ্টভঙ্গ তাহা জানিতে পারা গেল না। তবে এখন ফল জানিয়া কারণ খুঁজিতে বসিলে একটা পাওয়া যায়। কোষ্ঠীর অনেক গণনা প্রায় এইরূপ। Wise after the event অনেক। যখন এইরূপ, তখন ভবিষ্যতে কি আছে কি না আছে, তাহা কে বলিতে পারে? এই কারণে ভবিষ্যতের কথা লিখি নাই।

---

* রামেন্দ্রসুন্দর নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিবার মানসে জীবনের শেষ কয়েক বৎসর শীতকালে জলপথে ভ্রমণ করিতেন। ঐ সময়ে একবার দৈবযোগে নৌকায় আগুন লাগিয়া একখানি নৌকা ভস্মীভূত হইয়াছিল। সুখের বিষয় তাহাতে কাহারও জীবন-হানি ঘটে নাই।

আমি আবার গণাইলাম। যদি কোষ্ঠীর ফল ধরিতে হয়, তাহা হইলে আরও আট মাস দেহকষ্ট চলিবে। তার পর শুভাশুভ, অর্থাৎ কখন ভাল কখন মন্দ স্বাস্থ্য লইয়া দেহ চলিবে। কোষ্ঠীতে মৃত্যুআশঙ্কা নাই। মৃত্যু অনেক বৎসর পরে শঙ্কা করা যাইতে পারে। আমি দুই মতে (অষ্টোত্তরী আর বিংশোত্তরী) গণাইয়াছি। অনেক বৎসর পর্য্যন্ত মারক গ্রহ উপস্থিত হইবে না। কষ্টের সময় কেহ রক্ষা করিবে।

বোধ হয় আমরা অকালমরণকে ভয় করি, কালমরণকে করি না। এমন কি কালমরণ ইচ্ছা করি। বয়স হইলে আর বাঁচিয়া দুঃখদুর্দশা দেখিতে পারা যায় না। এইরূপ ঘটে বলিয়া কালমৃত্যু স্বাভাবিক। গ্রাম্য উপমায় যেন পাকা ফল খসিয়া পড়ে। আরও চমৎকার কথা, পাকা ফল খসিবার সময় মৃত্যুযন্ত্রণা থাকে না। থাকিলে স্বাভাবিক হইত না।

আপনার কোষ্ঠীর সহিত আমার কোষ্ঠীর কিয়দংশে ঐক্য আছে। তিন বৎসর পূর্ব্বে আমিও মরণাপন্ন হইয়াছিলাম, কোন ক্রমে টিকিয়াছি। আশ্চর্য এই জ্যোতিষ গণনায় পুরুষকার অস্বীকৃত হয় নাই। তবে সেটা পুরুষকার কি গ্রহগুণ তাহা বলা কঠিন। আমি অজীর্ণ রোগে পড়িয়াছি, কিন্তু নিজের চিকিৎসা অবশ্য কিছু পড়া শোনা করিয়া, নিজে করিয়া রোগটাকে দমিত রাখিয়াছি। আমার মনে হয় আপনিও চেষ্টা করিলে আপনার দেহ ঠিক চালাইতে পারিবেন। আমি আপনার পত্রের উত্তর ১২ নং পার্শী বাগানে পাঠাইয়াছি। বোধ হয় সে পত্র পান নাই। তাহাতে নিজের চিকিৎসা নিজে করিতে অনুরোধ করিয়াছি। নিতান্ত অবহেলা না করিলে অজীর্ণ রোগে ভয় নাই। বরং এক এক অজীর্ণরোগী দীর্ঘজীবী হয়। কারণ মিতাহারী ও সকল বিষয়ে এই রোগী সাবধান হয়। ঔষধে এই রোগ সারে না, বরং অনেক স্থলে বাড়ে।

আপনার কোষ্ঠীর সাধারণ ফল দিতেছি। মিলাইয়া দেখিবেন। সুন্দর প্রিয়ম্বদ ধর্মব্রত স্থূলদেহ কফ্ ধাতু। পৈতৃক ধনে ধনবান্। কিন্তু কিছু ক্ষয় পাইয়াছে। নিজেও ধন উপার্জ্জন করিবেন। বিদ্বান্, শৌর্য্য-বীর্য্য-খ্যাতিমান্। পুত্র কন্যা অল্প, তিন পর্য্যন্ত। পত্নী সুস্থা নহেন। ১৪ বর্ষ বয়সের মধ্যে পিতৃ-বিয়োগ। পিতৃমাতৃসৌখ্য অল্প ঘটিয়াছিল। ভ্রাতৃভগিনী অল্প, তিন চারি। ইনিই জ্যেষ্ঠ ইত্যাদি।

আর পাণ্ডিত্য প্রকাশের ফল নাই। কলিকাতার অলিগলি জ্যোতিষাচার্য্য দোকান খুলিয়া বসিয়াছে। আমি এবার কোথাও নড়িব না। এইখানেই কয়টা দিন কাটাইব। আশা করি, বিশ্রামে ও স্থান পরিবর্ত্তনে আপনার দেহের উপকার হইবে। ইতি—

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

(ঙ)

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সুধীগণ বিভিন্ন সময়ে বিবিধ বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দরকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কতকগুলি এই স্থানে প্রকাশিত হইল। কোন্ সময়ে এবং কোন্ উপলক্ষে পত্রগুলি লিখিত হয়, তাহা পাঠকগণ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

শান্তি-নিকেতন,
বোলপুর।

সবিনয় নমস্কার নিবেদন,

* * * * আমাদের দেশে নেশন্ ছিল না এবং নাই, সে কথা সত্য। তাহার পরিবর্ত্তে কি আছে বা ছিল সেইটেই বিচার্য্য। কারণ ধরিয়া রাখিবার মত কিছু একটা না থাকিলে ভারতবর্ষে আজ পর্য্যন্ত যাহা আছে, তাহা কি আশ্রয় করিয়া থাকিত? আপনার এই জিজ্ঞাস্য বিষয়টি একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে খোলসা করিয়া যদি জিজ্ঞাসা করেন, তবেই কতকটা সন্তোষজনক উত্তর আশা করিতে পারিবেন। * * * *
১৪ বৈশাখ ১৩১২।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ওঁ

শিলাইদহ।

* * * লালগোলার রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের বদান্যতায় আমাদের বিদ্যালয় রক্ষা পাইয়াছে। তাঁহার একখানি ছবি সংগ্রহ করিয়া আমাদের বিদ্যালয়ে যদি পাঠাইয়া দেন তবে বড় উপকৃত হইব। এ সম্বন্ধে কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারি নাই। ঈশ্বর আপনাকে নিরাময় করুন। ইতি ২৬ বৈশাখ ১৩১৬।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ওঁ

শান্তি-নিকেতন,

২১ মার্চ্চ ১৯১৭।

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন,

দেশে ফিরিয়া আসিয়াই আপনার প্রীতিসুধাপূর্ণ পত্রখানি আমার কাছে মরুভূমির উৎসধারার মত লাগিল। আপনাদের মত সুহৃজ্জনের কাছ হইতে চিরদিন যে সমাদর পাইয়া আসিয়াছি নানা দুর্য্যোগের মধ্যেও আজও তাহার কোন ক্ষতি হয় নাই ইহা যে আমার পক্ষে কি গভীর সান্ত্বনা তাহা অন্তর্যামীই জানেন। বিদেশে আপনার কথা বার বার স্মরণ করিয়াছি। কলিকাতায় দিন দুয়েক থাকিবার অবকাশ পাইলেই নিশ্চয়ই আপনার দরবারে গিয়া হাজির হইতাম। * * * অনেক গল্প করিবার বিষয় জমিয়াছে, সেগুলো হাতে হাতে খোলসা করিতে পারিলে ভাল হয়, নইলে কালক্রমে লোকসান্ হইতে পারে।

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ওঁ

শান্তি-নিকেতন।

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন,

* * * নানা কারণবশতঃ আমি হঠাৎ দূর দূরান্তরের লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছি, তাই ক্ষণে ক্ষণে অদৃশ্য হইবার আয়োজন করিতেছি। চিঠিতে কাহাকেও সাড়া দেওয়া এক প্রকার বন্ধ করিয়াছি, কিন্তু আপনার ডাকে চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত কঠিন বলিয়াই মৌনব্রত ভঙ্গ করিলাম। * * * আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে বলিলে কম বলা হয়, আপনার প্রতি আমার প্রীতি গভীর। আমার মতে আচারে বিচারে যদি আপনাকে বেদনা দিয়া থাকি ক্ষমা করিবেন। বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে মিল না হইলেও চলে, এমন কি না হইলে হয়ত মঙ্গলই হয়, কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে মিলের ত বাধা নাই। * * * ১২ পৌষ ১৩২১।

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ওঁ

কুষ্টিয়া।

সবিনয় নমস্কার নিবেদন,

* * * আপনারা কি এই কথাটাই জানিয়ে দিতে চান যে সত্যি সত্যি না মরলে উপায় নেই? এ রকম আভাষ ইঙ্গিত প্রয়োগ করা কি বন্ধুর কাজ? * * * আপনাদের অনুরোধ বরাবর সাধ্যমত পালন করা আমার অভ্যস্ত হয়ে গেছে, সেই জন্যে এখনো আপনাদের আহ্বান এড়ানো আমার পক্ষে সহজ নয়, সেই কারণেই আপনাদের দিক থেকেই দয়া হওয়া উচিত। * * * আপনাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সহানু-

ভূতি আছে, রজনী সেন মহাশয় যে দুঃখকষ্টের মধ্যে জীবন অবসান করেছেন আমি তার পরিচয়ও পেয়েছি এবং তাঁর আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা দেখে মুগ্ধও হয়েছি, এই জন্য আপনাদের চেষ্টায় তাঁর দুর্দ্দশাগ্রস্ত পরিবারের ভার লাঘব হয় এ আমার একান্ত মনের ইচ্ছা, কিন্তু আমি যে ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে চলে এসেছি সেখানে আমাকে আর আহ্বান করবেন না। এক পা বাড়ালেই দ্বিতীয় পা বাড়াতে হয়, কেউ কোন মতেই দোহাই মানে না, নজির দেখায়। আপনি যদি পীড়াপীড়ি করেন তবে অবশ্যই আমাকে রাজি হতে হবে। * * * তারিখ ঠিক জানা নেই—

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—•—

ওঁ

প্রিয় ত্রিবেদী মহাশয়,

Goldsmith লিখেছে, "England with all thy faults I love thee still," আমি তেমনি বলতে পারি যে, "Trivedi with all thy doubtings and floutings I love thee still"। তার সঙ্গে একটি কথা আমি বল্‌তে চাই এই যে—doubt-গুলো উপ্‌ড়ে ফেলে cultivate faith & hope—আমাদের পুরাণ শাস্ত্রকথা will help you to do this with greatest facility। তোমার সঙ্গে যদি ভাগ্যক্রমে কখনো দেখা হয় তবে আমার মনের কথা বলে সুখী হব। আজ আমি তাড়াতাড়ি এইটুকু লিখেই থাম্‌লুম তোমার সম্যক্ কুশল হো'ক এই আমার আন্তরিক কামনা।

তোমার গুণানুরক্ত
শ্রী দ্বি, না, ঠাকুর।

ওঁ

প্রিয় ত্রিবেদী মহাশয়,

গরম দেখা দিয়াছে, ভারতবর্ষের যে স্থানে তুমি অধিকার স্থাপন করিয়াছ—মনো-motor car-এ ভ্রমণ করিয়া বেশ আমোদ পাইলাম। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎকার ব্যতীত পত্রে কথাবার্ত্তা চালানো আমার পক্ষে সুকর নহে। একটি কথা আমার মনে উদয় হইতেছে যদিচ তাহার কোন গুরুত্ব নাই—"গালিলিওর সময়ে average man পৃথিবীকে সৌর জগতের কেন্দ্র বলিত। সুতরাং average manএর জোয়ালে ঘাড় পাতিয়া দিলে বিজ্ঞানের উত্থানদ্বারে কপাট পড়িয়া যাইত। Average manএ আমার শ্রদ্ধাও তেমন নাই—আর তাহার উপরে আশা ভরসাও স্থাপন করিতে পারি না।

তোমার গুণানুরক্ত
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—•—

Old Ballygunge.
10. 3. 18.

মান্যবরেষু :—

অদ্য আপনার note-টি ভাল করিয়া পড়িলাম। আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক কথা। * * আপনি teacher & student সম্বন্ধে কি হওয়া উচিত যাহা বলিয়াছেন আমিও তাহাই বলিয়াছি। আমি note-টি পড়িয়া উপকৃত হইয়াছি মনে করি ও পাঠাইয়া দিয়াছেন বলিয়া আন্তরিক ধন্যবাদ দিই। Note-টি ফিরিয়া পাঠাইলাম copy একখানি যদি সময়ে দেন বিশেষ বাধিত হইব। ইতি

একান্ত বশম্বদ
শ্রীআশুতোষ চৌধুরী।

২৫, রামমোহন সাহার লেন,
ডাফ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১১ আশ্বিন ১৩২০।

* * * * অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বঙ্গানুবাদ পাঠাইয়াছেন তাহা আমি সাদর ও সাগ্রহে পাঠ করিব। এই গ্রন্থ ও কর্ম্মকথা উপহারের জন্য আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম। আপনার প্রত্যেক গ্রন্থই আমাদের সাহিত্যে রত্নস্বরূপ। প্রভূত গবেষণা ও গভীর চিন্তার ফল।

ভবদীয়—
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

---

২৭ জুন ১৯১৭।

শ্রীচরণেষু :—

আমি দার্জ্জিলিং হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি এবং এখন একটু সুস্থ আছি। গত কল্য আপনার প্রেরিত proof পৌছিয়াছে। এবার ত আপনি বেশী কিছু করেন নাই। তাই আমি নিজে প্রুফ দেখিয়া অর্ডার দিতে সাহসী হইতেছি। * * * * যদি এক আধটা ভুলই থাকে তাহা প্রবন্ধের গৌরবেই ঢাকিয়া যাইবে।

আষাঢ়ের প্রবন্ধের সম্বন্ধে কে কি মত প্রকাশ করেছেন জানিতে চান। বাঙ্গালা দেশে যাহাদিগকে আমরা শ্রদ্ধা করি তাঁহাদের কয়েক জনের সঙ্গে দার্জ্জিলিংএ এবং এখানে দেখা হইয়াছে,—তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে বলিয়াছেন বহুকাল এপ্রকার প্রবন্ধ তাঁহারা পড়েন নাই। আষাঢ়ের ঐ প্রবন্ধটি বিগত কয়েক বৎসরের সাময়িক সাহিত্যের সর্ব্ব

প্রধান প্রবন্ধ, আষাঢ়ের সম্বন্ধেই যদি লোকে এই কথা বলেন, তবে শ্রাবণের প্রবন্ধ পড়িয়া যে তাঁহারা কি বলিবেন তাহাত আমি ভাবিয়াই পাই না। আমার মনে হইতেছে শ্রাবণের প্রবন্ধ আষাঢ়কেও ছাড়াইয়া গিয়াছে, তাই আশা হইতেছে ভাদ্রেরটি আরও সুন্দর হইবে। আমার সম্পাদিত পত্রে যে এমন জিনিষ বাহির হইল ইহাতে আমার সম্পাদকজীবন সার্থক হইল। এখন শুধু ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি আপনার শরীর সুস্থ থাকুক, আপনি আপনার কথা শেষ করিবার সুযোগ পান।

শ্রীচরণে নিবেদনমিতি।
প্রণতঃ শ্রীজলধর সেন।

শান্তিবাটী, শ্রীরামপুর।
২৩ শ্রাবণ ১৩১৭।

নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—শ্রদ্ধাস্পদেষু :—

আপনার পত্র পাইয়া যে কতদূর আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা চিঠিতে জানান অসম্ভব। আপনার রচনার প্রতি আমার শ্রদ্ধাকে আপনি অহৈতুকী শ্রদ্ধা বলিয়াছেন, কিন্তু ইহা যদি অহৈতুকী হয় তাহা হইলে আমি জানিনা কোন শ্রদ্ধার হেতু আছে। আপনার "জিজ্ঞাসা" পুস্তকের ন্যায় পুস্তক বঙ্গভাষায় ত দূরে থাকুক সমস্ত জগতের সাহিত্যেও অতীব বিরল। ইহার প্রতি শ্রদ্ধাই স্বাভাবিক। শ্রদ্ধা না হওয়াই অস্বাভাবিক। আপনার অনুমত্যনুসারে আপনার প্রবন্ধ আমি "Archirfur Systematische Philosophic" নামক পত্রের সম্পাদক ডাক্তার লুট্‌ভিঃ ষ্টাইঃ (Dr. Ludwig Stein) এর নিকট পাঠাইয়াছি। পত্রে আমার আন্তরিকী শ্রদ্ধা জানিবেন। ইতি

শ্রদ্ধাবনত
শ্রীশিশির কুমার মৈত্রেয়।

3, Nurulla Doctor's Lane.
Karaya. 28th Sep. /04.

My Dear Mr. Trivedi,

Pray accept my most sincere congratulations on your election.—The University would have undoubtedly been poor without you.

Yours sincerely,
Syed Shamsul Huda.

—o—

26, Sukeas Street. Calcutta.
11. 6. 17.

My Dear Ramendra Babu,

I have been asked by the Hon. Pandit Madanmohan Malaviya in a confidential letter to ascertain whether you will accept the Principalship of the Hindu University College if it is offered to you, and if so, on what terms—kindly send me a reply as soon as you can by the above address. Trusting you are quite well.

Yours affly.—Radha Kumud.

Principal Ramendrasundar Trivedi, M. A., P. R. S.

P. S. The Hon. Pandit also asks me to remind you that you promised him your co-operation in building up the University.

ঘোড়ামারা, রাজসাহী,
২৬।৭।১০

প্রীতিনমস্কার নিবেদন,—

পত্র পাইয়া প্রীতি লাভ করিলাম, আপনার মত কর্ণধার আছে বলিয়াই ভরাডুবি হয় না। বঙ্গদর্শন পড়িয়া এখানকার সকলে আপনাকে পত্র লিখিবার জন্য যে পত্র রচনা করিয়া দিয়াছিলেন তাহাই আমি লিখিয়াছিলাম। তজ্জন্য ক্রটী গ্রহণ করিবেন না। আপনার উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে। আপনার দ্বারায় এরূপ ঘটিয়াছে কেহই এরূপ ভাবেন নাই। তবে আপনাকে একবার জানান উচিত ইহাই সকলের সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। আপনাকে যে মধ্যে মধ্যে এরূপ উপদ্রব সহ্য করিতে হয় তাহা জানি। আপনি সদাশিব—নীলকণ্ঠের ন্যায় বিষ জীর্ণ করিয়া অমৃত উদ্গিরণ করিয়া থাকেন তাহা জানি বলিয়াই পত্র লিখিয়াছিলাম। তজ্জনিত ক্রটী বা অপরাধ কখনই গ্রহণ করিবেন না। * * * *

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

Lions Pane,
Mussooree, U. P. 7. 7. 17.

My Dear Trivedi,

Thanks for your letter of the 29th June and for the article in Bengali you have kindly sent me. I have read it with great interest. You have a wonderful power of popular exposition in our mother tongue. You are really making the best use of your scientific and philosophical knowledge. I shall be very glad to have also your next article. * * * * Yours sinly. P. K. Roy.

Council of Post-Graduate Teaching,
Senate House, Calcutta.
The 13th February, 1919.

My Dear Ramendra,

The Government of India have sanctioned the new regulations for the M. A. degree in Indian vernaculars. Steps have to be taken at once to give effect to the scheme. I am anxious to have your advice on the subject. If you are free this afternoon I shall gladly come to your house between 4 and 5 P. M.

Yours sincerely
Ashutosh Mukherjee.

—o—

Director of Surveys
Bengal & Assam.
87, Park Street,
Calcutta, 27th March 1915.

Do. No : 1429

Dear Sir,

I have received your notes from Mr. Milne containing information on the points asked for. I have read them with considerable interest and I have to thank you for the trouble you have taken in the matter.

The notes cover a wide branch of research and learning and I may say that they appear to me very valuable and afford evidence of deep study.

Thanking you again,

I am, Dear Sir, Yours truly, F. C. Hirst, Major, I. A.

Re—about the cause of possible silting up of certain feeders of the Hooghly River asked by Mr. Milne, Collector of Murshidabad.

নাসিক,
১লা আশ্বিন ১৩২১।

পরমপূজ্যপাদেষু :—

শ্রীচরণে প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন, আপনার পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে তাহা এই মাসের প্রবাসীতে পাঠ করিয়া বিদিত হইলাম। আপনাকে কেবল আমার প্রণাম নিবেদন করিবার জন্ম এই পত্র লিখিতেছি। আপনার নিকট অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য আমার কখন ঘটে নাই। আমি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ি তখন হইতে আপনার প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া আসিতেছি। আজ আমি বাঙ্গালা দেশ হইতে দূরে; এক বৎসরে আপনার প্রতি যে শ্রদ্ধা আমার চিত্তে সঞ্চিত হইয়া আছে, আজ আপনার চরণে তাহা নিবেদন করিতে সাহসী হইতেছি। আমি একজন অতি সামান্ত ব্যক্তি; পবিত্র হোমশিখার ন্যায় আপনার স্মৃতি আমাকে পূত করিয়াছে, আমাকে জ্ঞাননিষ্ঠার মাহাত্ম্য দেখাইয়াছে। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

আপনার আশীর্ব্বাদকাঙ্ক্ষী শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র সেন, I. C. S.
Assistant Collector, Nasik (Bombay Presidency).

—o—

৬০, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট,
৫ আষাঢ় ১৩২১।

শ্রীচরণেষু—

এবারের প্রবন্ধটা খুব জমিয়াছে বটে। সমস্তটাই ছাপা হইবে, কারণ যাহা দাঁড়াইয়াছে উহাকে ভাঙ্গিলে নষ্ট হইয়া যাইবে। হরজটাভ্রষ্ট আকাশ গঙ্গার পতন পড়িয়া আমি চঞ্চল হইয়াছিলাম—অমন lyric beauty

আপনার কোন লেখায় পাই নাই; এমন করিয়া mythology ও astronomy বিশ্বসঙ্গীতের বিগলিত রসধারায় ব্যোমপথ হইতে আবর্ত্তে আবর্ত্তে নাচিয়া নাচিয়া কল কল নাদে শব্দ ব্রহ্মের মাহাত্ম্য ফুটাইয়া তুলিতে আর কখনও দেখি নাই। সৃষ্টিতত্ত্ব এর কাছে কতটুকু! বিরাট লয়তত্ত্ব এর কাছে কত ক্ষুদ্র! আমার বোধ হইল যে আমি আমার ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া এক গণ্ডূষে সমুদ্র পান করিয়া ফেলিলাম। একটা নেশায় যেন মাতিয়া উঠিলাম, ঐরাবতও তৃণের মত ভাসিয়া যাইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? এই আকাশ গঙ্গার আদি নাই, অন্ত নাই—দিগন্তব্যাপিনী; তারকামণ্ডলতটিনী; ...... * * * *

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

—o—

শারদীয় সঙ্ঘ,
বোলপুর।

পরমভক্তিভাজনেষু—

* * * আপনি বাংলায় বিজ্ঞানালোচনার নবযুগের প্রবর্ত্তক, আমি আপনার দীন শিষ্য। পুস্তকখানি যদি পাতা উল্টাইয়া দেখিবার সময় হয় তাহা হইলে উহা কেমন লাগিল জানিবার প্রার্থনা করিতেছি।

চিরানুগত
শ্রীজগদানন্দ রায়।
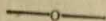
Barisal, East Bengal.

সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন,—

বহুকাল পরে আজ আপনার কাছে উপস্থিত হইলাম। প্রথমতঃ আপনি কেমন আছেন তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে চাই। আপনার শারীরিক সংবাদ আমি সর্ব্বদাই নানাসূত্রে সংগ্রহ করিয়া থাকি। হতভাগ্য দেশ আপনার ন্যায় ক্ষণজন্মা মহাজন আর কয়জন আছেন, জানি না; সেই আপনি যখন অকালে অতিশয় উৎকট ব্যাধির প্রবল আক্রমণে একরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া আছেন এই নিদারুণ দুঃসংবাদ শুনি, তখন সত্য বলিতে কি আমার অন্তরে অকথ্য অশান্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। বিধাতা কবে যে আপনাকে সর্ব্ববিধ দৈহিক দুর্গতির হাত হইতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি প্রদান করিবেন তাহা তিনিই জানেন। আমি দূর হইতে নীরবে তাঁহার শ্রীচরণে আপনার সম্যক্ স্বাস্থ্যলাভের জন্য কায়মনোবাক্যে ঐকান্তিক প্রার্থনা জানাইতেছি। দীনবন্ধু কি আপনার এই অক্ষম অনুরাগী ভক্তের কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত করিবেন না? * * * আপনার পত্রের আশায় আমি যথার্থই উন্মুখ হইয়া রহিলাম। * * *

৪ঠা আষাঢ় ১৩২২।

আপনার প্রীতিতৃপ্ত,

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

—o—

আপনার কোন লেখায় পাই নাই ; এমন করিয়া mythology ও astronomy বিশ্বসঙ্গীতের বিগলিত রসধারায় ব্যোমপথ হইতে আবর্ত্তে আবর্ত্তে নাচিয়া নাচিয়া কল কল নাদে শব্দ ব্রহ্মের মাহাত্ম্য ফুটাইয়া তুলিতে আর কখনও দেখি নাই। সৃষ্টিতত্ত্ব এর কাছে কতটুকু! বিরাট লয়তত্ত্ব এর কাছে কত ক্ষুদ্র! আমার বোধ হইল যে আমি আমার ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া এক গণ্ডূষে সমুদ্র পান করিয়া ফেলিলাম। একটা নেশায় যেন মাতিয়া উঠিলাম, ঐরাবতও তৃণের মত ভাসিয়া যাইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? এই আকাশ গঙ্গার আদি নাই, অন্ত নাই—দিগন্তব্যাপিনী ; তারকামণ্ডলতটিনী ; ...... * * * *

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

—o—

শারদীয় সভ্য,
বোলপুর।

পরমভক্তিভাজনেষু—

* * * আপনি বাংলায় বিজ্ঞানালোচনার নবযুগের প্রবর্ত্তক, আমি আপনার দীন শিষ্য। পুস্তকখানি যদি পাতা উল্টাইয়া দেখিবার সময় হয় তাহা হইলে উহা কেমন লাগিল জানিবার প্রার্থনা করিতেছি।

চিরানুগত
শ্রীজগদানন্দ রায়।

Barisal, East Bengal.

সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন,—

বহুকাল পরে আজ আপনার কাছে উপস্থিত হইলাম। প্রথমতঃ আপনি কেমন আছেন তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে চাই। আপনার শারীরিক সংবাদ আমি সর্ব্বদাই নানাসূত্রে সংগ্রহ করিয়া থাকি। হতভাগ্য দেশ আপনার ন্যায় ক্ষণজন্মা মহাজন আর কয়জন আছেন, জানি না; সেই আপনি যখন অকালে অতিশয় উৎকট ব্যাধির প্রবল আক্রমণে এতরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া আছেন এই নিদারুণ দুঃসংবাদ শুনি, তখন সত্য বলিতে কি আমার অন্তরে অকথ্য অশান্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। বিধাতা কবে যে আপনাকে সর্ব্ববিধ দৈহিক দুর্গতির হাত হইতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি প্রদান করিবেন তাহা তিনিই জানেন। আমি দূর হইতে নীরবে তাঁহার শ্রীচরণে আপনার সম্যক্ স্বাস্থ্যলাভের জন্য কায়মনোবাক্যে ঐকান্তিক প্রার্থনা জানাইতেছি। দীনবন্ধু কি আপনার এই অক্ষম অনুরাগী ভক্তের কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত করিবেন না? * * * আপনার পত্রের আশায় আমি যথার্থই উন্মুখ হইয়া রহিলাম। * * *

৪ঠা আষাঢ় ১৩২২।

আপনার প্রীতিতৃপ্ত,
শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

—o—

স্কুল ইনস্পেক্টর আফিস,
চট্টগ্রাম ৭।২।১৫।

দেব!

আপনাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে দেব বলিয়াই সম্বোধন করিলাম। ইহাতেও আপনার প্রকৃত সম্বোধন হইল বলিয়া বোধ হয় না। দেবতা ভিন্ন এ মরজগতে এ রকম সৌজন্য, এ রকম সহৃদয়তা, এ রকম প্রীতি ও এ রকম দয়া মর্ত্ত্যের মানুষের নিকট পাওয়া যাইতে পারে না। আপনি দেবতাকেও অতিক্রম করিয়াছেন, দেবতারাও পূজার্চ্চনার অপেক্ষা করেন। * * * আপনাকে পিতা সম্বোধন করিলেও ঠিক হয় না, কারণ পিতারও স্বার্থবাসনা থাকে। হিন্দুগণ অকারণে ব্রাহ্মণদিগকে ভূদেব আখ্যা দেন নাই। যিনি এমন অসুখের সময়েও একজন বিজাতীয় বিধর্ম্মী লোকের জন্য এরূপ স্বার্থত্যাগে কুণ্ঠিত নহেন তাঁহার আসন নিশ্চয়ই দেবতারও উপরে। আপনার পত্রখানি পড়িয়া আমি একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছি। আপনি আজ আমার বিস্ময়-বিমুগ্ধ চক্ষে স্বর্গীয় দূতের মত প্রতিভাত হইতেছেন। * * * শুধু ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি আপনাকে নিরাময় শরীরে দীর্ঘজীবী করিয়া রাখুন। আপনার কথাগুলি পড়িয়া এখন আর আমার কোন দুঃখ আছে বলিয়াই বোধ হইতেছে না। এই দণ্ডেই ইচ্ছা হয় আপনার রাজীবচরণে আসিয়া লুটাইয়া পড়ি। আমি কি দুর্ভাগ্য, গতবৎসর কলিকাতা গিয়াও আপনার চরণদর্শন ভাগ্যে ঘটে নাই। * * * আপনার চেষ্টায় আমার কিছু হউক না হউক সে জন্য আর আমার কোনও দুঃখ নাই। আপনার এরূপ সৌজন্য ও প্রীতিলাভ করিয়াই আমি ধন্য হইয়াছি। * * * * আপনি যখন নিজগুণে আমার দুঃখের অংশ লইতে চাহিয়াছেন, এজন্য আমি আর নীরব থাকিতে পারি না। * * * আপনাকে

আর লজ্জা করিতেছে না, তাই সকল কথা খুলিয়া বলিতেছি। আমি জানি আপনাকে লজ্জার কথা বলিলেও আমার কোন ক্ষতি হইবে না। * *

স্নেহের
আবদুল করিম।

—o—

২৬।১, কানাইলাল ধরের লেন,
কলিকাতা ১৩।১২।১২।

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আপনার পত্র পাইয়া আমি যুগপৎ শোক ও ক্ষোভে অভিভূত হইলাম। আপনি পূর্ব্বে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা আপনার হৃদয়ের ঔদার্য্য ও মহত্বের অভিব্যঞ্জক। আপনি পরিষদের সুদৃঢ় স্তম্ভ। রোগে জরাজীর্ণ হইয়াও আপনি পরিষদের জন্য যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার সহস্র অংশের এক অংশও আমরা সমস্ত জীবনে করিয়া উঠিতে পারিব না। * * * * * * * * * *

আমি আশা করি আপনি কিছু মনে করিবেন না। আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়া আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনি একাধারে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিত। আমি আপনাকে অধিক কি লিখিব, হৃদয় চিরিয়া দেখাইবার হইলে দেখাইতাম।

আপনার একান্ত অনুগত
শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

শ্রীহরিশরণম্

বান্ধবকুটীর, ঢাকা।
২৭ আষাঢ়। ১৬।

বহুসম্মানপুরঃসর প্রীতিপূর্ব্বক নিবেদনমিদম্—

এইমাত্র আপনার ২৬শে আষাঢ় তারিখের প্রীতিপরিপূর্ণ পত্রখানি পাইয়া কতই যে সুখী হইলাম, তাহা লিখিয়া জানাইতে পারিলাম না। আপনার মত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিও আমার লেখায় অনুরাগী, এ সংবাদ আমার এই অকর্ম্মণ্য বার্দ্ধক্যে বড় প্রীতিকর। * * * * আপনি যখন প্রকারান্তরে আমাকে অকৃত্রিম বান্ধব বলিয়া জানিতে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তখন এ সম্পর্কে আপনার নিকটই আরও ২।১টি কথা লিখিব। আপনাদিগের কমিটির মধ্যে ২।১টি মেম্বর এক সময়ে আমার প্রতি বড় শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন এবং এক সময়ে আমাকে জানাইতেন যে, আমার লেখার দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের বিস্তর উপকার হইয়াছে। কিন্তু যেই সেই লেখা কমিটিতে উঠিয়াছে, অমনি তাঁহারা যারপরনাই প্রতিকূল হইয়া লোকের কাছে জানাইয়াছেন যে, আমার দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রভূত অপকার হইয়াছে। আমি তাদৃশ মহাশয় পুরুষদিগের পত্রগুলি এক সময়ে গোপনে আপনাকে পাঠাইয়া দিব।

স্নেহানুগৃহীত—
শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

120/3, Upper Circular Road,
Calcutta. 20th May 1917.

My Dear Ram,

* * * * *

Sir John Woodroffe paid you a very high compliment the other day in the course of a speech he delivered at Howrah. He told me some time ago that he would like very much to see you. I hope you are doing well.

Yours sincly.,
Atal B. Ghosh.

—o—

সাহিত্য কার্য্যালয়,
২।১, রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর।
কলিকাতা।

প্রিয়বরেষু—

আশা করি আপনি নিজে ভাল আছেন এবং পরিবারের সমস্ত কুশল। মে মাসের মধ্যভাগে আমি * * * * এর যে পত্র পাইয়াছি তাহা আপনাকে এই পত্রের মধ্যে পাঠাইতেছি পড়িবেন, আপনি যখন কলিকাতা আসিবেন তখন সঙ্গে আনিবেন। চিঠিখানি রাখিবার মত। বাঙ্গালা মাসিকের ইতিহাস লিখিবার সময় ভাবী লেখকের কাজে লাগিবে।

* * * * আপনার পত্রপ্রাপ্তির পর আমি প্রাণপণে সাহিত্য খানি রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছি, এবং বলা বাহুল্য যে নিরাশ হইয়াছি।

যাঁর মন আছে তাঁর ধন নাই, যাঁর ধন আছে তাঁর মন নাই এবং আমার ধনীর মন জয় করিবার মত জিব, রক্ত বা সৌভাগ্য বা প্রাক্তন বা কেরামত যাই বলুন কিছুই নাই বরং চটাইবার অশিক্ষিত পটুত্ব আছে।

* * * * *

এখন কি করি? আমি গ্রাহকদের কাছে ঋণী, চারি সংখ্যা দিতেই হইবে নতুবা চোর হইয়া থাকিব। এক সঙ্গে টাকা পাইবার কোন আশাই নাই। সে আশা ত্যাগ করিয়াছি।

এখন "একের বোঝা দশের নড়ি" করিয়া যদি ৮।১০ জনের কাছে পাওয়া যায়—আমার ২।১ জন নিঃস্ব বন্ধু এই পরামর্শ দিয়াছিলেন। আমি নিরুপায় হইয়া সেই পথই ধরিব স্থির করি। প্রথমেই * * * * কে পত্র লিখিয়াছিলাম যে শতাবধি টাকা যদি দেন, তাহা হইলে সাহিত্যটা বাঁচাইবার চেষ্টা করি। তিনি আজ পত্রযোগে কৃষ্ণকে জবাব দিয়াছেন। আমি হরেন বাবুকেও বলিব আপনাকেও লিখিতেছি, যদি আপনি নিজে শতাবধি দেন এবং ২।১ জনের কাছ থেকে কিছু সংগ্রহ করিয়া দেন, তাহা হইলে আমি রক্ষা পাই। আপনারা জ্ঞানী এবং বড়লোক, জ্ঞানে ও বড়ত্বে প্রায় মায়া মমতা থাকে না। বোধ হয় আপনাতে একটু ব্যতিক্রম হইয়াছে। আর আমি এখনও আপনাকে আমার প্রতি সম্পূর্ণ বিরূপ করিয়া তুলিতে পারি নাই। তাই ভরসা করিয়া লিখিলাম। আপনার মেজ ভায়াকে এই চিঠিখানি দেখাইবেন। তিনি আমাকে ভালবাসেন এবং তাঁহার মনটা এখনও তত উন্নত হয় নাই। অনেকটা সহজ সুতরাং মমতাময় আছে, তিনি হয়ত আমার হইয়া আপনাকে সুপারিস করিতে পারিবেন। যদি কিছু করেন শীঘ্র করিবেন। * * * *

শ্রীসুরেশ সমাজপতি।

শ্রীশ্রীদুর্গা বিজয়তাম্

১৩২৪ সাল ২২ চৈত্র।

শ্রীচরণসরোজেষু :—

অশেষ প্রণতিপুরঃসর সমাবেদনমেতৎ।

* * * * * *

গুরুদেব! সম্প্রতি এই অধম শিষ্যের স্বভাবকাতর মন "একাদশী তিথিতে হিন্দু বিধবাবৃন্দের নিরম্বু উপবাস কি প্রকৃত শাস্ত্রসম্মত, অথবা অপরিণামদর্শীদিগের স্বকপোলকল্পিত প্রক্ষিপ্ত প্রমাণাদি ব্যাপার সন্দর্শনে ভ্রমজ সংস্কারপ্রসূত লৌকিক আচার মাত্র" ইত্যাকারক এক দুষ্পরিহর সন্দেহদোলায় আরোহণ করিয়া দোদুল্যমান হওয়ায় অশান্তি নিরাকরণার্থ ভবদীয় শ্রীপাদপদ্মযুগলে আশ্রয়অভিলাষ জন্মিল। কিন্তু উক্তাকারক সংশয় কি মদীয় যৎকিঞ্চিৎ পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম, কি বিবিধ সুধীজন সমালোচিত প্রসিদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের তাৎপর্য্যোদ্ভেদবিষয়ে অক্ষমতা নিবন্ধন উন্মার্গগামিতার পরিচায়ক, অথবা আত্মীয়পরিবারমধ্যে অনশনজনিত অসহ্য যাতনাব্যঞ্জক করুণ দীর্ঘনিশ্বাসের প্রবলতা বোধে স্বাভাবিক করুণা-বৃত্তি বিকাশের নিদর্শন তাহা জানি না। যাহা হউক এ বিষয় নিশ্চিত করা নিশ্চিতই মৎসাধ্যাতীত, অথচ শাস্ত্রানভিজ্ঞ মাদৃশ জনের এতাদৃশ জিজ্ঞাসা অপরের নিকট অবশ্য হাস্যোদ্দীপক ও উপেক্ষণীয় হইবে, সুতরাং সমাজের শীর্ষস্থানীয় ও অনন্ত শাস্ত্রাভিজ্ঞ ভবাদৃশ ছাত্রানুরাগিগুরুদেব ভিন্ন আর কে সমাশ্রয়ণীয়। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অবর্ত্তমানে এইরূপ গুরুতমবৎ প্রতীয়মান প্রশ্নের যথার্থ মীমাংসা করিবার যোগ্যতা একমাত্র আপনাতেই লক্ষিত হয়, ইহাও আপনার মত ব্যক্তিকে বিরক্ত করিবার কারণ। * * * * *

প্রণতস্য—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রধান শিক্ষক।

সেহাড়সোল রাজ উঃ ইঃ বিদ্যালয়,
পোঃ সেহাড়সোল, রাণীগঞ্জ।

কৃষ্ণনগর কলেজ,
শনিবার, আশ্বিন ১৩২৫।

পরমভক্তিভাজনেষু :—

"সাহিত্য" পত্রিকায় আপনার বিবৃত পুরুষ-যজ্ঞ সম্প্রতি পাঠ করিয়া যে বিমল আনন্দ লাভ করিয়াছি। সেই বিষয়ে মহাশয়কে আন্তরিক পূজা বিজ্ঞপ্তি না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

খ্রীষ্টীয় ও বৈদিক "আত্মাহুতির" যে তুলনামূলক সারগর্ভ সমালোচনা আপনি সন্নিবেশ করিয়া আমাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন—এবং আমাদের স্বদেশী জলহাওয়ায় বর্দ্ধিত এই যে ত্যাগের নিবৃত্তির মার্গদ্বারা * * * * ভূমানন্দের আদর্শ এত পাণ্ডিত্য, সহৃদয়তা, স্বাদেশিকতার রসে সিক্ত করিয়া আমাদের প্রাণে এই মহাবাণীর এই "মহা ওঙ্কারের" উদাত্ত সুর বাজাইয়াছেন তজ্জন্য কুশিক্ষাবিষব্যাধিগ্রস্ত * * * * মাদৃশজনের বিনয়পূর্ণ সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। আমাদের কাহারো কাহারো স্বদেশী ভাব হাওয়ার রঙীন শূন্যতায় ভাসিয়া বেড়ায়—তাহার মূল, তাহার কাণ্ড, তাহার শাখাপ্রশাখার যে মানচিত্র এই বিবৃতিতে পাইয়াছি তাহা বহুদিন ভুলিব না, ধন্য আপনার শাস্ত্রাধ্যয়ন, ধন্য আপনার মত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানজড়বাদবিসংবাদী ভারতীয় পরাজ্ঞানে শ্রদ্ধা, ধন্য আপনার লিপি চাতুর্য্য, ধন্য আপনার ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ!

পুরুষ-যজ্ঞ যে কি তাহা কিছু বুঝিলাম—Bergsonর Creative Evolutionএর মতবাদ আজ নূতন উদ্ভাসিত হইল, Enckenএর Spiritual substanceএর বিবৃতি যে ভারতীয় চিন্তাধারার এক ক্ষুদ্র আবর্ত্তন তাহাও দেখিতে পাইলাম।

হতভাগ্য আমরা, হতভাগ্য শিক্ষাপ্রণালী যাহাতে ঘরের ছেলেরা পর দেশের চশমা পরিয়া নিজ দেশের ভাবসম্পৎকে ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট করিয়া দেখে!

* * * * আমার শত শত প্রণাম গ্রহণ করিবেন। জ্ঞানযজ্ঞের অধ্বর্য্যুগণ কবে এদেশে পুনরায় পুরাতন সম্মান লাভ করিবেন? ভরসা করি শরীর সুস্থ আঁছে নিবেদন ইতি—

স্নেহাকাঙ্ক্ষী—শ্রীনৃপেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
(ভূতপূর্ব্ব সারভ্যাণ্ট-সম্পাদক)।

কটক,
ইং ১৫ ফেব, ১৯০৮।

সবিনয় নিবেদন,

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় আপনার ধ্বনি-বিচার পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। সংগে সংগে বহু কৌতুক অনুভব করিয়াছি। আপনি অনেক বাঙলা শব্দ দিয়াছেন, আমার উপস্থিত কোশসংকলন কাজে তৎসমুদয় সাহায্য করিবে।

মনে করিয়াছিলাম আমার আলোচনার ফল এক সংগে পরে জানাইব। এখনও কাজ শেষ করিতে পারি নাই; যে গতিক দেখা যাইতেছে তাহাতে হয়ত সব শেষ করিতে আর দুই তিন মাস লাগিবে। এখানে এখন দুই একটা বিষয় আপনাকে জানাইতে বসিলাম।

আপনার ধ্বনি-বিচারের প্রথমাংশের আমার লিখিত বর্ণের উচ্চারণ বিচারের প্রায় অবিকল মিল আছে। এই আশ্চর্য্য মিল দেখিয়া আমার সাহস জন্মিয়াছে।

আপনি তিনটি স্বর মূল ধরিয়াছেন, আমি পাঁচটি ধরিয়াছি এ ও ধ্বনি দুইটি মূল ধ্বনির মধ্যে গণিয়াছি।

বাঙলা উচ্চারণে ণকারের প্রকৃত উচ্চারণ লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইয়াছে কংঠ (কণ্ঠ) ও কন্থা উচ্চারণ করিলে যদি ণকার কিছু আসে, তাহা এত ক্ষীণ ও অস্পষ্ট ভাবে আসে যে, কান খাড়া করিয়া না রাখিলে ধরিতে পারা যায় না। তিনটি শ সম্বন্ধে আমিও বলি আমরা তিনটাই উচ্চারণ করি। যাঁহারা স দিয়া তিন শকারের কাজ করিতে চান্, তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে বাঙলাতে শ-যকারের উচ্চারণ বেশী শুনিতে পাই, প্রায় কেবল যুক্তাক্ষরে স পাই। মাগধী প্রাকৃতে শ ছিল, সেই নিয়ম যেন এখনও চলিয়া আসিয়াছে। আশ্চর্যের কথা, প্রাচীন বাঙলায়—অর্থাৎ প্রাচীন বাঙলা বহিতে স বানান বেশী দেখিতে দেখিতে পাই। মূল সংস্কৃত শব্দের শ স্থানে স কি কারণে আসিয়াছে, তাহার কারণ পাই না। শ্রেণি হইতে সিঁড়ি; শিঁড়ি লিখি না, পাশ হইতে ফাঁস; ফাঁশ লিখি না; ইত্যাদি অনেক আছে।

আ, ই, উ—বড় হইতে ক্রমশঃ ছোট বুঝায়। এই আবিষ্কারটি করিতে না পারিলে ফাঁফড়ে পড়িতে হইত। আপনিও ধরিয়াছেন। পট্ পট, পিট্ পিট, পুট্ পুট একই শব্দের তিন রূপ।

যেখানে আপনার সহিত আমার অনুমান মিলিল না, এখন সেরূপ দুই একটা কথা বলি।

আমি এ পর্যন্ত প্রায় ৫০০০ বাঙলা শব্দ পাইয়াছি এবং প্রত্যেকের মূল অনুসন্ধান করিয়াছি। আপনি শুনিয়া আশ্চর্য বোধ করিবেন যে, এমন কোন শব্দ এ পর্যন্ত পাই নাই, যাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি দেশজ। বাঙলা ধাতু প্রায় ৭৭০, এবং দ্বিরুক্ত শব্দ (যেমন কন্-কন) প্রায় ২৪০—মোট প্রায় এক হাজার শব্দ বিশেষভাবে দেখিয়াছি, এবং একটিও দেশজ পাই নাই! আমি নিজেই আশ্চর্য বোধ করিয়াছি। কন্-কন, কল্-কল, কুল্-কুল ইত্যাদির দুই তিনটা শব্দকে এক ধরিয়া প্রায় ২৫০টি দ্বিরুক্ত

শব্দ পাইয়াছি। আর বেশী আছে বলিয়া বোধ হয় না। স্থান ভেদে এই সকল ধাতুর কিছু কিছু রূপান্তর হইয়াছে। আপনি লিখিয়াছেন—কেঁচ-কাঁদুনে, আমি শুনিয়াছি ছিঁচ্-কাঁদুনে—ছুঁইলেই যে কাঁদে। আমি রাঢ়ের লোক, রাঢ়ের কথাবার্ত্তার চলিত শব্দ আমার পুঁজি। রাঢ় বাঙলার ধাতু ও বিকৃত শব্দ যত চলিত আছে, তৎসমুদয় দেখিয়া বিশ্বাস হইয়াছে, 'দেশজ' বলিতে যাহা বুঝি, তাহা এই শব্দটি একথা বলিতে পারি না। দুই দশটা শব্দের ঠিক সংস্কৃত মূল পাই নাই বটে, কিন্তু তাহা সাগরে বারি বিন্দুর তুল্য। তা' ছাড়া আমি পাইলাম না বলিয়া দেশজ বলিতে পারি না। আমি ত' সংস্কৃতের সও জানি না। দুঃখের বিষয় প্রকৃতিবাদ অভিধানকর্ত্তা সংস্কৃত পণ্ডিত হইয়াও দেশজ শব্দের ছড়াছড়ি পাইয়াছেন। তিনি বাবা শব্দ তুর্কী ভাষা হইতে আনিয়াছেন, আর অধিক কি দেখাইব।

আপনি শব্দের গোড়ায় গিয়াছেন। কোন কোন অনুমান হয়ত সত্য মনে হইয়াছে। আপনি শব্দের natural origin খুজিতে গিয়াছেন। যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে সে law সকল ভাষাতেই থাকিবে। যদি ইহার কিছু আভাষ দিতে পারেন, তাহা হইলে একটা মহাসত্য আবিষ্কৃত হইবে। ল-তারল্যে, ট-কাঠিন্যে এইরূপ দুই একটা যেন সত্য বলিয়া বোধ হয়।

আমি সংস্কৃত মূল ধরিয়াছি। দুই একটা শব্দ উদ্ধৃত করিতেছি।

কণ্-কণ—সং কণ ধাতু শব্দে, আর্ত্তনাদে। কণ্-কণা শীত এমন যে আর্ত্তনাদ করিতে হয়।

কপ্-কপ—সং কপ ধাতু চলনে। কপ্ কপ করিয়া সন্দেশ গেলা—গতি। থপ্ করিয়া আসা—গতি।

কর্-কর—সং কর্কর শব্দ। চোখ্ কর্-কর করে যেন কাঁকর পড়িয়াছে। কর-করা করিয়া গা মাজা—যেন কাঁকর দিয়া ঘষা ইত্যাদি।

Generalise করিলে, বাঙলা ভাষা সংস্কৃত ধাতুর কতকগুলিকে বাঙলা ধাতু করিয়া লইয়াছে ; যেমন কৃ হইতে কর্ ; অপর কতকগুলিকে সংস্কৃত ধাতুর আকারেই তুলিয়া লইয়াছে। শেষোক্তগুলির অধিকাংশ দ্বিরুক্ত, সংযঙন্ত ও যঙলুগন্ত ধাতুর স্থানীয়, এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ধন্যাত্মক। কন্ কনানি, মড় মড়াইতেছে ইত্যাদি দেখুন। ভাষাও যে laws of evolutionএর অধীনে, তাহাই প্রমাণ হইতেছে।

দুঃখের বিষয় সাহিত্য-পরিষদের ও আপনাদের সাহায্য পাইতেছি না। কিন্তু ভাবিবেন না, আপনারা নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। যখন মাথা হইতে বোঝাটা আপনাদের দ্বারে নামাইব, তখন আপনাদিকেই খুলিয়া ঘাঁটিয়া উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া সব সাজাইতে হইবে। আমি সংস্কৃত জানিলে এবং এখানে বাঙালী পংডিতের সাহায্য পাইলে আপনাদের কষ্ট কম হইত।

* * * * *

নিঃ—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

—◦—

Sarila,

Sir, The 24th January 1907.

It is a matter of great pleasure that, you are also a member of our Jijhotia Samaj. I heard of your ancestors and your life by a upadesak named Pandit Kedarnath of Kasi Nagari Pracharini Sabha lately at Ma'w Sahania in Jijhotia Mahati Sabha which was held in the end of December 1906. The whole Sabha was

much overjoyed to hear your name, and was proud to know, that there was such a man like you in the highest position in the Educational Department. * * * The very upadesak informed that there are still many Jijhotias in Bengal and that he will try to find them out. * * * The Jijhotia Samaj cannot come in the right path until some gentleman like you may try to give them helping hand. Kindly let me know your Gotra, etc. * * *

There are nearly seven Sakha Sabhas of Jijhotias amongst which the Sakha Sabha of Hushangabad District is the first. * * *

I am,
Sir,
Yours sincerely,
Pandit Ramprasad Discit.
Sarila, Jaria P. O. Dt. Hamirpur
in Bundelkhanda

Raipur, C. P.

Dear Mr. R. S. Tripathi,

I feel highly obliged to you for your letter from Jemo Kandi, Murshidabad and two copies of the Pundarika-kula-kirti Panjika. One of the two copies I have duly presented to Pandit Gorelal Tibari an assistant master in the Raipur Normal School and he has accepted it with very many thanks to you. Surely Pandit Gorelal and I have read the Panjika which we have found very

interesting. Credit is due to you for your labour. The Prabhudayal Naik-krita Jujhotia Sabha of Nowgong (Bundelkhanda, C. I.) has undertaken to prepare a Bansawali of Jujhotia Brahamans. Pandit Gorelal Tibari has taken great pains to collect the necessary materials that will be useful in preparing the Bansawali.

May I request you to let me know the approximate number of families of our caste in Bengal? With kind regards.

I am,
Yours truly,
Ganapatlal Choube.
Agency Inspector of Schools.
Chhattisgar Feudatory States.
Bundelkhanda, C. P.

—o—

Dear Sir,

Chhaterpur C. I.

We beg to acknowledge with thanks the reciept of your kind letter and a copy of your work as well.

Like preceeding years, this year too the Sabha was an entire success. The Sahba would have thought itself more fortunate and successful had it been favoured by your august presence, and hopes that you may be enjoying a sound health now.

"The Sabha is extremely glad to have you enlisted as a member and encloses herewith a form for favour of formal entry and return.

Your proposal as to the rough census of Jijhotia families is under the consideration of the Sabha and will be disposed of when the Sabha will come to any final decision as to that.

An account of the proceedings of the conference will be published in Benkteswar and Jijhotia Prabha papers. The Sabha is not yet in a position to say that it will be published in any Bengalee news paper.

The Shaba is greatly indebted to you for the interest, you take in its welfare and for the help you promised.

Again thanking you.

We are,
Yours faithfully,
Pandit Gayaprasad Tibari Arjariya.
Secy. Jujhotia Shabha.

Nowgong,
Central India.
20. XII. 09.

Dear Sir,

I am highly obliged to you for your most welcome letter which we have been expecting for years. It is very disappointing that you cannot honour the Sabha with your august presence when we so much need the

presence of members of our community shining as distant stars practically cut off from the main stock. Your book must be very interesting and we shall thank you to kindly send us 2 copies of the book in Bengali the purport of which will be communicated to the members present in the meeting. We have a Bengali friend, the writer of the 2nd and the 10th reports of the conference sent to you today, who will translate the book for us if you permit it for being published in our paper Jajhotia Prava.

* * * * *

We trace members of our community in Hydrabad, Deccan, Madras, Amraoti, Cuttack, Kachhar (Bengal), Shillong, Assam, etc, etc. Happy will be the day when the main stock will reclaim them and will thus become a rich and recognised society of Indian Brahmans.

* * * * *

The origin of Jujhotia Brahmans and thier chief seat is under discussion. Yet we have, however, succeeded to disown our origin from Kanyakubja Brahmans and being called Jujhotias for having come to perform certain sacrificial rituals of Raja Jujhur Singha the so-called founder of the Jajhotia class or after whom they were called.

We are convinced that because we belong to the Jujhati Desh so we are Jujhotias—known after the name of the country. There are certain Banias and Gadarias (shepherds) known as Jujhotia Banias, etc.

Cunningham has successfully given some of our old traditions and there will be a time when we shall be able to prove that some time about the 5th or 6th Century A. D. the Jujhotia Brahmans were the rulers of the Khajuraha Rajya (a place of architectural antiquity) and probably Chedi Rajya too both in the Jujhoti Desh. Purans have helped us to ascertain extent. We are however not yet in a position to place undisputed facts before the world.

Yours truly,
Gaurisankar Tewari.
H. Secretary, Jijhotia Sabha
Nowgong, C. I. Bundelkhand.

ভ্রম-সংশোধন

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
।/০ ৷৹/০	১৬ হইতে ৩ পর্য্যন্ত	এই...হইয়াছে।	"এই......হইয়াছে"। +
।৶০	২০।২১	এলাহাবাদ নাইনি ষ্টেশন ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে ও গ্রেট ইণ্ডিয়ান্ পেনিন্‌সুলার রেল-ওয়ের সংযোগস্থান। উক্ত সংযোগস্থলের দক্ষিণ দিকে	এলাহাবাদের প্রায় দক্ষিণে মাণিকপুর ষ্টেশন ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ ও গ্রেট ইণ্ডিয়ান্ পেনিন্‌সুলার রেলপথের সংযোগস্থল। সেই স্থান হইতে
৷/০	১৩	যজুহোতা	যজুর্হোতা
৷৶০	১১	"	"
৸৶০	৬	importedt he	imported the
১৸৶০	১৩	শরীকাবাদ	শরীফাবাদ
২৲	৪	পুরণ্ডীক	পুণ্ডরীক
১	১৪	মাধ্যান্দিন	মাধ্যন্দিন
"	১৫	ফুলমণি	ফুলুমণি
৫	১১	নবকিশোরের	বৈদ্যনাথের
১৫	১১	মুড়ির	মুড়ির
৫০	৮	পরীক্ষদিগের	পরীক্ষকদিগের
৮১	২১।২৪	বঙ্গভূমি...করিলেন।	"বঙ্গভূমি...করিলেন"। ‡
১৩৩	১৯	সাহিত্ত-পরিষৎ	সাহিত্য-পরিষৎ
২১৫	১২	অর্থবাঙ্গিরাস	অথর্বাঙ্গিরস
২৩০ ২৩৫	৯ হইতে ১৬ পর্য্যন্ত	ইংরাজরাজ...ফলে নহে।	"ইংরাজরাজ...ফলে নহে"।
২৮৩	৩	সংকীর্ণ	সঙ্কীর্ণ

† 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণ কাণ্ড)'।

‡ 'নায়ক'।